# ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুহূর্তগুলো

# ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুহূর্তগুলো

বৈদ্যনাথ বসু ‘জামশেদপুরিয়া’

রূপম প্রকাশনী

রূপম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২২

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতীম বিশ্বাস
বর্ণ বিন্যাস : সম্বুদ্ধ সান্যাল
গ্রন্থসত্ব : লেখক

অতনু সোম কর্তৃক রূপম প্রকাশনী, ৬/১বি মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে প্রকাশিত ও
প্রসেস সিন্ডিকেট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : 978-93-91713-17-1

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোন যান্ত্রিক উপায়ে (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

উৎসর্গ

জামসেদজি নাসেরওয়ানজি টাটা
এবং
আমার সহধর্মিণী মণিকুন্তলাকে উৎসর্গীকৃত

# মুখবন্ধ

যদিও ইংরাজি ভাষায় টেকনিক্যাল বিষয়ে আমি বই লিখেছি, বাংলায় বই লেখা এই আমার প্রথম। বইয়ের লেখকের নামের জায়গায় শুধু 'বৈদ্যনাথ বসু' না লিখে উপনাম 'জামশেদপুরিয়া' সহ আমার নামটি লিখেছি। লেখকের এই নামাভিষেকের সাথে জড়িয়ে আছে জামশেদপুর—যেখানে আমার মা আমাদের পরিবারকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে মণিকুন্তলাকে আমাদের পরিবারভুক্ত করেছিলেন, এবং যেখানে আমি আমার ছেলেবেলা এবং প্রথম কর্মজীবন কাটিয়েছি। আমার নামের সাথে জামশেদপুরকে জড়িয়ে আমি জামসেদজি নাসেরওয়ানজি টাটার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। যদিও বেনারসে—যেখানে আমি আমার জীবনের সব চেয়ে বেশী সময় কাটিয়েছি—আমার বাসস্থান থেকে এই বইটি লিখেছি, আমার শিকড় যে জামশেদপুরে তা কি করে ভুলি? বইটি আমি জামসেদজি এবং আমার সহধর্মিণী মণিকুন্তলাকে উৎসর্গ করেছি। মণিকুন্তলার কথা আলাদা ভাবে লেখার চেষ্টা করিনি। ওর কথা যতই লিখিনা কেন, আমার মন ভরবে না।

আমার জীবনের 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুহূর্তগুলো' সাজানোর পর বইটিকে শুধুই আত্মজৈবনিক না ভাবার জন্য পাঠকদের সবিনয় অনুরোধ জানাই। আমার প্রয়াসকে সার্থক মনে করব যদি আমার জীবনে ঘটা মুহূর্তগুলো পাঠকের জীবনে ঘটা কোন না কোন মুহূর্তের সাথে অনুনাদিত হয়।

আমি আরও উৎসাহিত হব যদি দেশে ও বিদেশে, কর্মক্ষেত্রে বা অন্যত্র এই বইয়ে বিবৃত বিভিন্ন সময়ের ঘটনাগুলি পাঠকমাজ কিছুটা, যদিও প্রমাণসাপেক্ষ, ঐতিহাসিক বিবরণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

২৭শে অক্টোবর ২০২২

বৈদ্যনাথ বসু
মণিকুন্তলার শুভ জন্মদিন
বেনারস

# স্বীকৃতি

ধন্যবাদার্হ সরিৎ পাল, অতনু ব্যানার্জী, অয়ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত কুমার বসু, সুব্রহ্মম অনন্তকৃষ্ণান, প্রদীপ কুমার সাহা, এবং অতনু সোম, যিনি তাঁর "রূপম প্রকাশনী" থেকে এই বইটি প্রকাশ করেছেন।

নানা পর্যায়ে সাহায্য পেয়েছি অনেকের কাছ থেকে যাদের মধ্যে অন্যতম শুভ্রদীপ চক্রবর্তী, বিশাল কেশরী, অমিতাভ রায় চৌধুরী, তনামী রায়, অনির্বাণ বেরা, রঞ্জন বারিক, দেবাশীষ মন্ডল, ঝিং ওয়াং, শিফেং লি, রক্তিম গুহ, শিবনাথ গুহ, উদিত পাল, কুহেলী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় কুমার ঘোষ, পঙ্কজ কুমার দালেলা, ছায়া দালেলা, রূপশ্রী ঘোষ এবং সুব্রত কুমার দত্ত।

অনেক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন শম্ভুনাথ চ্যাটার্জি, নীলা মুখার্জী (কার্ফা), ভোলানাথ মুখার্জী, কল্যাণী মুখার্জী, নৃপেন পুরকাইত, দিলীপ ভট্টাচার্য্য, পারসনাথ সিং, হরি মোহন গুপ্ত, সুলেখা লাহিড়ী, সুপর্ণা লাহিড়ী, শ্রীনিবাস জোশী, স্বপন কুমার ঘোষ, ললিত মোহন জোশী, গান-সিক পার্ক, ঝাওয়্যুন দুয়ান এবং ছোটন (দেবাশীষ রায় চৌধুরী)।

সম্বন্ধিত তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন—মঞ্জুদি (রায় চৌধুরী) (পাল), মুন্না (লিপিকা) গোস্বামী, শুভাশীষ সোম, সোমা সোম, ইন্দ্রনীল বসু, সুদেষ্ণা বসু, প্রিয়নীল বসু, শ্বেতা বসু (অরোরা), নন্দিনী সরকার, শুভনীল রায় চৌধুরী, মীরা রায় চৌধুরী (করন), ইন্দ্রাণী সরকার, রাজেশ সরকার, শঙ্খনীল বোস, মধুমিতা বোস (নন্দী), মিতু (মিতা ব্যানার্জি), পিকলু (শুভাশীষ মুখার্জী), লাভলী (অনুরাধা মুখার্জী), রিঙ্কু (মিঠু) মহান্তি, এবং রঞ্জিত মহান্তি।

সবশেষে-কিন্তু-সবচেয়ে-কম-নয়, আমাকে আমার এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়েছেন পথ-প্রদর্শক সুহাস দত্ত রায়, যিনি আমাকে তাঁর অনুজপ্রতিম মনে করেন, এবং শ্রদ্ধেয় নির্মল বরণ চক্রবর্তী (স্যার), যিনি আমার ডক্টরাল রিসার্চের মেন্টার ছিলেন এবং স্যারের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া ঝর্ণা বৌদি।

# সূচিপত্র

ঘুম ভেঙে গেলে মাঝরাতে মাকে খুঁজতাম ঘুমন্ত ভীড়ের মাঝে
হালিফোঁ কী খতাফত
থাক থাক, অনেক হয়েছে, এবার থামো
ভোলানাথের সাথে আমার "রিলেশন" ভাল ছিল
মিসাইলম্যান কে আমি নিরাশ করলাম
মশারিটা তো নিলে না
অতিথিকে আপ্যায়ন করবেন না?
মৈঁ নহীঁ বোল রহা হূঁ, ইয়হ তো অ্যাস্ট্রোলজী বোল রহী হৈ
চরৈবেতি-চরৈবেতি
হারু দিব্যি খেলাধুলা করছে
অভিনন্দনের সেই মুহূর্ত আজও ভুলতে পারি না
রামচন্দ্র রাও-এর পাশের বাড়ী
'মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে'
'ভাবি বসে আবার যদি পেতাম হারানো সব সেই দিন'

# ঘুম ভেঙে গেলে মাঝরাতে মাকে খুঁজতাম ঘুমন্ত ভীড়ের মাঝে

"আমরা পৃথিবীটা ভালো করে একবারই দেখি সেই ছোটবেলায়। তারপর সারাজীবন সেই পৃথিবী দেখার স্মৃতিচারণ করেই কাটাই।" — লুইসে গ্লাক (২০২০ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী)

আমার জন্ম হয়েছিল তেসরা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সালে দেওঘর 'বৈদ্যনাথ'-ধামে যেখানে আমার মাতামহ কলকাতা থেকে আমার মাকে (শিশিরকণা বসু) নিয়ে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন। বৈদ্যনাথ-ধামে জন্ম হওয়ার সূত্রে আমার নাম বৈদ্যনাথ রাখা হয়েছিল। আমার বাবা, মন্মথনাথ বসু রায় চৌধুরী, তিন ভাইয়ের যৌথ পরিবারকে নিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় চলে আসেন ১১৯, বিবেকানন্দ রোডের পাঁচতলা ভাড়াবাড়ীর তিনতলার ফ্ল্যাটে। এই ফ্ল্যাটে পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত প্রায় পঞ্চাশজন থাকতাম আমরা, একান্নবর্তী পরিবারে। আর থাকতেন অনেক অতিথি। তিনটি ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি স্নানঘর, আর একটি শৌচালয় এত জনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কলে জল না এলে ফ্ল্যাটের পিছনের দেওয়ালের এক চিলতে খোলা জায়গার নীচে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মুরগীর মত ডাকতাম, "গুরুপদ, পাম্প কর, কলে জল নাই।" আমার জন্মের পর প্রথম পাঁচ-ছয় বছরের সময়টা কেটেছিল কলকাতার এই ফ্ল্যাটে।

রাস্তার ওপারে আমাদের ফ্ল্যাটের উলটো দিকে ১১৮, বিবেকানন্দ রোডের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন মার কাকীমা যার বড় ছেলে ছিলেন যতীশচন্দ্র গুহ যিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সহকর্মী ছিলেন। যতীশচন্দ্র গুহর সাথে বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গে আমার মাসতুতো বোন, সুজাতা মাসিমার মেয়ে মিতুর (মিতা ব্যানার্জি) চিঠি থেকে বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের স্ত্রী বিপ্লবী

উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়ের অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম। মিতুর বাবা অমলেন্দু ঘোষ (আমার মেসোমোসাই) চারটি বই লিখেছিলেন—মার্ক্সবাদই শেষ কথা নয়; বিপ্লব ও বিপ্লবী; ভারতে কম্যুনিজম; এবং বিপ্লবীদের স্মরণে ও সান্নিধ্যে।

আমাদের ফ্ল্যাটের বাড়ীওয়ালা ছিলেন পাঁজা পরিবার—রঞ্জিত পাঁজার বাবা ছিলেন স্কিন স্পেসালিস্ট; তাঁর খুড়তুতো ভাই অজিত পাঁজার বাবা ছিলেন এডভোকেট। পরে রঞ্জিত পাঁজাও হয়েছিলেন স্কিন স্পেসালিস্ট এবং অজিত পাঁজাও হয়েছিলেন এডভোকেট এবং হয়েছিলেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আমার বাবারা ছিলেন তিন ভাই আর আট বোন। ভাইয়ের মধ্যে আমার বাবা ছিলেন সবার চেয়ে বড়। তাঁর আইন বিষয়ে ডিগ্রী ছিল; শুনেছি তিনি কর্মক্ষেত্রে এডভোকেট হিসেবে স্বাধীন ভাবে কাজ না করে ভারতীয় সেনা বাহিনীর আইন বিভাগে মারা যাওয়ার আগে অসুস্থ হয়ে না পড়া পর্যন্ত কাজ করতেন। আমার ঠাকুমা ও ঠাকুরদা ছাড়া আমার কয়েকজন পিসী, যাদের মধ্যে আরতিপিসী ও জ্যোতিপিসী অন্যতম, আমাদের সাথে থাকতেন। এ ছাড়া থাকতেন আরো অনেক আত্মীয় স্বজন। শুনেছি, আমার যখন দু'বছর বয়স, আমার বাবা মারা যান। বাবার মুখটা আমার মনে পড়ে না। আমার মা সব সময় রান্না ঘরেই ব্যস্ত থাকতেন। পঞ্চাশ-ষাটজনকে রান্না করে খাওয়ানোর ভার তাঁর উপরেই ছিল। আমার মা ছিলেন সকলের 'চোখের মণি'। 'মণিমা', 'মণিবৌদি' কলরবে বাড়ী মুখরিত হ'ত। এর পঁচিশ বছর পর আমার হাত ধরে 'মণিমা মণিবৌদির' চোখের মণি হয়ে মণিকুন্তলা, কলকাতার/হালিশহরের এক ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত পরিবার থেকে, জামশেদপুরের আমাদের বসু পরিবারে চলে এসেছিল।

কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে থাকার সময় একটা মুহূর্ত মনে পড়ে যখন আমার জ্যোতিপিসীকে মাঝরাতে পুলিশরা গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন। জ্যোতিপিসী রাজনীতিতে কম্যুনিস্ট ছিলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে আমি শুনতে পেলাম জ্যোতিপিসী পুলিশদের ধমক দিয়ে আস্তে কথা বলতে বললেন যাতে বাচ্চাদের ঘুম না ভেঙ্গে যায়। আমার কলকাতায় থাকাকালীন আমার জন্মের চার বছর পর ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল। বিবেকানন্দ রোডের 'অগ্রগামী শক্তি সঙ্ঘ' ক্লাবের অজিতদা (পাঁজা)

উদ্যোগ নিয়েছিলেন আমাদের পাড়ায় এই উদযাপনের। আমার তখন চার বছর বয়স। সেই উদযাপনে আমিও ছিলাম। আমাদের পাড়ায় প্রভাতফেরি হয়েছিল।

আরেকটা মুহূর্ত মনে পড়ে যখন মা, ছোটমাসী আর মেসোর সাথে কলকাতার বাগমারীতে বড়মাসীর বাড়ী যাওয়ার পথে আমি এক নতুন প্রাণীর দেখা পেলাম। মেসোকে আমার প্রশ্ন: এটা কি ? উত্তর পেলাম: শুওর। আমার পরবর্তী প্রশ্ন: এখানে যদি শুওররা থাকে, তাহলে হারামজাদারা কোথায় থাকে? বলা বাহুল্য, মেসো ছিলেন নিরুত্তর। বাচ্চারা সব শুনতে পায়-গালাগালিও। ছোটদের জ্ঞানের লিস্টে বড়রা অনেক সময় 'শুওর' ও 'হারামজাদা' ছাড়া আরো অনেক গালাগালি যোগ করতেন, যেমন 'চাষা', চামার, 'ছোটলোক', ইত্যাদি। 'চাষ' বা 'কৃষি' মানে ইংরাজিতে 'এগ্রিকালচার', তাই কাউকে 'চাষা' অর্থাৎ চাষী বলে গালাগালি করার আগে আমাদের জীবনে চাষার মহত্বপূর্ণ ভূমিকা ভুললে কি চলবে? এখনতো এগ্রিকালচার পড়ার জন্য অনেকে হন্যে হয়ে থাকে। ইংরেজরা কিন্তু নিজেদের জীবিকা অনুযায়ী নিজেদের পদবী 'ব্ল্যাক্সমিথ' (লোহার) বা 'কার্টার' (গাড়োয়ান) ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করেনা। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর নাম রিচার্ড কার্টার যিনি ল্যান্কাস্টার ইউনিভার্সিটির প্রফেসার ও ডীন ছিলেন। বাংলায় 'ছোটলোক' আর 'বড়লোক' এই শব্দ দুটোর মানের সাথে 'ছোট' ও 'বড়' শব্দ দুটোর কি সম্পর্ক আছে তা আমি বুঝতে পারিনা। হিন্দিভাষী বাংলা জানা আমার পরিচিত একজনকে 'বড়লোক' শব্দটির মানে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন বাংলা ভাষার 'বড়লোক' মানে হিন্দির 'ধনী' বা 'ধনবান' বলা যেতে পারে অর্থাৎ যার অনেক ধন সম্পত্তি আছে। অর্থ আর বিষয় সম্পত্তি থাকলেই কি বড়লোক হওয়া যায়? আমার মতে বাংলা ভাষায় 'বড়লোক' ও 'ছোটলোক' শব্দ দুটির এরকম অপব্যবহার বন্ধ করা দরকার। যে অর্থে এখন বাংলা ভাষায় 'বড়লোক' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে বাংলা ভাষার দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রসঙ্গ পালটিয়ে আরেকটা মুহূর্তের কথা বলি। আমার দুই পিসী (জ্যোতিপিসী আর আরতিপিসী) ভারতীয় গন নাট্যসঙ্ঘের সাথে যুক্ত ছিলেন। সুরকার সলিল চৌধুরী, অনল চ্যাটার্জী, প্রবীর মজুমদার, এবং আরো অনেকে

আমাদের বাড়ী আসতেন। একদিনের ঘটনার কথা মনে পড়ে। মেঝেতে বসে সলিল চৌধুরী গান করছিলেন। বারান্দার দরজা বন্ধ ছিল কারণ মাইকে বাইরে থেকে গান ঘরে শোনা যাচ্ছিল। তা সত্তেও বাইরের লতাজীর গান ঘরে আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছিল। আমি সলিল চৌধুরীর গানের মধ্যেই উঠে বারান্দার দরজা খুলে লতাজীর গান শুনতে চলে গিয়েছিলাম। আমার ছোট পিসী (আরতি) আমাকে তার জন্য বকাতে আরতিপিসীর 'সলিলদা' বললেন, "আরতি, ছোটদের ফাঁকি দেওয়া যায় না। মেনে নাও, যে গান শুনতে আমাদের আসর থেকে ও উঠে গিয়েছিল, সেই গান আমার গানের চেয়ে নিশ্চয় ভাল ছিল। ছোটোরা ছল জানে না।" এমনই ছিলেন সলিল চৌধুরী। আরতিপিসীর বকুনি থেকে সলিল চৌধুরী আমাকে বাঁচালেন। জ্যোতিপিসীর বিয়েতে ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের অনেকে এসেছিলেন। একটা গানের আসর জমে উঠেছিল। মনে আছে, কলকাতার আমাদের সেই ১১৯, বিবেকানন্দ রোডের বাড়ীতে অপরেশ লাহিড়ী ও বাঁশুরি লাহিড়ী তাদের ছেলে বাপীকে (সুরকার বাপী লাহিড়ী) নিয়ে আসতেন। আমার ছোড়দি মঞ্জুদির কাছে শুনেছি জ্যোতিপিসী বাঁশুরি লাহিড়ীর টালিগঞ্জের বাড়ীতে গান শিখতে যেতেন। মঞ্জুদি সেখানে বাপীকে দেখেছিলেন; বাপী তখন কয়েক মাসের শিশু ছিল। শুনেছি, কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের বাড়ীতে আসতেন রেণুপিসীকে গান শেখাতে খুব সম্ভবতঃ যখন আমাদের বাড়ী পূর্ববঙ্গে (ওপার বাংলায়) ছিল। পিসীরা তাঁকে কাজীদা বলে ডাকতেন। ওপার বাংলা থেকে নজরুল-গীতি গায়িকা ফিরোজা বেগম রেণুপিসীর কাছে আসতেন তিনি ঠিক আঙ্গিকে নজরুল গীতি গাইছেন কিনা জানতে। তিনি রেণুপিসীকে নজরুল গীতির অথরিটি মানতেন। কাজী নজরুল ইসলামের কলকাতার বাড়ী যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমার ছোটবেলার কলকাতা ছিল সেই সময়ের যখন ভোর হলে পাইপ দিয়ে গঙ্গার জলে কলকাতার রাস্তা ধোয়া হ'ত আর সন্ধ্যা হলে ল্যাম্পপোস্টে মই দিয়ে উঠে গ্যাসের আলো জ্বালান হ'ত। ট্যাক্সির সাথে পাল্লা দিয়ে চার চাকার ঘোড়াগাড়ী চলত। গাড়ীর বাইরে সহিস তার বসার জায়গা থেকে ঘোড়াকে পরিচালিত করত। গাড়ীর পিছনে সহিসের অ্যাসিস্ট্যান্টের বসার জায়গা থাকত। এই জায়গাটা খালি থাকলে দুষ্টু ছেলেরা বিনা ভাড়ায় ঘোড়াগাড়ী চড়ে বেড়িয়ে নিত। কলকাতায় তিন তলার আমাদের ফ্ল্যাটের

ব্যালকনি থেকে রাস্তার গাড়ী-ঘোড়া দেখতে খুব ভাল লাগত। ভারতে মোটর গাড়ী তৈরি হয়ত তখন সবে শুরু হয়েছে। রাস্তায় তখন অস্টিন, বেবি অস্টিন, শেভ্রলেট, ফোর্ড, প্লিমাউথ, পন্টিয়াক, ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানির গাড়ী চলত। মনে পড়ে, একবার ধর্মীয় দাঙ্গার পরিস্থিতিতে কারফ্যুর সময় যখন সবার ঘরের ভিতর দরজা জানালা বন্ধ করে থাকার কথা, তখন কৌতুহলবশতঃ ব্যালকনি থেকে রাস্তা দেখার সময় মিলিটারি গাড়ী থেকে এক গোরা সৈন্য আমার মতন একটা ছোট্ট বাচ্চার দিকে বন্দুক তাক করেছিল।

আমরা ছোটরা আমাদের বাড়ীর পাঁচ তলার ছাদের একটা অংশে একটা ছোটো ফ্ল্যাটে এবং ছাদে খেলতে যেতাম। একদিন যখন ছাদে ছিলাম, তখন দেখলাম আকাশে দুটো প্লেন পরস্পরকে ধাক্কা মেরে জ্বলতে জ্বলতে আমাদের বাড়ীর কাছে, খুব সম্ভবত কলেজ স্ট্রীটের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ এলাকায়, লুটিয়ে পড়ল। এই মুহূর্তটি আমার স্বপ্নের ভিড়ের মধ্যে এখনও প্রায়ই আমি দেখতে পাই।

আমার ছোটবেলার কলকাতায় দিনের বেলায় আমার ব্যস্ত মাকে আমি কমই পেতাম আমার কাছে। রাত হলে বাড়ীর কোন এক কোনায় ঘুমিয়ে পড়তাম আর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে মাকে খুঁজতাম ঘুমন্ত ভীড়ের মাঝে।

# হালিফোঁ কী খতাফত

রেণুপিসী সপরিবারে তখন জামশেদপুরে। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে জামশেদপুরে প্রথমে আমরা রেণুপিসীর বাড়ীতে থাকতাম সাকচীর ৫৫, ঠাকুরবাড়ী রোডে শ্রী যাদব দত্তর বাড়ীতে। বাড়ীর নাম 'শান্তি-কুটির' বাড়ীর বড় মেয়ে শান্তিদির নামানুসারে। শান্তিদি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বাড়ীর ছাদে শান্তিদির অতুলনীয় গোলাপ বাগান ছিল। সেই সময় দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন ভাষার লোকেরা জামশেদপুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সবার 'কমোন' ভাষা ছিল হিন্দি, তাই সবাইকে হিন্দি জানতে হ'ত। আমার দাদা (বড়দা) কলকাতায় মামাবাড়ীতে থাকতেন। দাদা আদৌ হিন্দি জানতেন না। একবার দাদার জামশেদপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসার দিন আমাদের সহ-ভাড়াটে হিন্দিভাষী সিন্হা কাকিমা দাদাকে বললেন, 'কলকত্তাসে ফির আতে হ্যাঁয় তো জরুর ভেট কীজিয়েগা' যার মানে 'কলকাতা থেকে আবার এলে অবশ্যই দেখা করবেন'। হিন্দির 'ভেট' শব্দটার বাংলা মানে দাদা জানতেন না তাই 'ভেট কীজিয়েগা' মানে যে 'দেখা করবেন' তা দাদা বুঝতে পারলেন না। কতদিন আগেকার কথা এখনও মনে আছে। দাদা আমার কাছে জানতে চাইলেন সিন্হা কাকিমা ওদের জন্য কলকাতা থেকে ভেটকী (মাছ) আনতে বললেন কিনা।

আমার বড়দি (ভারতী), যাকে আমি দিদিমণি বলে ডাকতাম, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বি এস সি পাস করে জামশেদপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ হাই স্কুলে শিক্ষিকার কাজ পেলেন। সেলাইয়ে ডিপ্লোমা থাকায় আমার মা (শিশিরকণা বসু) সেই স্কুলেরই প্রাইমারি সেক্সনে শিক্ষিকার কাজ পেলেন। আমার লেখা প্রথম বইটি ('ইলেকট্রোমেগনেটিক থিওরি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন্স ইন বিম-ওয়েভ ইলেক্ট্রনিক্স' (ওয়ার্ল্ড সাইন্টিফিক পাব্লিশার্স)) আমার মা (শিশির কণা বসু)-কে উৎসর্গ করি। আমার লেখা অন্য একটা বই ('ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রোমেগনেটিকস এশেনশিয়াল্স' (ইউনিভার্সিটিস প্রেস)), আমার দিদিমণি এবং আমার পি এইচ ডি

সুপারভাইসার প্রফেসার নির্মল বরণ চক্রবর্ত্তীকে উৎসর্গ করি। পরে দিদিমণি জামশেদপুরে সেক্রেড হার্ট কনভেন্টে শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করেন। আমরা ছিলাম তিন ভাই, দুই বোন। জামশেদপুরে প্রথমে মা এবং দিদিমণির সাথে আমি ও আমার ছোড়দা (জয়ন্তদা) এসেছিলাম। কলকাতায় তখন আমার বড়দা (দিলীপ) মামাবাড়ীতে থেকে প্রথমে মেট্রোপলিটন স্কুলে এবং পরে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন, আর ছোড়দি (মঞ্জুদি) সেন্ট মার্গারেট হাই স্কুলে পড়তেন।

জামশেদপুরে যখন আমরা টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছি, তখন আমাদের এক 'শুভাকাঙ্ক্ষী' আমাদের ক্ষতি করার খুব চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, তিনি সেক্রেড হার্ট কনভেন্টে গিয়ে মাদারের সাথে দেখা করে আমার দিদিমণির নামে অপবাদ দিয়ে তাঁকে শিক্ষিকার পদ থেকে অপসারিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। ইতিমধ্যে দিদিমণি জামশেদপুরেই সি এস আই আর—ন্যাশনাল মেটালার্জিক্যাল ল্যাবরটারি (এন এম এল) প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে কাজ করার সুযোগ পেলেন। পরে দিদিমণি এন এম এল এ লাইব্রেরী থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ে লাইব্রেরী সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং গোল্ড মেডেল নিয়ে ডিগ্রী পান। আমার ছোড়দি, মঞ্জু রায় চৌধুরী, সাইকোলজি নিয়ে বি এ পাস করে দিদিমণির মতন কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ে লাইব্রেরী সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনা করেন, যদিও তিনি কোন লাইব্রেরীতে কাজ না করে জামশেদপুরে 'এল আই সি আই' তে কাজ করেন। পরে ১৯৬০ সালে, মঞ্জুদির পড়ার জগতের 'সাইকোলজি আর লাইব্রেরীর' এবং কর্ম ক্ষেত্র এল আই সি আই'এর 'ইনস্যুরেন্স আর পলিসি'র উল্লেখ করে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেল থেকে মঞ্জুদিকে অত্যন্ত কাঁচাহাতে অল্পবয়সী বালকের মতন একটা চিঠি লিখেছিলাম—

শ্রীচরণেষু মঞ্জুদি,

কেমন আছ তোমরা সবাই সেথায় জামশেদপুরে?
ভাবছি আমি তাই যে বসে কলকাতায় এত দূরে।
সেথায় আছে লাল মাটি, সেথায় বহে যে গরম বাতাস,
হাতছানি দেয় স্ল্যাগের আলোয় রঞ্জিত লাল আকাশ।
বেশি দিন তো নয়, মাত্র ক'দিন এসেছি কলকাতা,

লাগছে কেমন জানতে চাও? একেবারে যা-তা।
হস্টেলেতে তোমার চিঠি পেলাম এইতো আজি,
দেরী করে আমায় দিলেন হরিহর দারোয়ানজি।
কেমন চলছে তোমার সেথায় ইনস্যুরেন্স আর পলিসি,
সাইকোলজি আর লাইব্রেরীর গলায় যে দিয়ে ফাঁসি?
তোমাদের সকলজনে জানায়ে আমি প্রনাম,
ইতি টানি চিঠির শেষে লিখে আমার নাম।
—বৈদ্যনাথ

এন এম এল লাইব্রেরীতে কাজ করার সময় দিদিমণিকে কাজে সাহায্য করতেন রামনা (Ramna) নামে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। লাইব্রেরীর কোন র‍্যাকে কোন বই পাওয়া যাবে তা তিনি নিমিষে বলে দিতে পারতেন। দিদিমণি একদিন লাইব্রেরী থেকে বাড়ী ফিরে এসে আমাকে লাইব্রেরীর একটা মজার ঘটনা বললেন। জনৈক বিজ্ঞানী একটি বই খুঁজে না পাওয়াতে দিদিমণি নাকি তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন; বলেছিলেন—'লেট কামনা রাম', যদিও দিদিমণি বলতে চেয়েছিলেন—'লেট রামনা কাম'। (একে স্থানান্তর ত্রুটি ('স্পুনারিস্ম') বলা যেতে পারে)। আমার দিদিমণি নিজেই খুব মজা পেয়ে ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন। আরেক দিন দিদিমণি আমাকে বলেছিলেন ল্যাবরটরির এক বিজ্ঞানকর্মীর কথা যিনি জানতে চেয়েছিলেন লাইব্রেরীতে 'ইবিড' নামের কোন জার্নাল রাখা হয় কিনা। আদতেই 'ইবিড' নামের কোন জার্নাল হয়না। 'ইবিড' আসলে ল্যাটিন শব্দ 'ইবিডেম' কে ছোট করে লেখা। 'ইবিডেম' মানে 'একই জায়গায়' (ইন দ্য সেম প্লেস)। লেখার শেষে রেফারেন্স লিস্টে পর পর দুটো রেফারেন্সের অনেক অংশ এক বা 'কমন' থাকলে দ্বিতীয় রেফারেন্সে কমন অংশ আবার না লিখে 'ইবিড' লেখা হয়। উক্ত বিজ্ঞানী একটি রিসার্চ পেপারের শেষে যে রেফারেন্স লিস্ট দেখেছিলেন, সেখানে পর পর দুটো রেফারেন্সের প্রথমটায় একটাতে লেখকদের নাম, জার্নালের নাম ছিল, আর ছিল ভল্যুম নাম্বার, ইস্যু নাম্বার, ইয়ার, এবং পেজ নাম্বার। প্রথম ও দ্বিতীয় রেফারেন্সে লেখকদের নাম এবং জার্নালের নাম এক ছিল, কিন্তু ভল্যুম নাম্বার, ইত্যাদি আলাদা ছিল। তাই দ্বিতীয় রেফারেন্সে লেখকদের নাম এবং জার্নালের নামের বদলে ইবিড

(Ibid) লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ দ্বিতীয় রেফারেন্সে লেখকদের নাম এবং জার্নালের নাম প্রথম রেফারেন্স থেকে নিতে হবে। রেফারেন্স লিস্ট লেখার এই প্রথাটি সেই বিজ্ঞানকর্মীর জানা ছিল না। তিনি এটা দিদিমণির কাছে জানতে পারলেন। (এই বিষয়টি আমার লেখা একটা বইয়ে আলোচনা করেছি। প্রেন্টিস হল অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত আমার বইয়ে নাম "টেকনিক্যাল রাইটিং")। লিখতে লিখতে মনে পড়ে গেল ১৯৭০ সালের সেই মুহূর্তটি যখন দিদিমণি এন এম এল লাইব্রেরী থেকে একটি রিসার্চ জার্নাল আমাদের বাড়ী নিয়ে এসে আমাদের সবাইকে দেখালেন। সেখানে জীবনের প্রথম ছাপা অক্ষরে লেখা আমার নাম দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সেই মুহূর্তটি কি কখন ভোলা যায়?

পরে ১৯৭০-৭১ সালে, আমি আমার রিসার্চ সংক্রান্ত লিটারেচার সার্ভের জন্য এন এম এল এ-র লাইব্রেরীতে যেতাম রিজিওনাল ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজি (আর আই টি) থেকে, যেখানে আমি অনেক দিন শিক্ষকতা করেছি। লাইব্রেরীতে আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাক-ভল্যুম হলে লাঞ্চ আওয়ারে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাইরে থেকে তালা দেওয়া হ'ত। তালা দেওয়ার আগে লাইব্রেরীর এক কর্মচারী হাঁকতেন, "ভেতরে কি কেউ আছেন?" আমি কোন উত্তর দিতামনা। আর আই টি-র কয়েক ঘণ্টার শর্ট লিভে আমার একটি ঘণ্টাও নষ্ট করার উপায় ছিল না।

আমরা ছিলাম বসু রায় চৌধুরী পরিবার। আমরা নামের পরে কেউ লিখতাম বসু বা বোস, কেউ বা লিখতাম রায় চৌধুরী। যেমন ছোট দিদি (মঞ্জু) এবং আমার বড়দা (দিলীপ) লিখতেন 'রায় চৌধুরী' এবং আমার দিদিমণি, ছোড়দা (জয়ন্ত) লিখতেন 'বোস' ও আমি লিখতাম 'বসু'। আমার মা ও দিদিমনি আমাকে অঙ্ক শেখাতেন। আমার বড়দা আমাকে অঙ্কের সাঙ্কেতিক নিয়ম শেখাতে না পেরে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আমার সহকর্মীরা জানতে চেয়েছিলেন আমার বড় ছেলেকে কি এমন করে আমি তৈরি করেছি যে একবারেই দেশের নামী নামী মেডিকেল কলেজগুলোতে সে 'চান্স' পেয়ে গেল। আমি তখন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রফেসার ছিলাম। আমি তাঁদের বলেছিলাম আমি আমার ছেলেকে খুব বিশদভাবে অঙ্ক এবং ফিজিক্স

পড়িয়েছিলাম। ফলতঃ সে ঘাবড়ে গিয়ে মন দিয়ে পড়েছিল বটানি ও জুওলজি যা আমার আওতার বাইরে ছিল। আমার সহকর্মীরা ছেলেকে তৈরি করার আমার পদ্ধতি শুনেতো থঃ।

১৯৫০ দশকের জামশেদপুরে আমার ছেলেবেলার কথা লেখার আগে আমি শ্রী প্রমথনাথ বোস এবং জামসেদজি নাসেরওয়ানজি টাটাকে আমার প্রণাম জানাই। জামসেদজি নাসেরওয়ানজি টাটা সাকচী, জামশেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড ষ্টীল কোম্পানি (টিস্কো) স্থাপনা করেছিলেন। এর পেছনে জিওলজিস্ট প্রমথনাথ বোসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। উনি ১৯০৪ সালে জামসেদজি টাটাকে জানান ময়ুরভঞ্জ জেলায় লোহার খনির কথা এবং তাঁর অনুপ্রেরণাতেই টিস্কো এবং সাকচীকে ঘিরে জামশেদপুর শহর স্থাপিত হয়েছিল। ভারী সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা জামশেদপুর। দুই নদী, খরকাই আর সুবর্ণরেখা, শহরের পশ্চিম প্রান্তে এসে মিলেছে। জামশেদপুরে প্রথমে আমরা রেণুপিসীর বাড়ী উঠেছিলাম সাকচীর ঠাকুরবাড়ী রোডে। পরে আমরা সাকচীর ১৫, চেনাব রোডে একটা বাড়ীর ছোট্ট ঘরে চলে যাই। সেটা ছিল টিস্কোর এইচ-৬ কোয়ার্টারের রান্না ঘর। আমার মা সেই বাড়ীতে টিউশুনি করতেন। ঘরে ঢোকার দরজার সাথে লাগোয়া শোওয়ার জন্য একটা চৌকি ছিল। ঘরের মেঝেতে পা রাখার কোন জায়গা ছিল না। ঘরে ঢোকার এন্ট্রান্স ছিল সোজা শোওয়ার চৌকি। যার কোয়ার্টার ছিল তিনি নিজেদের জন্য কোয়ার্টার পরিসরে একটা বড় রান্নাঘর বানিয়ে নিয়ে ছিলেন। চেনাব রোডেই ছিল বিবেকানন্দ স্কুল, যেখানে আমার মা প্রাইমারী সেক্সনে পড়াতেন। চেনাব রোডের অন্য এক কোয়ার্টারেও মা টিউশুনি করতেন; সেখানে মামণি নামের একটি মেয়েকে পড়াতেন। মাঝে মাঝে আমার মা আমাকে একটা চিঠি দিয়ে মামণির মা'র কাছে পাঠাতেন পাঁচ টাকা ধার চেয়ে। মনে পড়ে একবার মার কাছে আবদার করেছিলাম ভাতের সাথে তরকারি খাওয়ার। মা রুটিকে ছোট ছোট কেটে সুতো দিয়ে বেঁধে 'তরকারি' বানিয়ে আমাকে খাইয়েছিলেন। মুহূর্তগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনা। আমার মার জীবনের অনেক সংঘাতের কাহিনী পরে জামসেদপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠানে এলে আশাপূর্ণা দেবী আমার মার কাছে শুনতে চাইতেন। পরিষদের তদানীন্তন কর্ণধার আমার এক পিসতুত জামাইবাবু ঊষাকান্ত

রায় জামশেদপুরে আশাপূর্ণা দেবীর থাকার ব্যবস্থা আমার বড়দি-জামাইবাবুর বাড়ীতে করতেন যেখানে তাঁর সাহচর্য্য দেওয়ার জন্য তখন আমার মা থাকতেন।

এরপর চেনাব রোডের সমান্তরাল হিউম পাইপ রোডের একটা সরকারী কোয়ার্টারের একটা ঘরে কিছুদিন আমরা থাকি। যাঁর কোয়ার্টার ছিল তিনি কোন ভাড়া নিতে রাজী হননি। তিনি বললেন ভাড়া নেওয়ার নিয়ম নেই। হিউম পাইপ রোডে থাকার সময় আমার ছোড়দা (জয়ন্তদা) সেখানে একটি ঘরে একটা ম্যাজিক শো করেছিলেন। তার আগে বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমরা টিকিট বিক্রি করেছিলাম। আমি ছিলাম ম্যাজিক-ঘরে ঢোকার গেটকিপার। সেই সময়ের আমার ঠাকুমাকে নিয়ে একটা মুহূর্তকে ধরে রাখতে ইচ্ছে করছে। তার আগে আমার ঠাকুমার পটভূমি জানাই। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের (পার্টিশনের) আগে পূর্ববঙ্গে (ফরিদপুরে) ঠাকুমা জমিদার-গিন্নী ছিলেন। প্রাসাদোপম বাড়ীতে থাকতেন। আমার মার কাছে শুনেছি, খেলার ছলে পিসীমারা বাড়ীর কোন এক প্রান্তে আমার মাকে রেখে পালিয়ে যেতেন। মা একা একা ফিরে আসতে না পেরে কাঁদতে থাকতেন। পিসীমারা তখন মাকে উদ্ধার করে ফিরে আসতেন। পার্টিশনের পরে সেই বাড়ীর ঠাকুমা অভাবের তাড়নায় পাল্টে গেলেন। স্মরণীয় মুহূর্তটা হল কলকাতা থেকে একবার জামশেদপুরে আমাদের হিউম পাইপ রোডের বাড়ীতে এসে মায়ের সেলাই এর হাত-মেশিনটি আমার ঠাকুমার পোটলাবন্দী করা। মায়ের রোজগারের একটা রাস্তা বন্ধ করে ঠাকুমা হাত-মেশিনটি নিয়ে চলে গেলেন। সেই মুহূর্তের মায়ের চোখের জল কি কখন ভোলা যায়?

এর পর জামশেদপুরে আমরা অনেক ভাড়া বাড়ীতে থাকতাম। এই ভাবে কোন এক সময়ে সাকচীর আমানত রোডের এক বাড়ীতে আমরা ভাড়া থাকতাম। আমাদের পাশের বাড়ীতে বুনাই কাকুরা থাকতেন। বুনাইদা এবং তার ভায়েরা উৎকল অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার ছিলেন। তাঁদের একটা ক্লাব ছিল—রাইজিং সান ক্লাব। তাঁরা ফুটবল এবং হকি খেলতেন। তাঁদের বাড়ীতে ওড়িশি থিয়েটারের রিহের্শাল দেখতে যেতাম। বুনাইদার জামাইবাবু গিরিধারী কাকুর চুল কাটা হবি ছিল। মাঝে মাঝে ছুটির দিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী সাইকেলে করে নিয়ে যেতেন। চুল কেটে, চান করে, গিরিধারী

কাকুর ছেলের সাথে খেলা করে এবং লাঞ্চ সেরে বিকেল বেলায় বাড়ী ফিরতাম। গিরিধারী কাকু সাইকেলে করে আমাকে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিতেন। আমানত রোডের সমান্তরাল কুলশি রোডের একটি বাড়ীতে রেডিও ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই বাড়ীর রেডিওর গান শুনতাম। জামশেদপুরে গুজরাত কচ্ছের আদি বাসিন্দাদের কাচ্ছি বলা হ'ত। সাকচী বাজারের এক কাচ্ছি রেস্টুরেন্টের সামনের রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে অনেকেই আমরা রেডিওর গান শুনতাম লতা, নুরজাহাঁ, সায়গলের। সেই সময়ে জামশেদপুরে অনেক জায়গায় 'রেডিও ময়দান' ছিল। সেইখানে তারের মাধ্যমে রেডিও স্টেশন থেকে মাইকে গান বাজনা শোনা যেতো নির্দিষ্ট সময়ে। রেডিও স্টেশনে স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশনা করতেন।

আমানত রোডে থাকাকালীন বিবেকানন্দ স্কুলে যাওয়ার পথে ক্লাসমেট গুরুপদকে সাকচী কোর্টের একটা রেস্টুরেন্ট থেকে নিয়ে নিতাম। সেখানে ও রেস্টুরেন্ট বয়ের কাজ করতো। স্কুল শেষে গুরুপদ আবার রেস্টুরেন্টে ফিরে যেত। গুরুপদ বাজার থেকে পাইকারি দরে বস্তা করে মুড়ি কিনে আনত আর গুরুপদর পিসীমা বাড়ী-বাড়ী গিয়ে মুড়ি বিক্রি করতেন। গুরুপদ বি কম পাশ করে এবং জামশেদপুরে 'এল আই সি আই'র ডেভেলপমেন্ট অফিসার হয়।

আমি ১৯৫২ সালে স্কুলে পড়া ক্লাস ফাইভ থেকে শুরু করি। স্কুল শুরু হ'ত প্রার্থনা সঙ্গীত—'ভব সাগর তারণ কারন হে'—দিয়ে । গান এক সাথে সব ক্লাস রুম থেকেই গাওয়া হ'ত। মনে আছে, আমার স্কুলের প্রথম দিন আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। হটাৎ গান শুরু হতেই আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বেঞ্চ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। সেই সময়ে ক্লাস এইট থেকে ইলেভেন পর্যন্ত হাই স্কুল হ'ত। বিবেকানন্দ স্কুলের হাই স্কুলে তিনটি সেকসন ছিলঃ 'এ' ও 'বি' ছিল সায়েন্স সেকসন। 'সি' ছিল আর্টস সেকসন। সবাই সায়েন্স সেকসনে যেতে চাইতো। আমিও তাই চাইতাম, কিন্তু ক্লাস সেভেনের রেজাল্টের ভিত্তিতে আমার সায়েন্স সেকসনে স্থান হ'লনা। আমি আর্টস সেকসনে হাই স্কুলে আমার পড়াশুনা শুরু করলাম।

আমার উপর বাজার করার, হরির কয়লার 'টাল' থেকে কয়লার গুড়ো বা খণ্ড লাইন দিয়ে কেনার, এবং সরকারি রেশনের দোকান থেকে গম

কিনে গম ভাঙ্গিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল। দশ-বার কিলো গ্রাম ওজন নিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার হেঁটে বাড়ী ফিরতে হ'ত। জনৈক সর্দার দর্শনসিংজী ছিলেন রেশনের দোকানের মালিক। আমি ক্লাসের পড়া, হোমটাস্ক রেশনের দোকানে লাইনে দাঁড়িয়ে করতাম। সর্দার্জী জোর করে আমাকে লাইনের প্রথমে আনতে চাইতেন। আমি সে সুযোগ নিতে রাজী না হওয়াতে তিনি যার-পর-নাই খুশি হয়েছিলেন। একবার গম কিনে অন্য এক দোকানে গম ভাঙ্গাতে গিয়ে দেখি আমাকে চার কিলোগ্রাম গম বেশি দেওয়া হয়েছে। সর্দার্জী ইচ্ছে করে আমাকে চার কিলোগ্রাম গম বেশি দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। অনেকটা পথ হেঁটে চার কিলোগ্রাম গম ফেরত দিতে চলে এলাম। এবারেও তিনি খুব খুশি হলেন এবং আমাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। সর্দারর্জী ছিলেন পাকিস্তানের রিফ্যুজি। আমরা ছিলাম পূর্ববাংলার রিফ্যুজি। আমরা বন্ধু হয়ে উঠলাম। সর্দার দর্শনসিংজী চাইলেন আমি ইউনিভার্সিটির সমস্ত ডিগ্রী পাই। তিনি আমাকে পড়াশুনো করার জন্য আর্থিক সাহায্য করতে চাইতেন। তিনি খুশি হয়েছিলেন যে পরে আমি রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বি টেক, এম টেক, এবং পি এইচ ডি ডিগ্রী পাই।

বিবেকানন্দ স্কুলে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অত্যন্ত জ্ঞানী শিক্ষকদের কাছে পড়বার। স্কুলের মাইনে নামমাত্র ছিল। বাংলা পড়িয়ে ছিলেন শান্তি স্যার এবং জীবন স্যার। শান্তি স্যার গণ্ডক রোডে সাকচী অ্যাথেলেটিক ক্লাব-ঘরের পাশের কোয়ার্টারে থাকতেন। তার কাছে ক্লাব-ঘরের চাবি থাকত। ক্লাব-ঘরে শারীরিক ব্যায়াম করার সাজ সরঞ্জাম থাকত। তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে আমরা ক্লাব-ঘর খুলে সেখানে ব্যায়াম করতাম। স্কুলে আমাদের অঙ্ক পড়িয়ে ছিলেন বীরেন স্যার। তিনি অঙ্ক বিষয়ে আমার উৎসাহ বাড়িয়ে দেন। তিনি সুবর্ণরেখা নদীর তীরে স্কুলের আশ্রমে থাকতেন। তিনি চেয়েছিলেন আমি এই অবৈতনিক আশ্রমে থাকি। কিন্তু আমার মা রাজি হলেন না। পরে বীরেন স্যার রামকৃষ্ণ মিশনের সন্নাসী হয়ে যান। জীবন স্যার একদিন ক্লাসে আমার বাংলা রচনার হোমওয়ার্কের ছেঁড়া খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পরে তিনি আমাকে খাতাটি মেঝে থেকে তুলে এনে অন্যান্য হোমওয়ার্কের খাতার সাথে রাখতে দিলেন। আমার খাতাটির পাতাগুলির

জায়গায়-জায়গায় ইঁদূরে কাটা ছিল। ছেড়া খাতাটি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। নতুন খাতা কেনার অর্থের অভাব ছিল। পরবর্তী ক্লাসে আমার রচনার খাতা নিয়ে জীবন স্যার কাঁদতে কাঁদতে আমার খাতা ছুঁড়ে ফেলার জন্য ক্ষমা চেয়ে আমাদের অপ্রস্তুত করে দিলেন। আমার ছেঁড়া খাতায় লেখা রচনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মনে পড়ে, আমাদের সবার প্রিয় মদন স্যার, যিনি আমাদের অঙ্ক পড়াতেন, একবার মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই সময়ে তিনি সব ক্লাসে ভাল ছাত্রদের কাছে তিনি (স্যার) কি ভাবছেন তা জানতে চাইলেন। আর্টস সেকসনের ফার্স্ট বয় আমি বলতে না পারাতে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি বললেন—সায়েন্স সেকসনের শম্ভু একটা জুয়েল বঠে (বটে)। কারণ শম্ভু তার মনের কথা বলতে পেরেছিল। শম্ভু, অর্থাৎ শম্ভুনাথ চ্যাটার্জী, মেধাবী ছাত্র এবং দক্ষ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। শম্ভুর কাছে পরে জানতে পারলাম মদন স্যারের প্রশ্নের উত্তরে শম্ভু গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল। কেন যে স্যারের মনের কথা যে শম্ভু-উচ্চারিত গায়ত্রী মন্ত্রই ছিল তা আজও আমার আর শম্ভুর কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের ম্যাচে কুইলা স্যারের লম্বা ফুটবল শট শম্ভুর ও আমার এখনও মনে আছে।

আমি আর্টস সেকসনে পড়তাম আর শম্ভু সায়েন্স সেকসনে। স্কুলে শম্ভুর সাথে আমাদের খুব একটা দেখাশোনা হ'তনা। কোন এক সময় আমরা জামশেদপুরে সাকচীর সঞ্জয় রোডে থাকতাম। সায়েন্স সেকসনের ভানু (রঞ্জিত মুখার্জী) পাশের আমবাগান রোডে থাকত। ভানুও, শম্ভুর মতন, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার জন্য বিখ্যাত ছিল। কলেজের পড়াশুনার শেষে ভানু টিস্কোতে আর শম্ভু টেল্কোতে কাজ করত। আর আমি জামশেদপুরের আর আই টি তে কাজ করতাম। [টিস্কো অর্থাৎ TISCO (Tata Iron and Steel Company); টেল্কো অর্থাৎ TELCO (Tata Enginering and Loomative Company) এবং আর আই টি অর্থাৎ RIT (Regional Institute of Technology)]। শম্ভু ও ভানুর আরো কথা আবার পরে বলার ইচ্ছে রইল।

আমাদের স্কুলের পাশ দিয়ে টিস্কোর 'স্যান্ডলাইন' এক্সপ্রেসের ছোট রেল লাইন বিছানো ছিল। এখন আর নেই। এই লাইন দিয়ে একটা 'টয়-

ট্রেন' সুবর্ণরেখা নদী থেকে 'স্যান্ড' বা বালি নিয়ে স্ট্রেটলাইন রোডের মুখকে ক্রশ করে, সাকচীর বড় মসজিদকে বাঁদিকে রেখে, টিস্কো চলে যেত। স্যান্ডলাইন এক্সপ্রেস যাওয়ার সময় স্ট্রেটলাইন রোডের মুখে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেত। কেউ কেউ চলন্ত ট্রেনে চড়ে অপর পারে চলে যেত। স্ট্রেটলাইন রোডের মুখে, মনে পড়ে, একটা ঘোড়াগাড়ীর স্ট্যান্ড ছিল। জামশেদপুরে তখন মোটর গাড়ির ট্যাক্সি ছাড়া ঘোড়াগাড়ীও ভাড়া পাওয়া যেত। স্কুলের কাছেই স্যান্ডলাইন এক্সপ্রেসের ছোট রেল লাইন ক্রশ করে বাঘাকুদা লেক। তেসরা মার্চ জামসেদজি নাসেরওয়ানজি টাটার জন্মদিনে বাঘাকুদা লেক এলাকায় রাত্রি বেলায় আতস বাজী পোড়ান হ'ত। সকাল বেলায় আমরা সব স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুল কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় টিস্কোর বিষ্টুপুর গেট দিয়ে টিস্কোতে ঢুকে জামসেদজি টাটার মূর্ত্তিতে মাল্যার্পণ করতাম। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় তেসরা মার্চ জামসেদজি টাটার জন্মদিনে স্কুল কলেজে ছুটি না থাকায় অবাক হয়েছিলাম।

আমার স্কুলে পড়ার সময় সময় জামশেদপুরে জুবিলি পার্ক বানানো শুরু হল। বাঘাকুদা লেকের সব জল বের করে তার মাঝখানে দ্বীপ বানানো হল। লেকের সব মাছ ট্রাকে করে জামশেদপুরের অন্য লেকগুলোতে, যেমন বেলডি লেকে, পাঠান হল। দ্বীপের মাঝখানে একশ চল্লিশ ফিটের ফোয়ারা বানানো হল। স্কুলের টিফিনের সময় আমার বন্ধু শ্যামলের (শ্যামল দে) সাথে স্যান্ডলাইন এক্সপ্রেসের ছোট রেল লাইনের উপর হাত ধরাধরি করে আমরা হাঁটতাম। শ্যামল ওর মামাবাড়ী ৬৮, পেনার রোড, সাকচীতে থাকত। সেই সময়ে আমরা ভাড়াবাড়ীতে—প্রথমে ৬৯, পেনার রোডে এবং পরে ৭১, পেনার রোডে—থাকতাম। শ্যামলের বাবা হোমিয়োপ্যাথ ছিলেন। অবশ্য তিনি জামশেদপুরে থাকতেন না। শ্যামলের কাছে হোমিয়োপ্যাথির ওষুধ থাকত। সেই সময়ের অনেকে হোমিয়োপ্যাথিতে বিশ্বাস করতেন না। মনে আছে, একবার দুষ্টুমি করে শ্যামলকে বলেছিলাম, "আজ মঙ্গলবার। সব দোকান বন্ধ। আমাদের বাড়ীতে চিনি বাড়ন্ত। এদিকে আবার আমার মা চিনি ছাড়া চা খেতে পারেননা। কয়েকটা শিশিতে আমার মার চা খাওয়ার জন্য হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের গ্লোব্যুল দিতে পারবি? যে কোন ওষুধ হলেও চলবে।"

পেনার রোডে থাকাকালীন গ্রীষ্মকালে প্রায়ই সাকচীর সবজি বাজার

আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। পেনার রোডের অনতিদূরে শীতলা মাতার মন্দির ছিল। মন্দিরের দোতলায় শীতলা মাতার মূর্তি ছিল। সন্ধ্যারতি দেওয়ার সময় মন্দিরের পূজারী আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। আমার পিঠে তার একটি মৃদু আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠত। আমার আসতে দেরী হলে দোতলায় একটা ভিড় জমে যেত। আমাকে দূর থেকে আসতে দেখলে দোতলার ভিড় 'আ গয়া, আ গয়া' বলে জয়-ধ্বনি করে উঠত।

শ্যামলের এক মামা ছিলেন সুনীল ঘোষ, বিখ্যাত ফুটবলার। তিনি লেফট আউট পোজিশনে খেলতেন। জামশেদপুরে প্রথমে তিনি সাকচী এথেলেটিক্স ক্লাব এবং পরে টেল্কোতে খেলতেন। পরে তিনি কলকাতার মোহনবাগান ক্লাবে খেলতেন। প্রদীপ ব্যানার্জি সাকচী এথেলেটিক্স ক্লাবে রাইট উইং পোজিশনে খেলতেন। এরপর তিনি কলকাতার ইস্টার্ন রেলওয়ে ক্লাবে খেলতেন। হেলসিঙ্কি অলিম্পিক থেকে ফিরে তিনি জামশেদপুরে আমাদের ৭১, পেনার রোডের বাড়ীতে এসেছিলেন। আমি তখন স্কুলে পড়তাম। তিনি আমার সাথে পাঞ্জা লড়ে ইচ্ছে করে হেরে গিয়েছিলেন আমাকে উৎসাহিত করবার জন্য। বিষ্টুপুরের রিগ্যাল গ্রাউন্ডে সাকচী এথেলেটিক্স ক্লাবের হয়ে প্রদীপ ব্যানার্জির অনবদ্য খেলা দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই খেলায় প্রদীপ ব্যানার্জি মাথায় গভীর চোট পেয়েছিলেন; তাঁর মাথা ফেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। ওনাকে মাঠ থেকে তুলে নিয়ে বিশ্রাম দেওয়ার কথা হচ্ছিল। প্রদীপ ব্যানার্জির বাবার বাধা দেওয়ায় ছেলেকে বিশ্রাম দেওয়া হল না; বাকী খেলাটা প্রদীপ ব্যানার্জি মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে খেলেছিলেন।

সেই সময়ে শ্যামলের সুনীল (ঘোষ) মামার ধারণা হল আমাকে ম্যাচের সময়ে নিয়ে গেলে তিনি গোল পাবেন। ম্যাচের দিন তাই তিনি আমাকে সঙ্গে করে মাঠে নিয়ে যেতেন। অন্যান্য দিন ম্যাচের সময়ে সাইকেলে সুনীল মামার জামাইবাবু আমাকে ও শ্যামলকে খেলার মাঠে (টেম্পল গ্রাউন্ড/ কিনান স্টেডিয়াম) নিয়ে যেতেন। তিনি তখন তাঁর শ্বশুর বাড়ীর এক অংশে আলাদা ভাবে থাকতেন। তিনি একজনকেই—একবার আমাকে আরেকবার শ্যামলকে—তাঁর সাইকেলে বসাতেন; বাকিজনকে সাইকেলের পেছন পেছন

দৌড়ে যেতে হ'ত। তাঁর কাছে তখনকার দিনের সেরা 'হাম্বার' সাইকেল ছিল বলে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর সাইকেলকে তিনি 'গাড়ী' বলতেন এবং খুব যত্ন করতেন।

মনে পড়ে যায়, একবার টেম্পল গ্রাউন্ডে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার টনি গ্রেগ, যিনি বেশ লম্বা ছিলেন, সম্ভবতঃ ছ'ফিটের একটু ওপরে, দুই ওভারের মাঝে ভারতের কম হাইটের ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কম হাইটের জন্য ঠাট্টা করছিলেন। টিস্কোর রুশি মোদী, যিনি খেলাধুলোকে উৎসাহিত করতেন, লাঞ্চের পর খেলা শুরু হওয়ার আগে মাঠে সুনীল কুমার পান্ডা এবং প্রদীপ শ্রীবাস্তবের সাথে টনি গ্রেগের ছবি তোলেন। এই দুজনেরই হাইট সাত ফিটের ওপরে ছিল। দুজনেই ভারতের বাস্কেট বল টিমের খেলোয়াড় ছিলেন। টনি গ্রেগ যোগ্য জবাব পেয়ে গিয়েছিলেন। টেম্পল গ্রাউন্ডে এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মনে আছে একবার সাকচীর বসন্ত সিনেমা হলে প্রদীপ শ্রীবাস্তব সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। আমাদের সিটের কয়েকটা সারি সামনে প্রদীপজী বসেছিলেন। সমস্বরে পেছন থেকে প্রদীপজীকে উদ্দেশ্য করে সবাই "বৈঠ যাইয়ে, বৈঠ যাইয়ে" বলাতে বসে থাকা প্রদীপজী দাঁড়িয়ে সবাইকে বিস্মিত করে দেন। সিনেমা হলের কর্মীরা এরপর প্রদীপজীকে হলের সবচেয়ে পেছনের সারিতে বসিয়ে সমস্যার সমাধান করেন।

জামসশেদপুরে টেম্পল গ্রাউন্ডে আমাদের সাকচী অ্যাথেলেটিক ক্লাবের ম্যাচের ফুটবল খেলার সময় বিনা-টিকিটের-আমরা গ্রাউন্ড সিক্যুরিটির তাড়া বাঁচিয়ে গ্রাউন্ডের উঁচু দেওয়াল টপকিয়ে মাঠের ভিতর পৌঁছে যেতাম। জামশেদপুরের মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাপোর্টার কুখ্যাত সন্ত্রাস মালাক—তার নাম 'মালাক'-এর অর্থ যে 'দেবদূত' তা ভুলে গিয়ে—তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে খেলার দর্শকদের উপর অত্যাচার করত। খবর পেয়ে আমাদের স্কুলের থ্রী মাস্কেটিয়ার্স (শ্যামা, জয়ন্ত ও নাড়ু) একদিন টেম্পল গ্রাউন্ডে এসে মালাককে এমন সায়েস্তা করলেন যে মালাক আর কোন দিনও টেম্পল গ্রাউন্ড-মুখো হওয়ার সাহস করল না। কলকাতার হস্টেলে থাকাকালীন আমি ছিলাম কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাপোর্টার। বন্ধুরা ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান ক্লাবকে সাপোর্ট করত। বেনারসে

থাকাকালীন কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বেনারসের সিগরা স্টেডিয়ামে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে এলে অবশ্যই আমি মাঠে হাজির থাকতাম। যাই হোক, যে থ্রী মাস্কেটিয়ার্সের কথা বললাম তার মধ্যমণি আর কেউ নয় আমার ছোড়দা জয়ন্তদা ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই জয়ন্তদা খুব ডানপিটে ছিলেন। কলকাতায় জর্জ টেলিগ্রাফ ইন্সটিট্যুট পড়ার সময় জয়ন্তদা কাউকে না জানিয়ে Indian Air Force (ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স) জয়েন করলেন। জয়ন্তদার কাছে শুনেছিলাম সেই সময় ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে কেরলের 'নায়ার'দের আধিক্য ছিল আর তাদের নিয়ে একটা রসিকতা চালু ছিল—Indian Air Force-এর প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরকে স্থানানিন্তরিত করে দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে বসিয়ে দিলে India 'Nair' Force (ইন্ডিয়া 'নায়ার' ফোর্স) হয়ে যায়। যাই হোক জয়ন্তদার পোস্টিং হল তাম্বারমে। সেখানে জয়ন্তদার একজন সিনিয়ার অবাঙালী অফিসার জয়ন্তদা একজন 'ডরপুক' বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও কেন ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স জয়েন করেছে এই নিয়ে ঠাট্টা করতেন। জয়ন্তদা বারণ করলে জয়ন্তদাকে রাইফেল কাঁধে নিয়ে অনেক মাইল দৌড়ানোর শাস্তি দিতেন। একদিন সেই অফিসারটি জয়ন্তদাদের ব্যারাকে এলে জয়ন্তদা তাকে—বাঙালী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে প্রণাম কর আর এই বাঙালী জয়ন্ত বোসকে সারা জীবনের জন্য মনে রাখ—এই বলে প্রচণ্ড মার দিয়ে অজ্ঞান করে বস্তায় ভরে মাঠে ফেলে দিয়ে আসেন। এইজন্য এরপর অবশ্যই জয়ন্তদাকে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ছাড়তে হল। আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার জয়ন্তদা আর আমি জামশেদপুরে বাড়ী ফেরার জন্য হাওড়া থেকে একটা দুরপাল্লার রেলগাড়িতে টাটানগরে যাওয়ার জন্য একটা রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্টে (সংরক্ষিত কামরায়) যাচ্ছিলাম। আমাদের কম্পার্টমেন্টে বিনা রিজার্ভেশনে জোর-করে-ঢোকা তথাকথিত অনেক ডেইলি প্যাসেঞ্জারের কয়েকজন তরুণ আমাদের পাশে বসে সহযাত্রী পরিবারের তরুণীদের বিরক্ত করছিল। জয়ন্তদার মুখ-চোখের ভাব পাল্টে যেতে লাগলো। জয়ন্তদাকে বললাম যে ওরা ক্ষমা চাইবে তাই জয়ন্তদা যেন ওদের ছেড়ে দেয়। এবার উত্যক্তকারীরা আমাদের নিয়ে ঠাট্টা শুরু করল। তারপর যা হওয়ার ছিল তাই হল। জয়ন্তদা চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে বিনা রিজার্ভেশনের ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের রক্তাক্ত করে কম্পার্টমেন্টের বাইরে ফেলে দিল। এরপর রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স

এসে জয়ন্তদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্যক্তকারীদের ধরে নিয়ে গেল। বাড়ী ফিরলে সবাই জয়ন্তদার জামায় রক্ত দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু জয়ন্তদার শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। ভাগ্য ভাল, সেই অ্যাকশনের সময় জয়ন্তদার সাথে তার পিস্তলটি ছিল না।

জামশেদপুরে সাকচীর ৬৯, পেনার রোডে থাকাকালীন আমাদের বাড়ীওয়ালা সর্দার ধন্না সিংহ ভিরদি (Dhanna Singh Virdi (DSV)) আমাকে নিয়ে সাকচী গুরুদ্বারা নির্মানের কাজ পরিদর্শন করতে যেতেন। আমি ছোট ছিলাম বলে আদর করে আমাকে তিনি 'ছোট্টু' বলে ডাকতেন। গুরুদ্বারা নির্মানের কাজে তার ইটের ভাট্টাতে তৈরী ইট ব্যবহার করা হ'ত যার এক দিকে DSV লেখা থাকত। ধন্না সিংহজীর বড় ও মেজ ছেলের গাড়ী মেরামত করার এবং অটোমোবাইলের ব্যাবসা ছিল। ধন্না সিংহজী নিজে তাঁর ইটের ভাট্টার কাজ পরিচালনা করতেন। তিনি আমায় বলেছিলেন মাত্র চার আনা হাতে নিয়ে তিনি জামশেদপুরে এসেছিলেন ট্রেনে করে পাঞ্জাব থেকে। জামশেদপুর রেলওয়ে স্টেশন টাটানগরে নেমে প্রথমে তিনি কুলির কাজ করে রোজগার করেন এবং তার পরেই জামশেদপুর শহরে প্রবেশ করেন। জামশেদপুরে সেই সময় শীতকালে খুব ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মকালে খুব গরম পড়তো। গ্রীষ্মকালে রাতে বাড়ীওয়ালার পরিবার এবং ভাড়াটেদের পরিবারের অনেকে ছাদে ঘুমাতে যেতাম। সকালে দেখতাম আমাদের বিছানা টিস্কোর চিমনি থেকে নির্গত কার্বনের কণায় ভরে আছে। ছাদ থেকে উত্তর দিকে দলমা পাহাড়ের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে পেতাম। সেই সঙ্গে দেখতে পেতাম সাকচী থেকে রাত্রি বেলার আকাশ মাঝে মাঝে লাল হয়ে যাওয়া। এর কারণ ছিল, আর ডি টাটা স্কুলের সামনের টিস্কোর বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতর ছোট রেলগাড়ীর ডিব্বাগুলো থেকে জলন্ত স্ল্যাগ ঢালা। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালে রাত্রি বেলায় দলমা পাহাড় লাল মালায় সুন্দরী হয়ে জামশেদপুরকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। পাহাড়ের জঙ্গলের ডালপালায় আগুনে সেই মালা গাঁথা হ'ত।

৬৯, পেনার রোডে ধন্না সিংহ-জীর ভিরদির ভবনে গ্যারেজের ওপরে নিচু ছাদের একটা ঘর আর তার সাথে ছোট একটা রান্নার জায়গা ছিল যা আমরা ভাড়া পেয়েছিলাম। বাড়ীর দোতলায় উঠে একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে

নেমে আমাদের দেড়-তলার ঘরে ঢুকতে হ'ত। আমরা দোতলায় উঠে বাথরুম আর ল্যাভাটরি শেয়ার করতাম সহ-ভাড়াটে অমরজিত সিং পরিবারের সাথে। দোতলায় অমরজিত সিং পরিবারের একটি ঘর আর রান্নাঘর ছিল। অমরজিত কাকুর ঘড়ি বিক্রি আর মেরামতের দোকান ছিল।

ভিরদি ভবনের একতলায় দুই ভাড়াটে পরিবার থাকত। চোপড়া পরিবারের পাউরুটি বানাবার কারখানা ছিল। আমাদের দেড়-তলা থেকে দোতলা যাওয়ার সিঁড়ি থেকে চোপড়া পরিবারের রান্নাঘর দেখা যেত তাঁদের রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে। সেখান থেকে দেখতাম কি ভাবে তন্দুরি রুটি বানানো হয়। চোপড়া পরিবারের দিদি আমার দিদিমনির সাথে সেক্রেড হার্ট কনভেন্টে শিক্ষকতা করতেন। কনভেন্টের অনতিদূরে লয়োলা স্কুল ছিল। ধন্না সিংহ-জীর ছোট ছেলে কান্তি (কালওয়ান্ত) লয়োলা স্কুলে পড়ত। ওরা তিনজন স্কুলে যাতায়াত করত ধন্না সিংহ-জীর বড় ছেলে গুরবচন সিংহ-জীর গাড়ীতে। গাড়ীটা ট্যাক্সি হিসেবেও ব্যবহৃত হ'ত। 'মরিস' গাড়ীটার নম্বর ছিল, খুব সম্ভবত, বি আর টি ৫২৫। গুরবচন সিংহ-জী অটোমোবাইলের ব্যবসা করতেন। কলকাতা থেকে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে তাদের নিয়ে গুরবচন সিংহ-জীর এই ট্যাক্সিটি ভাড়া করে আমরা 'ডিমনা' লেকে বেড়াতে যেতাম। একতলার দ্বিতীয় ভাড়াটে পরিবার ছিল ঘোষ পরিবার। ঘোষ কাকু টিস্কোর কন্ট্রাক্টার ছিলেন। তার ছোট ছেলে দীপু আমার বন্ধু ছিল আর বড় ছেলে মন্টুদা দূরপাল্লার দৌড়বীর ছিল। ওদের পোষা কুকুর আমার সাথে বেড়াতো। ওদের বাড়ীতে বড় জাতের একটা গরু ছিল। ঘোষ কাকিমা আমাকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গরুর দুধ খাওয়াতেন আর সে কথা আমার মাকে বলতে বারণ করতেন পাছে মা আমাকে বাধা দেন। বাড়ীর এক তলায় গ্যারেজের পাশে একটা সাইকেল থাকত। যে কেউ সাইকেলটা ব্যবহার করতে পারত; সাইকেলে তালা দেওয়া থাকত না। একটা রিস্ক ছিল যে সাইকেলে ব্রেক ছিল না। ব্রেকহীন এই সাইকেল নিয়ে সাইকেল শিখতে গিয়ে একবার একটা কালভার্টে ধাক্কা খেলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার বিশেষ চোট লাগেনি তবে সাইকেলের স্যামনের রডটা দু-টুকরো হয়ে গেল। চুপিচুপি সাইকেলটা গ্যারেজের পাশে যথাস্থানে রেখে দিলাম। পরে গিয়ে দেখলাম যে সাইকেলের রডটা জোড়া

লেগে গেছে। গ্যারেজে ওয়েল্ডিং-এর কাজ হ'ত; কেউ একজন সাইকেলের রডটা ওয়েল্ড করে দিয়েছেন। একদিন পেনার রোডে একটা সিংহের বাচ্চা—তখন তো তাই মনে হয়েছিল—কুড়িয়ে পেলাম। আমি আর কান্তি (ধন্না সিংহ-জীর ছোট ছেলে) ওকে ছাদে যাওয়ার দরজার কাছে বেঁধে রাখলাম ওর কাছে দুধের একটা ব্যবস্থা করে। কিন্তু মাঝরাতে সিংহের বাচ্চার গর্জনে (লেড়ি কুকুর-বাচ্চার কুঁই-কুঁই কান্নায়) সাড়া বাড়ী জেগে উঠল। আমাকে দুঃখ দিয়ে সিংহের বাচ্চাটিকে বড়রা বাড়ীর বাইরে বের করে করে দিল।

ভিরদি ভবনের দোতলায় বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে আমার অবাধ বিচরণ ছিল। ধন্না সিংহ-জীর ছোট ছেলে কান্তি আর আমি একই ক্লাসে পড়তাম, যদিও আমাদের স্কুল আলাদা ছিল। ওদের বাড়ীতে রোজই ক্যারাম বোর্ডের আসর বসত। যদিও আমি ছোট ছিলাম, ধন্না সিংহ-জীর ছেলেরা ক্যারাম বোর্ডের খেলায় আমার সাথে কেউ পেরে উঠত না। ওদের বাড়ীর আরেকটা আকর্ষণ ছিল রেকর্ড প্লেয়ারের গান। ওদের ছিল অটোম্যাটিক রেকর্ড চেঞ্জার। গ্রামাফোন রেকর্ড তখন প্রায় অচল। মনে আছে আমার আরও ছেলেবেলায় কলকাতায় মামাবাড়ীতে গ্রামাফোন রেকর্ডে শুনেছিলাম ওস্তাদ এনায়ত হুসেন খাঁ-কে যিনি তাঁর বাজনার পর নিজের নাম বলতেন এবং নামের শেষে বলতেন সিতারিয়ে—এনায়ত হুসেন খাঁ সিতারিয়ে। ধন্না সিংহ-জীর বাড়ীর রেকর্ড প্লেয়ারের গানের উল্লেখ করতে গিয়ে সুদূর অতীত থেকে ভেসে এল সেই ১৯৫৫ সালের দিলীপ কুমার ও সুব্বুলক্ষী অভিনীত 'আজাদ' সিনেমার সি রাম চন্দ্র-র সুরে লতা ও ঊষা মুঙ্গেসকারের গান—অপলাম চপলাম, চপলায়ী রে দুনিয়া কে ছোড়, তেরে গলি আয়ী রে, আয়ী রে। আয়ী রে।

সহ-ভাড়াটে অমরজিত সিং কাকু ও তাঁর ছেলে—আমার সমবয়সী, হরজিত—দুজনেই মৃদুভাষী ছিলেন। হিন্দিতে লেখা হরজিতের কবিতা আর গল্প আমাকে মুগ্ধ করত। কিন্তু একদিন অমরজিত সিং কাকুর বাড়ীতে ছোট্ট এক রত্তি মেয়ের চোখে আঁধার নেমে এল। কোনও এক অসুখে হরজিতের বোন মুন্নি 'বত্তি' (আলো) 'বত্তি-বত্তি' বলতে-বলতে ওর জায়জী-র (মা-র) কোল ছেড়ে একাকী অজানা আলোর দেশে চলে গেল। চলে গেল প্রকৃতির কোলে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়—

'তিনটি বছর সে বেড়ে উঠেছিল রোদে বৃষ্টিতে
তারপর প্রকৃতি বলল—এর চেয়ে সুন্দর ফুল
এ ধরায় ফোটেনি কভু
আমি যে ওকে নেব আমার করে ...' ।

আমাদের পাশের বাড়ী ৭০, পেনার রোডে আমার ক্লাসমেট নীলমনি ব্যানার্জীর দাদা বলাইদার সুরেলা উদাত্ত কণ্ঠে 'বৈজু বাওরা' সিনেমার নৌশাদের সুরে মহম্মদ রফির গান ভেসে আসত—ও দুনিয়া কে রখওয়ালে সুন দর্দ ভরে মেরে নালে।

৬৯, পেনার রোড থেকে একটা বাড়ী পরে অপেক্ষাকৃত বড় একোমোডেশনের ৭১, পেনার রোডের ভাড়াবাড়ীতে আমরা শিফ্ট করলাম। পেনার রোডে একমাত্র এই বাড়ীতেই ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না। বাড়ীওয়ালা ছিলেন আর ডি টাটা স্কুলের জনৈক শিক্ষক। তিনি তাঁর দেশের বাড়ীতে থাকতেন এবং পেনার রোডের বাড়ীতে তিনি একজন কেয়ারটেকার রমেনবাবুকে রেখেছিলেন। রমেনবাবুর সূত্রে আমরা বাড়ীটি ভাড়া পেয়েছিলাম। রমেনবাবু ছিলেন বাচ্চুদার (প্রবীর রঞ্জন দে-র) ভারত বিল্ডার্স কোম্পানির সহকর্মী। বাচ্চুদার বাবার ছিল সাকচী মসজিদের পিছনে ও স্ট্রেটলাইন রোডের পাসে স্যাঙ্গার রোডে টিস্কোর কোয়ার্টার। তিনি ছিলেন রেণুপিসীর শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়। বাচ্চুদা ছিলেন স্পোর্টসম্যান; কাপ আর মেডেলে তাদের বাড়ী ঠাসা থাকত। পরে আমার দিদিমনির সাথে বাচ্চুদার বিয়ে হয়। বাচ্চুদার বাবা মারা যাওয়ার পর, বাচ্চুদার মা এবং তাদের সাত ভাই আর চার বোনের পরিবার আমাদের সহ-ভাড়াটে হয়ে ৭১, পেনার রোডের এক অংশে ভাড়া নিয়ে চলে আসেন।

এই বাড়ীতে থাকার সময় আমার ছোড়দি (মঞ্জুদি) জামশেদপুর কোঅপারেটিভ কলেজে পড়তেন। ইভেনিং ক্লাস হ'ত বিষ্টুপুরের কে এম পি এম স্কুলে। কলেজ ছুটি হলে, রাত্রি ন'টার পর স্টেটবাসে মঞ্জুদি মসজিদের সামনে সাকচী পোস্ট অফিসের সামনের বাসস্ট্যান্ডে নামত। আমার ড্যুটি ছিল, টিস্কোর ন'টার ভোঁ বাজলে, মঞ্জুদিকে বাসস্ট্যান্ড থেকে নিয়ে আসার। আমার সাথে একই ড্যুটি ছিল মঞ্জুদির ক্লাসমেট অসীমাদির পোষা কুকুরের। কাউকে বলে দিতে হ'তনা, সেও মসজিদের পিছনে অসীমাদির বাড়ী থেকে,

ন'টার ভোঁ শুনেই বাসস্ট্যান্ডে অসীমাদিকে আনতে যেত। বাস আসতে দেরী হলে উদ্বিগ্ন হয়ে গলা থেকে একটা অদ্ভুত স্বর বের করে আমার কাছে অনুযোগ করত। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতাম, যদিও একই ভাবে আমিও উদ্বিগ্ন হতাম।

আমাদের উল্টো দিকের বাড়ীতে জনৈক মদনদা থাকতেন। তাঁর ওষুধের দোকান ছিল। তাঁকে নিয়ে খুব ছোট একটা স্কিট বা প্রহসন রচনা করলাম। রাস্তায় মদনদার সাথে দেখা হলে তিনি হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন কি খবর? বাড়ীতে তোমরা সবাই ভালো আছো তো? আমি উত্তর দিলাম—হ্যাঁ মদনদা, আমরা সবাই ভাল আছি। আমার উত্তর শুনে মদনদার মন খারাপ হয়ে গেল; আর হাসি-হাসি মুখ রইল না, কালো হয়ে গেল। কারণ সবাই ভালো থাকলে তো মদনদার ওষুধের দোকানের ক্ষতি! মদনদার ওষুধের দোকানের পাশেই ছিল ডাক্তার গাঙ্গুলির ডিসপেনসারি।

পেনার রোডের ছেলেরা রাস্তা জুড়ে ক্রিকেট খেলতাম। সবাই মিলে চাঁদা তুলে সরস্বতী পুজা করতাম। পেনার রোডে একটা বাড়ী আমাকে বরাবর আকর্ষিত করত। সেই বাড়ী থেকে দীদার সিং-জী পাব্লিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে গজল পরিবেশনা করতেন। আমরা রাস্তা থেকে তাঁর গান শুনতাম। মনে পড়ে একবার অনেকে মিলে ধন্না সিংহ-জীর একটা ট্রাকে চড়ে বাঘাকুদা লেকের পাশের জঙ্গলে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। রান্নার পুরোভাগে জয়ন্তদা ছিলেন।

ফুটবল খেলতে গিয়ে আমার বাঁ হাতের রিস্ট ভেঙ্গে গেল। ডাক্তার গাঙ্গুলি আর তাঁর কম্পাউন্ডার মিলে একটা বইয়ের নির্দেশ পড়ে-পড়ে আমার হাতে প্লাস্টার লাগিয়ে দিলেন। প্লাস্টার কাটার পর আমি আর রিস্টটা আর ঘোরাতে পারলাম না। সম্ভবত, ডাক্তার গাঙ্গুলি নির্দেশের শেষ পদক্ষেপ—যেখানে রিস্টটা ঘুরিয়ে প্লাস্টার করার কথা ছিল—মিস করেছিলেন। কলকাতায় আমার ফুলমামা আমাকে এক অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে নিয়ে যান যিনি আবার রিস্টটা ভেঙ্গে সঠিক ভাবে সেট করার বদলে আমাকে ফিজিওথেরাপির নির্দেশ দিলেন, যা আমার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হল। এরপর আমার দুটো পায়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। হাঁটুর ব্যথার জন্য আমাকে আউটডোর খেলা বন্ধ করে দিতে হল। একটু

বেকায়দায় আমার পা হাঁটু থেকে স্থানচ্যুত হয়ে যেত—কখনও বাঁ পা বাঁদিকে আর কখনও বা ডান পা ডানদিকে। তখন কারুর সাহায্যে পা-কে স্বস্থানে আনতে হ'ত। স্ক্ল্যাটার রোগের (schlatter disease-এর) এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারত সারজিক্যাল অপারেশন করে। তবে তাতে একটা রিস্ক ছিল—অপারেশনের পর এও হতে পারত যে হাঁটু তার কাজ করতে পারত না, যার ফলে পা সোজা হয়ে থাকত আর পা বেন্ড করা যেত না। অতএব সারজিক্যাল অপারেশন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এরপর থেকে বড় রাস্তা পার হবার সময় বা বাসে ট্রামে চড়ার সময় আমি কারু না কারুর সাহায্য নিয়ে থাকি। মনে আছে, একবার দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে ইউনিভার্সিটিতে বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। বাস এসে গেলে বাসে ওঠার সময়ে বাসের লাইনে একটি ছেলের হাত ওর গার্লফ্রেন্ডের হাত থেকে ছাড়িয়ে আমি পাকড়াও করলাম। বাসের লাইনের ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটা হাততালি দিয়ে উপভোগ করল। ছেলেটি বাসে উঠে আমাকে যত্ন করে একটা সীটে বসিয়ে দিয়ে ওর গার্লফ্রেন্ডের কাছে চলে গেল। এরপর আমার গন্তব্যস্থল আসার সময়ে আমি আমার সীট থেকে উঠে দাঁড়াতেই ছেলেটি আমার হাত ধরে অতি সাবধানে আমাকে বাস থেকে নামিয়ে দিল। ২০১৮ সালে, তখনও কোভিড মহামারী দেখা দেয়নি, চিনের চেংদু শহরে থাকাকালীন, ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা আমার পায়ের অসুবিধার কথা খেয়াল করত। সাধারণত আমি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে চেয়ারে বসেই ওদের পড়াতাম। তবে আমি যদি কখনো দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লিখতে যেতাম, তখন ওদের মধ্যে কেউ না কেউ ছায়ার মতন আমার পেছনে থাকত। মোটরগাড়ী থেকে সাবধানে আমার পা ধরে নামাত।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার আগেই ফেরা যাক আবার আমাদের পেনার রোডের কথায়। সাকচী বাজারের দিকে পেনার রোডের শেষের বাড়ীতে জয়ন্তদার ক্লাসমেট সুনীলদা (সুনীল সাহা) থাকতেন এবং পেনার রোডের মুখেই তাদের একটি মিষ্টির দোকান ছিল। টেল্কোর সাথে জার্মানীর মারসিডিজ-বেনজ কোম্পানির সহযোগ থাকাতে সেই সময়ে টেল্কোর অনেক কর্মীর জার্মানী যাওয়ার সুযোগ আসতো এবং সুনীলদা সেই সুযোগ নিয়ে জার্মানী গিয়েছিলেন। সুনীলদার বাবা তাঁদের মিষ্টির দোকানের ক্যাশ

কাউন্টার থেকে তাঁর পরিচিত পথচারীদের ডেকে তাঁর ছেলের বিদেশ যাত্রার কথা জানিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। বিদেশ থেকে চিঠি এলে পড়াতেন। প্রথম প্রথম আমার ভাল লাগতো। পরে ব্যাপারটা একঘেয়েমির পর্য্যায়ে চলে গেল এবং ওঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, বিশেষ করে স্কুল যাওয়া ও বাজার করার তাড়াহুড়োর মধ্যে, আমি ওঁদের দোকানের পেছনের রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আমার ছোটমাসী (নমিতা মাসিমা) এবং ছোটমেসো (সুনীল চন্দ, যিনি এই নামে ফুটবল খেলার মাঠে পরিচিত ছিল) তাদের মেয়েদের নিয়ে এলে আমাদের বাড়ীতে উৎসব লেগে যেত। এর আগে লিখেছিলাম, এই ছোটমেসোকেই বিব্রত করেছিলাম হারামজাদারা কোথায় থাকে জানতে চেয়ে। তিনি খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। দিলদরিয়া ছোটমেসো পারলে সাকচীর বাজারটা কিনে আনতেন। আর তিনি ফুটবল ছাড়াও খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলতেন। শীতলা মাতা মন্দিরের কাছে সাকচী জেল পাঁচিল লাগোয়া পুলিশ ব্যারাকের ভিতর ধন্না সিং জি-র ছেলে কান্তি আর আমার বানানো ব্যাডমিন্টন কোর্টে দুই সুনীলের ব্যাডমিন্টন খেলা দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে যেত—দু' জনেই ছিলেন আবার বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়, একজন জামশেদপুরের আমার বন্ধু শ্যমলের মামা সুনীল ঘোষ আর আরেকজন কলকাতার আমার মেসো সুনীল চন্দ। আমাদের খেলার জন্য তারকাটার বেড়া ফাঁক করে ব্যাডমিন্টন কোর্টে যেতে হ'ত। মনে পড়ে গেল, এই তারকাটার বেড়ার বাইরে শীতলা মাতা মন্দিরের দিকে তারকাটার বেড়া-লাগোয়া একটা পান-দোকানে পান খেতে আসতেন বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গীতানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কিংবদন্তি তবলাশিল্পী বেনারসের অনোখে লাল মিশ্র জী, যখন তিনি পেনার রোডে কারুর বাড়ীতে কয়েকদিনের অতিথি হয়ে থাকতেন।

জামশেদপুরে সেই সময় সাকচীর বেঙ্গল ক্লাবের সৌজন্যে আমরা স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পীদের পরিবেশনা শুনতে পেতাম। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, পণ্ডিত রবি শঙ্কর, ওস্তাদ আল্লা রাখা, বেগম আখতার (আখতারি বাই ফিরোজাবাদী), পণ্ডিত ভি জি যোগ, ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ, পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জী, পণ্ডিত ভীমসেন জোশী, এবং আরও অনেক গুণীজনের পরিবেশনা

আমি শুনেছিলাম বেঙ্গল ক্লাবের বাৎসরিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে। জামশেদপুরে অনেক হোটেল না থাকাতে, কয়েক দিন ব্যাপী সঙ্গীতানুষ্ঠানের সময় বহিরাগত সঙ্গীতশিল্পীরা পেনার রোডে বা জামশেদপুরের অন্য কোথাও কারও না কারোর বাড়ীর অতিথি হয়ে থাকতেন। এছাড়া পেনার রোডের পাশের ৫৫, ঠাকুরবাড়ী রোডে রেণুপিসীর বাড়ীতে অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীরা অতিথি হতেন। এমনই এক অনুষ্ঠানে, সেতারশিল্পী ওস্তাদ ইমারৎ (Immart) হুসেন খাঁ আমার ছোড়দা জয়ন্তদাকে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন নিজের নামের প্রথম অক্ষরে ইংরাজির I এর (আই) বদলে একটি সেতার এঁকে। আমি বিখ্যাত তবলাশিল্পী বেনারসের পণ্ডিত সামতা প্রসাদের অটোগ্রাফও নিয়েছিলাম যখন তিনি পেনার রোডে আমাদের ৭১, পেনার রোডের বাড়ীর উলটো দিকের বাড়ীতে অতিথি হয়ে ছিলেন। এর অনেক বছর পর আমি যখন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আই টী জিমখানার কালচারাল উইং-এর চেয়ারম্যান ছিলাম তখন আমি পণ্ডিত সামতা প্রসাদজীকে ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'কাশীযাত্রা'য় আমন্ত্রণ জানাই। তাঁর তখন একটি হাতই কাজ করত; তিনি এক হাতেই তবলা পরিবেশন করে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন। অটোগ্রাফ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, একবার বেনারস থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে প্লেনে আমার ঠিক পাশের সীটে বিখ্যাত বাঁশরীশিল্পী পণ্ডিত হরি প্রসাদ চৌরাসিয়া বসেছিলেন। তখনও প্লেন ছাড়েনি। বারবার তিনি পিছনের রোয়ে বসা তাঁর এক সহযাত্রীর সাথে বাংলাতেই কথা বলছিলেন। তখন তাঁকে আমি আমার আর তাঁর সহযাত্রীর সীটের অদলাবদলির প্রস্তাব দিই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার প্রস্তাব নাকচ করে লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমি কি করে আপনার সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হারাই?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন "বাই দি বাই, আপনি কি আমাকে চেনেন?" ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়েই প্লেনে তাঁরই বাজানো একটি ধুন বাজছিল। আমি তাঁকে বললাম, "শুনুন, এই ধুনেই তো আপনার পরিচয়!" উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি বাঁশী শুনতে ভালবাসেন? আমি ছাড়া কার বাঁশী শুনেছেন ?" আমি পান্নালাল ঘোষের নাম করাতে পণ্ডিত হরি প্রসাদজী বার বার নিজের কান স্পর্শ করে পান্নালাল ঘোষের উদ্দেশে নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। আমার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনতে ভাল লাগার কথা পণ্ডিতজীকে জানালাম। বললাম আমার মামার মামাবাড়ীতে ছেলেবেলায়

গ্রামাফোন রেকর্ডে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার গল্প। যেমন ইমদাদখানি ঘরানার ওস্তাদ বিলায়ত খাঁর বাবা, ওস্তাদ ইনায়ৎ খাঁ তাঁর পরিবেশনার পর বলতেন "ইনায়ৎখাঁ সিতারিয়ে"। আমি যখন বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেলে থাকতাম, তখন ফিজিক্স অনার্স পরীক্ষার আগের রাতে মহাজাতি সদনে আমার বন্ধুদের শত বারণ সত্ত্বেও ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁর সম্ভবত তাঁর জীবনের শেষ সঙ্গীত পরিবেশনা শুনতে গিয়েছিলাম। ওঁর সঙ্গ দিয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী মীরা ব্যানার্জী এবং প্রসূন ব্যানার্জী। সেই সব ঘটনার কথা পণ্ডিত হরিপ্রসাদজীকে বলেছিলাম। দিল্লীতে প্লেন থেকে নামার আগে আমি পণ্ডিতজীর অটোগ্রাফ চাইলাম। তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। উল্টে তিনিই আমাকে আমার অটোগ্রাফ দিতে বললেন। যাই হোক, অনেক কষ্টে ওনাকে আমি অটোগ্রাফ দিতে রাজী করালাম। তিনি তাঁর নিজের নাম লিখে তার নীচে একটি বাঁশী এঁকে দিলেন।

আমার হাই স্কুলের পড়াশুনা ১৯৫৮ সালে আমি আর্টস সেকসন থেকে শেষ করলাম। আমরা তখন ৭১, পেনার রোডে থাকতাম। সায়েন্স এবং আর্টস স্ট্রিম মিলিয়ে আমাদের স্কুল থেকে প্রায় দেড়শ ছাত্রর মধ্যে মাত্র চার জন ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিল। আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। এরপর আমার ইন্টারমেডিয়েট আর্টস পড়ার কথা। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি ইন্টারমেডিয়েট সায়েন্স নিয়ে জামশেদপুর কোঅপারেটিভ কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজ তখন টিস্কোর কে এম পি এম স্কুলে বিকেল বেলায় হ'ত। আর্টস থেকে সায়েন্স স্ট্রিমে আসা প্রায় অসম্ভব ছিল। আমার ছোড়দার (জয়ন্তদার) মধ্যস্থতায় তাও সম্ভব হল। কলেজের অফিসে শ্রী কুমারস্বামী সায়েন্স স্ট্রিমে আমাকে নিতে রাজী হলেন না, আমি স্কুলের আর্টস স্ট্রিম থেকে এসেছিলেম বলে। জয়ন্তদার যুক্তি, আমি এলিমেন্টারি ম্যাথেমেটিক্সে ইন্টারমেডিয়েট সায়েন্সে যারা ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছে তাদের চেয়ে স্কুলের পরীক্ষায় ভাল মারক্স পেয়েছি। স্কুলে যারা সায়েন্স স্ট্রিমে পড়ত, তারা এলিমেন্টারি ম্যাথেমেটিক্স ছাড়া আর একটি বিষয়, এডভান্সড ম্যাথেমেটিক্স, পড়ত। তারা এলিমেন্টারি ম্যাথেমেটিক্সের পরীক্ষা বোধ হয় অত গুরুত্ব নিয়ে দিত না। যাই হোক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ মহাবীর সিং জয়ন্তদার যুক্তি মেনে নিয়ে আমাকে ইন্টারমেডিয়েট সায়েন্সে ভর্তি করে নিলেন । বলা

বাহুল্য, স্কুলে সায়েন্স না থাকাতে কলেজে স্যারেদের ক্লাস বুঝতে আমার খুবই অসুবিধা হয়েছিল। সেই সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল মুরারি মোহন দাস (যে আমাদের স্কুলের সায়েন্স স্ট্রিমের ছাত্র ছিল), এবং মৃণাল মুখার্জি (যে বাংলা টিভি ও সিনেমা জগতে প্রসিদ্ধ হয়েছিল)। প্রফেসার চাওলা আমাদের ম্যাথেমেটিক্স, এবং প্রফেসার মহান্তি (মদন মোহন মহান্তি) আর প্রফেসার ব্যানার্জি (অধীর) ফিজিক্স এবং প্রফেসার রাজু কেমিস্ট্রি পড়াতেন। একই বিষয়, বয়েল্স ল ও চার্লস ল, ফিজিক্স ক্লাসে এবং কেমিস্ট্রি ক্লাসে পড়ান হ'ত। এটা আমাকে দ্বন্দ্বে ফেলেছিল। ক্লাসে প্রফেসার মহান্তি এলে ফিজিক্সের খাতা এবং প্রফেসার রাজু এলে কেমিস্ট্রির খাতা বের করতাম। প্রফেসার মহান্তি আমার কলেজ জীবনের প্রথম ক্লাস নিয়ে আমাকে ফিজিক্স পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে আর আই টি জামশেদপুরে আমি প্রফেসার মহান্তির সহকর্মী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

ডাটা মনে করার জন্য নানা উপায় বের করেছিলাম। যেমন বাতাসের ঘনত্ব মোটামুটি 0.00১২৯৩ গ্রাম প্রতি সিসি মনে রাখার জন্য মনে রাখতাম ক্লাসমেট রঘুনাথকে, যার রোল নাম্বার ছিল ১২, এবং অন্য এক ক্লাসমেট মুন্নারাণীকে, যার রোল নাম্বার ছিল ৯৩। রঘুনাথ এবং মুন্নারাণীকে এক সাথে পড়াশুনা করতে দেখা যেত। দুজনেই পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল। মুন্নারাণীর বাবার জামশেদপুরের আর আই টি-র গোড়াপত্তনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। এখন এই ইন্সটিট্যুটের নাম ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজি (এন আই টি)।

প্রফেসার মদন মোহন মহান্তি জামশেদপুর কোঅপারেটিভ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুপুরুষ চেহারা, উদাত্ত কণ্ঠে পড়ানো সমস্ত কলেজকে মুগ্ধ করে রাখত। পরে তিনি জামশেদপুর কোঅপারেটিভ কলেজ ছেড়ে জামশেদপুরের আর আই টি জয়েন করেন। আর আই টির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট স্থাপনায় প্রফেসার মহান্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরে আমার এই কলেজে কাজ করার সুবাদে প্রফেসার মহান্তিকে অনেক কাছ থেকে দেখা এবং তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার আর আই টিতে কাজ করার অভিজ্ঞতার মুহূর্তগুলো আমার এই স্মৃতিচারণে ধরে রাখার চেষ্টা করব।

জামশেদপুর কোঅপারেটিভ কলেজে পড়ার সময় আমরা থাকতাম এগ্রিকোর কাছে। এগ্রিকো-সীতারামডেরা লিঙ্ক রোডে (৪৩২, নিউ লেআউট)—শ্যামলের সুনীল মামার জামাই বাবুর নতুন বাড়ীর এক অংশে ভাড়া নিয়ে যেখানে আমরা সাকচীর ৭১, পেনার রোড থেকে চলে এসেছিলাম। সেখানে বাড়ীওয়ালা আর ভাড়াটে আমরা যৌথ পরিবারের মতন থাকতাম। অর্থাভাবে কলেজে হেঁটেই যাতায়াত করতাম; বাসে বা শেয়ার ট্যাক্সিতে করে যাতায়াত করার মতন আর্থিক সংগতি ছিল না। বাড়ী থেকে কলেজে যেতে দেড় থেকে দু ঘন্টা এক নাগাড়ে হাঁটতে হ'ত। ফেরার পথে টিস্কোর রাত্রি নয়টা ও দশটার ভোঁ শুনতে পেতাম। তখন টিসকোর ভোঁ আমাদের সময়ের জানান দিত। ভোঁ বাজত—সকাল পাঁচটা, ছ'টা, সাতটা, এবং সাড়ে এগারটায়; দুপুর সাড়ে বারোটা এবং দু'টায়; বিকেল চারটায়; এবং রাত্রি নয়টা ও দশটায়। যদ্দুর মনে পড়ে, দুপুর সাড়ে বারোটার এবং রাত্রি নয়টার ভোঁ বেশি সময় ধরে বাজত। তবে এখন ভোঁয়ের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। প্রথম যখন আমাদের একটা টেবিল ক্লক কেনা হল, তখন দারুণ একটা থ্রিল বা রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম।

আমার মেজ পিসীর মেজ ছেলে মিহিরদা এগ্রিকো-সীতারামডেরা লিঙ্ক রোডে আমাদের কয়েকটা বাড়ীর পরে বাড়ী ভাড়া নিয়ে চলে আসেন। মিহিরদা-খুশি বৌদির ছেলে টুটুল আমার কাছে থাকতে ভালোবাসত। আমাদের সামনের বাড়ীতে থাকত আমার বন্ধু রামা রাও যাকে দেখলে টুটুল আমার শেখান ছড়া বলত—রামা রাও, ইধর আও। খুশি বৌদি শুধু খুশি-ই নয়, খুব হাসি-খুশি ছিলেন। খুশি বৌদির বোন কলকাতা থেকে দিদির বাড়ীতে এলে আমাদের বাড়ীতেও বেড়াতে আসত। এসে আমার টেবিলে কোনও কাগজে ছবি আঁকলে আমার চেয়ে পনের বছরের বড় দিদিমনি ভয় পেয়ে আমাকে আগলে-আগলে রাখতেন। (কিন্তু কত দিনই বা দিদিমনি তার ভাইকে আগলে রাখতে পারলেন? এক ছেলেধরা মণিকুন্তলার কাছে দিদিমনির ভাই ধরা পড়ে গেল)।

মিহিরদা ছিলেন ডাক্তার। কোঅপারেটিভ কলেজে পড়ার সময় আমার টাইফয়েড হল এবং মিহিরদার ট্রিটমেন্টে ভাল হলাম। মিহিরদা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু অনেক ক্লাস মিস হয়ে যাচ্ছিল। এগ্রিকো-

সীতারামডেরা লিঙ্ক রোড থেকে হেঁটে বিষ্টুপুরে কলেজে যাওয়ার রাস্তায় সাইকেল-আরোহী মিহিরদার কাছে ধরা পড়ে খুব বকুনি খেলাম। পরে ১৯৯২ সালে লন্ডনে মিহিরদার বাড়ীতে মিহিরদা আমাকে বলেছিল যে সাইকেলের পিছনে ডাক্তারির ব্যাগ ঝুলিয়ে রোগী দেখে জামশেদপুরে মিহিরদার পসার হল না। এই সব কারণে মিহিরদা তখন লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। ল্যাঙ্কাস্টার থেকে দেশে (দিল্লী) ফেরার পথে মিহিরদা আমাকে লন্ডন রেল স্টেশন থেকে রিসিভ করে ওনার বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। ওনার বাড়ী থেকে রেণুপিসীর মেয়ে রুমির বাড়ী যাওয়ার পথে মিহিরদা আমাকে ব্রিক লেন দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য হয়েছিলাম, ব্রিক লেনের সব দোকানের নাম, বড়-বড় করে বাংলায়, আর, ছোট-ছোট করে ইংরাজিতে, লেখা ছিল।

এগ্রিকো-সীতারামডেরা লিঙ্ক রোডে আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে একটি চার্চ ছিল যার পাস দিয়ে হাঁটাপথে আমি গোলমুরি বাজারে পৌঁছে যেতাম। দিদিমনি সেই সময় সি এস আই আর-এর ন্যাশনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরটারি (এন এম এল)-তে কাজ করতেন। দিদিমনির এক সহকর্মীর সৌজন্যে আমরা গোলমুরির এন এম এল কলোনিতে একটা কোয়ার্টারে থাকার সুযোগ পেলাম। সংশ্লিষ্ট সহকর্মীর নিজস্ব বাড়ী থাকাতে তাঁর প্রাপ্য কোয়ার্টারটিতে আমাদের থাকতে দিলেন। আমাদের এক পাশের কোয়ার্টারে থাকতেন মিস গোমেজ ও তাঁর ক্রিশ্চান পরিবার আর অন্য পাশের কোয়ার্টারে থাকতেন এন এম এল-এর ফটোগ্রাফি বিভাগের কর্মী—যিনি শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত-পিপাসু ছিলেন এবং সেতার বাদক হালিম জাফর খাঁ-র ফ্যান ছিলেন—ও তাঁর শিখ পরিবার। আমরা ছিলাম হিন্দু। আর আমাদের ঠিক উল্টোদিকের কোয়ার্টারে থাকতেন এন এম এল-এর অটোমোবাইল বিভাগের কর্মী মঃ ইয়াকুব আলি ও তাঁর মুসলিম পরিবার তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে সইদা। এই সর্বধর্ম সমন্বয় প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে আমাদের অলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখতে যাওয়া। সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা একসাথে গিয়েছিলাম বিভিন্ন দেশ থেকে—রাশিয়ান এ ভি সুকভ, চাইনিজ বি জিয়া; ইন্ডিয়ান আমি, আর আমাদের কোরিয়ান ক্যাব-ড্রাইভার।

আমি বি এস সি পাস করা উপলক্ষে মঃ ইয়াকুব আলি তাঁদের বাড়ীতে

আমাকে 'দাওয়াত' দিলেন (নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন)। সইদা তখন সবে কলেজে পড়ছে জামশেদপুরে। আমি পড়েছি কলকাতায় বি এস সি। ব্যাপারটা দিদিমনির কাছে সুবিধের লাগল না। এখানেও দিদিমনি ভয় পেয়ে ওদের কাছ থেকে, সম্ভবত সইদার কথা মাথায় রেখে, আমাকে আগলে রাখতেন। এটা ছিল ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকের কথা, যদিও ঐ দশকের শেষে দিদিমনি আমাকে আর মণিকুন্তলার কাছ থেকে আগলে রাখতে পারলেননা। একবার আমার কলেজের ছুটিতে কলকাতা থেকে জামশেদপুরে এসে দেখলাম সইদাদের বাড়ী তালা-বন্ধ। শুনলাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সইদারা কলোনি ছেড়ে চলে গেছে এবং ওদের বাড়ীর প্রত্যেকটা জিনিস লুট হয়ে গেছে। এর অনেক দিন পর সরকারী কলেজ-পরিদর্শনে জামশেদপুর সাকচীর এক কলেজে কর্মরত সইদার সাথে আমার দেখা হয়েছিল।

আমাদের গোলমুরির এন এম এল কলোনির বাড়ীতে আমাদের সবার প্রিয় অ্যালসেসিয়ান 'মন্টি'র আবির্ভাব হল। জয়ন্তদা মন্টিকে সাকচীর ডাক্তার ব্রহ্মপদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছিলেন। মনে আছে, আমাদের নিপ্পন ট্র্যাসিস্টার ডিভানের উপর রাখা ছিল; বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের সানাই-বাদন হচ্ছিল। ছোট্ট মন্টি সামনের দু'পা ডিভানের উপর তুলে দিয়ে সুরের আরোহণ আর অবরোহণের সাথে-সাথে ওর মাথাটা একবার বাঁ দিকে আর একবার ডান দিকে ঘোরাচ্ছিল। আমার জামশেদপুর কোঅপারেটিভ কলেজের ক্লাসমেট তাপেশ্বর প্রসাদ একদিন আমাকে গোলমুরি বাজারের সংলগ্ন এক টিস্কো কোয়ার্টারের প্রাঙ্গণে সবুজ বেড়ায় ঘেরা দক্ষিণ ভারতীয় একটি রেস্টুরেন্টে একটা নতুন খাবার খাওয়াল। জানলাম খাবারটির নাম মাসালা দোসা। দাম চার আনা। এরপর থেকে প্রায়ই মাসালা দোসা আমাদের বাড়ীতে প্যাক করে নিয়ে আসতাম।

কোঅপারেটিভ কলেজের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত একটি ছোট গল্প হয়ে এখনও আমাকে অনাবিল আনন্দ দেয়। মজার এই ছোট গল্পটির নাম দেওয়া যাক: "জালিফোঁ কী দুনিয়ামেঁ হালিফোঁ কী খতাফত"। কলেজে ইন্টারমেডিয়েট সায়েন্স পড়ার সময় হিন্দীভাষীদের দু'টি হিন্দী থিওরি পেপার এবং অহিন্দীভাষীদের তার বদলে একটি হিন্দী থিওরি পেপার (রাষ্ট্রভাষা) এবং একটি ভার্নাকুলার পেপার, আমার ক্ষেত্রে বাংলা, পড়তে হ'ত। আমরা

বাংলাভাষীরা হিন্দীতে পুংলিংগ এবং স্ত্রীলিংগ প্রয়োগে খুব ভুল করতাম। যেমন, আমি ছেলে হই বা মেয়ে হই আমাকে লিখতে হবে—মৈনে রোটী খায়ী অথবা মৈনে চাওল খায়া। কারণ, কর্ম 'রোটী' স্ত্রীলিংগ এবং কর্ম 'চাওল' পুংলিংগ। 'নে' চিহ্নর সাথে ক্রিয়ার লিংগ নির্ভর করে কর্মের উপর। এখানে 'খায়ী' এবং 'খায়া' ক্রিয়া। উর্দুভাষীরা হিন্দীতে পুংলিংগ এবং স্ত্রীলিংগ প্রয়োগে খুব একটা ভুল করত না। বাংলাভাষী হওয়াতে আমি এই ভুলটা আমি করতাম। সবাইকে আমার নিয়ম বলেছিলাম। যেমন আমার মনে হচ্ছে 'মেরা কিতাব' কিন্তু লেখার সময় 'মেরী কিতাব' লিখে দেব। কিন্তু পরীক্ষায় আশ্চর্যজনকভাবে রাষ্ট্রভাষা বা হিন্দীতে আমি উর্দুভাষীদের চেয়ে বেশি মারক্স পেলাম। উর্দুভাষীরা আমার বেশি মারক্স পাওয়ার সিক্রেট জানতে চাইল। আমি তাদের বললাম—'খায়া' লেখার প্রবল ইচ্ছে হলে লেখার পূর্বমুহূর্তে আমি 'খায়ী' লিখে থাকি। আমি তাদের আরও বললাম—আমি হিন্দী কেন, উর্দুতেও তোমাদের হারিয়ে দিতে পারি। এরপর আমি উর্দুভাষীদের উর্দু পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ জানালাম। একদিন কলেজ ছুটির পর পরীক্ষা হল। ইতিমধ্যে আমাদের ক্লাসমেট শ্রীনিবাসনকে বিষ্টুপুর মেইন রোডে আমার জন্য সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে রেখেছিলাম। পরীক্ষার বিষয় হল যে উর্দুভাষীদের আমার উর্দু হিন্দীতে অনুবাদ করতে হবে। পরীক্ষায় আমার উর্দু ছিল জালিফোঁ কী দুনিয়ামেঁ হালিফোঁ কী খতাফত। আদতেই উর্দুতে এরকম কিছু হয় না। উর্দুভাষীরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। পরক্ষণেই তাঁরা বুঝতে পারল আমি তাদের ঠকিয়েছি। অবশ্যই তারা আমাকে তাড়া করল। বিষ্টুপুর মেইন রোডে আমার জন্য অপেক্ষারত শ্রীনিবাসনের সাইকেলে চড়ে ততক্ষণে আমি অনেক দূরে। পরের দিন থেকে ক্লাসরুমে দুই ক্লাসের মাঝে সময় পেলে কিছু ক্লাসমেটরা শ্লোগান দিত 'জালিফোঁ কী দুনিয়ামেঁ' আর তারপরই বাকী কিছু ক্লাসমেটরা জবাব শ্লোগান দিত—হালিফোঁ কী খতাফত!

# থাক থাক, অনেক হয়েছে, এবার থামো

ইন্টারমেডিয়েট সায়েন্স পরীক্ষা পাশ করার পর ভর্ত্তির পরীক্ষা পাশ করে খড়গপুর আই আই টি'র ইলেক্ট্রিনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে বি টেক পড়ার সুযোগ পেলাম। আমাকে একটি তালা, মশারি এবং আড়াইশ টাকা নিয়ে আই আই টি-তে রিপোর্ট করতে বলা হল। কিন্তু অর্থাভাবে সেখানে যেতে পারলাম না। পরে অবশ্য আমি সেই ডিপার্টমেন্টেই প্রফেসার নির্মল বরণ চক্রবর্ত্তীর কাছে পি এইচ ডি'র কাজ করি। থাকতাম খড়গপুর আই আই টি'র বি সি রায় হলে। যাই হোক, ঠিক হল ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা পাশ করে খড়গপুর আই আই টি না গিয়ে আমি কলকাতায় মামাবাড়ীতে থেকে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করব। আমার বড়দা (দিলীপ রায় চৌধুরী) তখন মামাবাড়ীতেই থাকতেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পি ডাবল্যু ডি-তে কাজ করতেন। দাদার সাথে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে ভর্ত্তি হলাম। আমার মামাবাড়ী ছিল কলেজের কাছেই তারক প্রামানিক রোডে। আমার বড় মামা (ফুলমামা) ছিলেন 'গরিবের ডাক্তার' সচ্চিদানন্দ গুহ। ছোট মামা সুনীল গুহ বেঙ্গল পটারিসে কাজ করতেন। কিছুদিন মামাবাড়ী থাকার পর আমি বিদ্যাসাগর হস্টেলে (বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেলে) চলে যাই।

বিদ্যাসাগর হস্টেল ছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। ১৯৬০ সালে তখন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের নাম বিধান সরণি হয়নি। বিদ্যাসাগর কলেজের অবস্থিতি শঙ্কর ঘোষ লেনে, যার শুরু বিধান সরণি থেকে। অবশ্য, বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেল থেকে বিধান সরণিতে না নেমে হস্টেল পরিসরের ভিতর দিয়েই, মেট্রোপলিটন স্কুলের একটা দিককে বাঁদিকে রেখে, বিদ্যাসাগর কলেজে যাওয়া যেত। এমন ও হয়েছে যে প্রায় এক মাস হয়তো আমি হস্টেল থেকে বাইরের রাস্তায় (বিধান সরণিতে) যাইনি। হস্টেলে এত আকর্ষণ ছিল যে বাইরে যাওয়ার কথা মনে পড়েনি। হস্টেল পরিসরের ভিতর দিয়েই কলেজে যাতায়াত করেছি। বিদ্যাসাগর কলেজে আমি বিখ্যাত প্রফেসারদের ক্লাস করার সুযোগ পেলাম। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে প্রফেসার হরপ্রসাদ দে এবং প্রফেসার

চন্ডীচরণ ব্যানার্জীর লেকচার শুনতাম। তাঁদের লেকচার শুনতে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা চলে আসত। বিদ্যাসাগর কলেজের অনার্স ছাত্রদের কিছুদিন ক্লাস করার পর একটা তথাকথিত 'এলিমিনেশন টেস্ট' দিতে হতো। সৌভাগ্যক্রমে সেই টেস্ট পাশ করে আমি ফিজিক্স অনার্স রেখে পড়ার জন্য কলেজের অনুমতি পেলাম।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের চারতলা বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেলে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্ররা থাকত, যদিও বেশির ভাগই আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের। বিদ্যাসাগর হস্টেল আমার কাছে একটা নতুন পৃথিবী উন্মুক্ত করল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও, বিহার, দিল্লি, মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা থেকে প্রায় দু'শ জন আমাদের হস্টেলে থাকত। তাদের সাথে থাকা, একসাথে খাওয়া দাওয়া করা সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। ছাত্রজীবনে সম্ভব হলে কিছু সময় সকলের হস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। সেই সময় বটানির প্রফেসার সুনীল বোস আমাদের হস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। তিনি রাত্রিবেলায় রাউন্ডে বেরলে আমরা সবাই পড়াশুনায় ব্যস্ত হওয়ার ভান করতাম। হস্টেলের একজন ম্যানেজার ছিলেন। তিনি মেসের বাজার করতেন। মেসে আমরা লাঞ্চ ও ডিনার নিতাম। প্রত্যেক ফ্লোরে বারান্দায় একটা ক্যান্টিন ছিল। হস্টেলের কোন এক কর্মচারী ব্যক্তিগত ভাবে ক্যান্টিন চালাতেন। আমার ক্যান্টিন ছিল মতিদার তত্ত্বাবধানে। মেসের রমেশদা পরীক্ষার সময় গেটে দাঁড়িয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের আশীর্বাদ করতেন। আশুদা ও হরিহরদা হস্টেলের দারোয়ান ছিলেন। হিন্দীভাষী হরিহরদা (হরিহর সিংহ) আমার সাথে হিন্দীতেই কথা বলতেন। কারণ, আমি হিন্দী জানতাম। তিনি আমাকে বলতেন, "তুমি ফিজিক্স অনার্স পড়। তোমাকে অনার্স রাখতে হবে। তুমি ঘাস-কাটা, ব্যাং-কাটাদের সাথে মিশবেনা। ওরা ভাল হয়না। " হরিহরদার কাছে ঘাস-কাটা মানে বটানি আর ব্যাং-কাটা মানে জুলজি। আমার সাথে ভাব ছিল জুলজির অমলদা (সামন্ত) এবং সুনীলদার (দাস) সাথে। হরিহরদার ধারণা ভুল প্রমান ক'রে অমল সামন্ত মেডিকেল পাস করে খড়গপুর শহরে ডাক্তারি করেন এবং সুনীল দাস এম এস সিতে ফার্স্ট হয়ে গোল্ড মেডেল পান। হস্টেলের একতলায় একজন মুচি কাকা তার ছেলেকে নিয়ে একটা মাথা গোজার ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। তিনি হিন্দীভাষী ছিলেন। তার ছেলে হিন্দী মিডিয়াম স্কুলে পড়ত। হিন্দী জানাতে তার ছেলেকে আমি পড়া দেখিয়ে দিতাম। হস্টেলের

ডাক্তারবাবুর বুলি ছিল "জল খাবে, ডাব খাবে, পেচ্ছাব করবে।" যাদের চিকেন পক্স হ'ত, তাদের হস্টেলের চারতলার সিকরুমে আলাদা রাখা হ'ত। তাদের জন্য ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। লুচি খাওয়ার জন্য "আমার চিকেন পক্স হয়েছে" বলে একবার কমল মুখার্জি নিজের বিছানাপত্র নিয়ে সিকরুমে চলে গেল। ছোঁয়াচে চিকেন পক্স রোগীদের সাথে দিনকয়েক থাকা সত্তেও ওর চিকেন পক্স হল না। হস্টেলের সুপারিন্টেনডেনন্টের বকুনি খেয়ে ওকে ক'দিন পরই সিকরুমের ভাল খাওয়া দাওয়া ছেড়ে নিজের রুমে চলে আসতে হল।

হস্টেলে ঢুকতেই আমাদের কমনরুমে ছিল একটা কেরাম বোর্ড, একটা টেবিল টেনিসের টেবিল আর একটা ভাল্ভসেট রেডিও। রবিবারের দুপুরে সবাই রেডিওতে কলকাতা রেডিও স্টেশনের 'অনুরোধের আসর' শুনতে কমনরুমে জড় হতাম। সেই সময়ে কমনরুমে আসার জন্য ওপর তলা থেকে সবার সিঁড়ি দিয়ে নামার কলরবে হস্টেল মুখরিত হয়ে উঠত। কমনরুমে বসার যথেষ্ট জায়গা না থাকাতে আমরা সবাই দাঁড়িয়েই গান শুনতাম। গানের আগে প্রিয় শিল্পীর নাম যেমন সন্ধ্যা মুখার্জীর নাম উচ্চারিত হলে সবাই সমস্বরে 'সন্ধ্যা মুখার্জী' বলে উল্লসিত হয়ে উঠত।

একতলায় ডাইনিং হলে কাঠের পিঁড়িতে বসে আমরা কাঁসার থালায় খেতাম। জল খেতাম কাঁসার গ্লাসে। লাঞ্চ বা ডিনারের আগে ডাইনিং হল জল দিয়ে ধোয়া হ'ত। দাঁড়ান অবস্থা থেকে সাবধানে পিড়িতে বসতে হ'ত যাতে পিড়ি গড়িয়ে না যায়। সাহসী ছেলেরা পিড়িতে দাঁড়িয়ে স্কেটিং করার সাহস দেখাত। যাদের বাড়ী কলকাতার কাছকাছি বাইরে, তারা ছুটির দিন বাড়ী চলে যেত। তাদের মাছের ভাগ যারা হস্টেলে থাকত, তারা পেয়ে যেত। বাড়ী যাওয়ার আগে মেসে তারা বলে যেত তাদের মাছের ভাগ কাদের দিতে হবে। মেসের কর্মচারীদের সাথে বিশেষ ভাব থাকাতে ছুটির দিন আমি অনেক মাছ পেতাম। কিন্তু মনে আছে একবার মেসের কর্মচারী শ্রীকান্তদার পা দিয়ে আলু সেদ্ধ মাখা ধরা পরে যাওয়ায় আমরা বিচলিত হয়েছিলাম। পাউরুটির নাম পাউরুটি যে কারণে রাখা হয়েছিল সেই কারণেই তিনি আলু সেদ্ধ মেখেছিলেন।

বৃষ্টির পর কলকাতার অনেক জায়গায় জল জমে যেত। একবার শ্যামবাজার এলাকায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। বৃষ্টির পর সিনেমা হলের ভিতর জল জমতে শুরু করল। আমার সিট পর্যন্ত জল ওঠাতে হল ছেড়ে

বাইরে যেতে বাধ্য হলাম।সিনেমা হল থেকে হস্টেলে ফিরতে বেশ কসরত করতে হয়েছিল। রাস্তায় চলা ডবল ডেকার বাস চলায় জলের ঢেউ উঠে ফুটপাতে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হস্টেলে কোন এক সময়ে আমার চেয়ে বয়সে ছোট সংস্কৃত অনার্সের ছাত্র বিশ্বনাথ রায় আমার রুমমেট ছিল। সে আমার স্বাস্থের খেয়াল রাখত; একটা স্পিরিট ল্যাম্পে আমার জন্য রোজ দুধ গরম করে দিত। একবার বিশ্বনাথের গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গ্রামের নাম শশাটি। বাগনান রেল স্টেশনে নেমে শশাটি গিয়েছিলাম। গ্রামের কাছেই বিরাট চওড়া নয়নাভিরাম হুগলী নদী। মাটির বাড়ীর দোতালায় আমি ঘুমিয়েছিলাম। গ্রামের বাড়ী থাকার অভিজ্ঞতা প্রথম হল। আত্মভোলা কিষাণ লাল চ্যাটার্জী একবার আমার রুমমেট হয়েছিল। কিষাণদা ফিজিক্স অনার্সে আমার চেয়ে এক বছর সিনিয়র ছিল। অত্যন্ত মেধাবী কিষাণদা, সিলেবাস বহির্ভুত ফিজিক্স এবং ম্যাথেমেটিক্স বিষয়ে নাওয়া খাওয়া ভুলে, দিন রাত পড়াশুনা করত। তাঁকে জোর করে ডাইনিং হলে নিয়ে যাওয়া আমার একটা কাজ ছিল। ফিজিক্স প্র্যাকটিকেল পরীক্ষায় পাস করতে না পারায় কিষাণদাকে এক বছর পিছিয়ে আবার আমদের সাথে আবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। প্র্যাকটিকেল পরীক্ষায় কিষাণদা রিডিং নিয়ে গ্রাফ এঁকে রিডিংএর ডাটা ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিত। রিডিংএর ডাটা এবং সেই সঙ্গে সেই ডাটা নিয়ে গ্রাফ দেওয়াকে কিষাণদা 'ডুপ্লিকেশন' মনে করত। এটা ঠিকই যে জার্নাল পেপারের নিয়ম অনুযায়ী কিষাণদার কোন ভুল ছিল না, কিন্তু বি এস সি পরীক্ষার খাতায় এই যুক্তি গ্রহনযোগ্য ছিল না। পরের বার ফিজিক্স প্র্যাকটিকেল পরীক্ষায় আমি আর কিষাণদা একই ল্যাবরেটারিতে ছিলাম। আমার অনুরোধে পরীক্ষক খেয়াল রেখেছিলেন যাতে কিষাণদা পরীক্ষার খাতায় রিডিং এবং গ্রাফ দুটোই রাখে। ফিজিক্স অনার্স পাস করে কিষাণদা নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চলে যায়। শোনা যায়, সেখানে কৃষকদের এক আন্দোলনের সময় ফিজিক্সের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র কিষাণ লাল চ্যাটার্জী কোন এক সংঘর্ষে মারা যায়।

ভোলানাথ যেমনই ছিল ফিজিক্সে প্রতিভাবান, তেমনি ছিল সে দুষ্টুমির চুড়ামণি। আমার অনেক বারণ সত্তেও ভোলানাথ একবার আমাকে নিয়ে বিনা টিকিটে সিনেমা চলাকালীন দোতলার ব্যালকনির খোলা গেট দিয়ে একটা সিনেমা হলে ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন গেটকিপার টিকিট চাইতে এলে তাকে

বেমালুম বলে দিল যে জায়গাটা আমাদের একটা রেস্টুরেন্ট মনে হয়েছিল। গেটকিপারের অনুরোধে আমরা হল থেকে বেরিয়ে এলাম কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কিছুটা সিনেমা দেখা হয়ে গেছে। হস্টেল থেকে বন্ধু বান্ধবের সাথে মাঝে মাঝে আমরা কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত কফি হাউসে যেতাম। সেখানে অনেক গুণীজনের দেখা পেতাম। দুষ্টু ভোলানাথ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিজের দুই কানে দুই চাবির গোছা গলিয়ে কফি হাউসে যেত।

মেইন গেট ছাড়া হস্টেলের পেছনে প্রতিটি তলায় যাওয়ার জন্য কোলাপ্সিব্ল গেট ছিল, যা সাধারণত তালা দিয়ে বন্ধ থাকত। তবে লক্ষ্য করেছিলাম রাতের দিকে হস্টেলের চারতলার কোলাপ্সিব্ল গেটে কোন তালা থাকতনা। হস্টেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্ট স্যার সেই গেট দিয়ে হস্টেলে ঢুকে হস্টেলের টয়লেট ব্যবহার করতেন। সুপারিন্টেনডেন্টের অনুমতি ছাড়া অনেক রাতে হস্টেলের বাইরে থাকার নিয়ম ছিল না। ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলে, যেমন ৯টা-১২টা নাইট শো সিনেমা দেখার পর, চুপি চুপি সেই চারতলার খোলা কোলাপ্সিব্ল গেট দিয়ে আমি আর ভোলানাথ হস্টেলে ঢুকে পড়তাম। কাজটা গর্হিত ছিল। এরকম ক্ষেত্রে তাই আমরা নিজে থেকেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্ট স্যারের সাথে দেখা করে আমাদের দোষ স্বীকার করে নিতাম। তিনি আমাদের উপর রাগ না করে আমাদের সততায় বরঞ্চ খুশিই হতেন। ভোলানাথ আর আমি মাঝে মাঝে হস্টেল থেকে রাতের কলকাতার নিঝুম রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়তাম। একবার মাঝ রাতে লালদীঘিতে এক পুলিশ কাকুর কাছে বকুনি খেলাম। তিনি আমাদের রাতের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থেকে সাবধান করে দিলেন। গ্রীষ্মকালে হস্টেলের পাঁচতলার 'ন্যাড়া' ছাদে রাতে শুতে যাওয়ার দুঃসাহস করতে আমি আর ভোলানাথ পিছপা হতামনা।

হস্টেলে রোজ রোজ পালং শাক খেতে খেতে একবার বিরক্ত হয়ে আমি আর ভোলানাথ হস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট বটানির প্রফেসার সুনীল বোস স্যারকে জানাই পালং শাকে রেডিও অ্যাকটিভিটি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ক্রমাগত পালং শাক খাওয়া যে স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকর তাও প্রমানিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওঁর সম্ভাব্য অজানা খবরের কাগজের প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করতে আমরা ভুললাম না। বটানির প্রফেসার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কল্পিত এই খবরটা তাঁর না জানাতে আমারা অবাক হওয়ার ভান

করলাম। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি, আমাদের সাজেশনে, পালং শাকের বদলে ফুলকপির ব্যবস্থা করে দিলেন। হস্টেলে মাসে একবার ফিস্ট হ'ত। তখন মেসের কর্মচারীদের রান্নার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেত। ফিস্টের পর বন্ধুদের সাথে হস্টেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপারের পানের দোকান থেকে পান বা কোল্ড ড্রিংক খাওয়ার কথা মনে পড়ে।

দুষ্টুমির প্রতিযোগিতায় এক রাতে আমাদের রুমে গ্রীষ্মকালে গরম কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হস্টেলের ছেলেরা সুপারিন্টেনডেন্ট স্যারকে ডেকে আনলে আমি "সুপারিন্টেনডেনন্ট স্যার আমাদের খেয়াল রাখেননা" বলে হাহাকার করতে থাকলাম। উনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হস্টেলের ছেলেরা আমার কথা ভুলে ওনাকেই সান্ত্বনা দিতে থাকল। সকাল বেলায় আমি ভাল না হলে আমার বিখ্যাত ডাক্তার মামাকে খবর দেওয়া হবে বলাতে উনি বাড়ী চলে যান। পরের দিন ভোরে উনি আমি কেমন আছি জানতে আমাদের রুমে ছুটে আসেন। ওনার সাথে আমাদের দুষ্টুমির জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিই।

হস্টেলে একদিন জানতে পারলাম প্রফেসার সত্যেন্দ্র নাথ বোস প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বাংলা মাসিক পত্রিকার একটি সংখ্যা সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। কলেজস্ট্রীট বাজার থেকে উধাও হওয়ার আগে আমরা সেই সংখ্যাটি জোগাড় করেছিলাম। সেই সংখ্যাতে সত্যেন বসুর লেখা একটি প্রবন্ধে, যদ্দুর আমার মনে পরে, তিনি লিখেছিলেন যে কয়েক বছর আগেও চীনে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন নিউক্লিয়ার সায়েন্সে ভারত অনেক এগিয়ে আছে চীন থেকে। কিন্তু এখন চীন ভারত থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এর একটা কারণ তিনি চীনের সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি বলে মনে করেন।

হস্টেলে থাকাকালীন দুর্ভাগ্যবশতঃ একবার কলকাতায় ধর্মীয় দাঙ্গা হয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ এক সন্ধ্যায় কার্ফ্যু ঘোষণা হয়ে গেল। শ্যামবাজার এলাকায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের একটি সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে তা জানতে পারলাম। বড় রাস্তায় টহল দেওয়া পুলিশের গাড়ী ফাঁকি দিয়ে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গলি গলি দিয়ে হস্টেলে ফিরেছিলাম । বড়ই ঝুঁকি ছিল বিবেকানন্দ রোড পেরিয়ে এক গলি থেকে অপর পারের গলিতে ঢুকে পড়া। হস্টেলের সব চেয়ে কাছের গলি ছিল আর্য্যকন্যা বিদ্যালয়ের গলি। সেই গলির মুখেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে টহল দেওয়া পুলিশের

গাড়ী দেখতে পেলামনা। আমার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে হস্টেলের দিকে হাঁটতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম বীনা সিনেমার দিক থেকে একটা পুলিশের গাড়ী আমার দিকে আসতে আরম্ভ করেছে। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে হস্টেলের গেটে পৌঁছতেই সৌভাগ্যক্রমে অপেক্ষারত হস্টেলের দারোয়ান আশুদা হস্টেলের গেটের চাবি দেওয়া গেট খুলে দিলেন। পিছনে পুলিশের বকুনি শুনতে শুনতে আমি হস্টেলের কমনরুমে ঢুকে পড়লাম।

মনের আঙিনায় আরেকটি মজার ছোটগল্প উঁকি দেয়। গল্পটি ক্লাস 'বাঙ্ক' করে একদিন আরতিপিসীর মেয়ে তুলতুলকে নিয়ে আরতিপিসীর এক কমরেড ডাক্তার (চাইল্ড স্পেশালিষ্ট) মণি বিশ্বাসের কাছে যাওয়াকে নিয়ে। দিনটিতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মেয়ে অনিতা বসু কলকাতায় এল্গিন রোডে এসেছিলেন। তার আসার কথা সেই দিনের খবরের কাগজ পড়ে জেনেছিলাম। একটা ক্লাসের শেষে পরের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে যেই আমি উঠেছি, কয়েকজন ক্লাসমেট আমাকে জিগ্যেস করল, "কোথায় চললি ?" উত্তর দেবার আগে আমার মাথায় দুষ্টুমি চাড়া দিয়ে উঠল। ওদের আমি খুব বকে বললাম, "তোরা কি আজকের খবরের কাগজে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মেয়ে অনিতা বসুর কলকাতায় আসার কথা পড়িস নি? এল্গিন রোডের বাড়ীতে অনিতাকে নিয়ে হৈচৈ হচ্ছে আর আমি এখানে ক্লাস করব?" এমন ভাব করলাম যেন আমি, বৈদ্যনাথ 'বসু', যে সুভাষ চন্দ্র 'বসু'র আত্মীয় তা ওদের জানা উচিত ছিল। আমার ক্লাসমেট ভোলানাথ মুখার্জী আমাকে সাবধান করে দিল আমি যেন সুভাষ চন্দ্র বসুতেই 'স্টিক' করে থাকি। ভবিষ্যতে যেন আমি, বৈদ্যনাথ 'বসু', ভুল করে নিজেকে জগদীশ চন্দ্র 'বসু'র আত্মীয় বলে পরিচয় দেওয়ার ভুল না করি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল ডাক্তার মণি বিশ্বাস, যার কাছে ক্লাস না করে আমি গিয়েছিলাম, আরতিপিসীকে বলেছিলেন, "আরতি, তোমার মেয়ে যথেষ্ট সুস্থ। আমার ক্লিনিকে এসে অন্য অসুস্থ বাচ্চাদের কাছ থেকে ও ইনফেক্টেড হয়ে যেতে পারে। ও অসুস্থ না হলে ওকে নিয়ে আমার ক্লিনিকে এসোনা। ওকে ফলের রস খাওয়াও।" ক্লিনিক থেকে বের হয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর আরতিপিসীর মনে হল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করা হয়নি কোন ফলের রস খাওয়াতে হবে—মৌসুম্বি না কমলা লেবু। ডাক্তার মণি বিশ্বাস ক্লিনিকে ব্যস্ত, আমি আরতিপিসীকে অনেক বারণ করলাম। আরতিপিসী আমার কথা না

শুনে আবার ডাক্তারের কাছে গেলেন। আমি শুনতে পেলাম আরতিপিসীর মণিদা বলছেন, "আরতি, পানের দোকানের সুপারি থেকে রস বের করেও তুলতুলকে খাওয়াতে পার।" এই ঘটনাটিও যেন আর একটি মজার ছোটগল্প, যার নাম দেওয়া যেতে পারে "পানের দোকানের সুপারির রস।"

বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার এবং বিদ্যাসাগর হস্টেলে থাকার সময় আমার স্মরণীয় মুহূর্তগুলো থেকে আর একটি ছোটগল্পটির শুরু সেই সময়ে যখন এক শনিবার ছুটির পর আমি হস্টেল থেকে ভোলানাথের সাথে ওদের বাড়ী ভাটপাড়ায় যাচ্ছিলাম। শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে নৈহাটি গিয়ে সেখান থেকে সাইকেল রিকশায় ভাটপাড়ায় যেতে হ'ত। একবার দুপুর দুটো দশের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরার জন্য শিয়ালদা স্টেশন পৌছুতে একটু দেরি হয়ে গেল। টিকিট কাটার লাইনে খুব ভিড় দেখে ভোলানাথ আমাকে নিয়ে টিকিট না কেটেই সোজা প্লাটফর্মের দিকে রওয়ানা হল। আমি টিকিট কাটার জন্য জোর করাতে ভোলানাথ বেজায় বিরক্ত হয়ে টিকিট কাটতে গেল। টিকিট কাটার লাইনের ধাক্কাধাক্কির ধকলটুকু নিজেই নিল। ও যখন টিকিট কেটে লাইন থেকে বেরিয়ে এলো তখন দেখি ওর হাতে মাত্র একটা টিকিট। ভোলানাথ টিকিটটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "তোমার জন্য আবার ট্রেনটা মিস না হয়ে যায়।" আমি চিন্তায় রইলাম কারণ ও জানাল নিজের জন্য ও টিকিট কাটেনি। ও বলল, "তোমার টিকিট তোমার কাছে, আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না।"

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। অবশেষে টিকিট চেকার মহাশয় আমাদের কাছে এলেন। কিন্তু ভোলানাথ নির্বিকার এবং মধ্যমণি হয়ে সহযাত্রীদের সাথে ভাব জমিয়ে গল্প-গুজবে মশগুল। টিকিট চেকার মহাশয় ভোলানাথের কাছে টিকিট চাওয়াতে ও আমাকে দেখিয়ে দিল। তিনি আমার টিকিট দেখে ভোলানাথকে বললেন, "এটাতো ওর টিকিট, তোমারটা কোথায়"? উত্তরে ভোলানাথ বলল—শিয়ালদা থেকে নৈহাটি চল্লিশ কিলোমিটার। কিলোমিটারে একবার দরে নৈহাটির ভাড়া চল্লিশবার। আমি নৈহাটি নেবে যাব। এই বলেই ভোলানাথ নিজের কানদুটি ধরে "এক, দুই, তিন" গুনতে গুনতে ওঠ বোস শুরু করে দিল। সারা কম্পার্টমেন্ট উল্লসিত হয়ে উঠল! টিকিট চেকার মশাই বড়ই ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পালিয়ে বাঁচলেন বলে উঠে—থাক থাক, অনেক হয়েছে, এবার থামো!

# ভোলানাথের সাথে আমার "রিলেশন" ভাল ছিল

বি এস সি ফিজিক্স অনার্স পাস করার পর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে (১) পিওর ফিজিক্স, (২) রেডিওফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, এবং (৩) অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স এই তিনটির বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ার সুযোগ থাকত। আমি যখন ফিজিক্স অনার্সের ছাত্র নৃপেনদা (নৃপেন পুরকাইত) তখন ফিজিক্স অনার্স পাস করে আমাদের হস্টেলে থেকেই রেডিওফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স নিয়ে পড়তেন, প্রথমে বি টেক এবং পরে এম টেক, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ প্রাঙ্গনে, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি-তে (৯২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড)। প্রতিষ্ঠানের নাম ইন্সটিট্যুট অফ রেডিওফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স (INRAPHEL) (ইনর‍্যাঅফেল)। এই ইন্সটিট্যুট ইনর‍্যাফেল প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞানী শিশির কুমার মিত্রর অনস্বীকার্য অবদান ছিল। নৃপেনদা আমাকে এই বিষয়ে বি টেক এবং পরে এম টেক পড়তে আগ্রহী করেন। আমি রেডিওফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগে ভর্তি হলাম এবং ভোলানাথ অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স বিভাগে। তবে প্রথমবার বি এস সি কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় পাস করতে না পারায়, ক্লাসে আমি ভোলানাথ থেকে এক বছর পিছিয়ে পড়ি। নৃপেনদা ইনর‍্যাফেলে আয়নোস্ফিয়ার সায়েন্স বিষয়ে গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রী পান। অত্যন্ত মেধাবী এবং সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পারদর্শী আমার বন্ধু ভোলানাথকে কর্মজীবনে সারা পৃথিবীতে ঘুরতে হ'ত। ফলে ওর সাথে আমার পরে কমই দেখা হ'ত।

১৯৬৩ সালে ইনর‍্যাফেলের বি টেক ক্লাসে অনেক মেধাবী ছাত্রকে আমার ক্লাসমেট হিসেবে পেলাম। তারা অনেকেই স্কুল বোর্ড এবং/অথবা বি এস সি ফিজিক্স অনার্স পরীক্ষায় ব্যাঙ্ক হোল্ডার। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল সমীর লাহিড়ী, প্রদীপ সাহা, প্রশান্ত বসু, সুব্রম্যম অনন্তকৃষ্ণান, দেবীদাস মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব বসু এবং রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। কর্মজীবনে এরা সবাই তাদের বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল। দু'বছর বি টেক

পড়ার পর আমরা এক বছর এম টেক পড়লাম। বিশ্ববরেণ্য প্রফেসারদের কাছে আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছিল। আমাদের ক্লাসমেট অজিত মণ্ডল প্রফেসার অরুণ কুমার চৌধুরীর (এ কে সি'র) সার্কিট থিওরির ক্লাসে একটা প্রশ্ন করাতে অন্য এক ক্লাসমেট ঠাট্টা করে মৃদুস্বরে বলে উঠল, "ডক্টর 'মাণ্ডলে' স্পিক্স।" মনে আছে এ কে সি এই ঠাট্টার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি, তোমাদের সবার আগে অজিত ডক্টরেট করে তোমাদের টিটকারির জবাব দেবে।" সত্যি, আমাদের ক্লাসমেটদের মধ্যে সবার আগে অজিত মণ্ডল এবং দুলাল রায় চৌধুরী প্রায় একই সময়ে এ কে সি'র কাছে ডক্টরেট করে। অজিত আমাকে বলেছিল, "সে কোথায় উঠেছে দেখে তার সাফল্য বিচার করবেনা; বিচার করবে সে কোথা থেকে কোথায় উঠেছে দেখে।" অজিত এবং দুলাল যথাক্রমে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এবং দিল্লী কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংকে প্রফেসার হিসেবে তাদের কর্মজীবন বেছে নেয়। ক্লাসের পড়া বুঝতে সমীর আমাকে অনেক সাহায্য করত। এম টেক ক্লাসে সমীর আমার প্রজেক্ট পার্টনার ছিল। আমাদের প্রজেক্ট গাইড ছিলেন ডক্টর সুনীল রঞ্জন দাস। তিনি আমাদের থিয়োরি ক্লাসে টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতেন। এছাড়া তিনি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং পড়াতেন। পরে ডক্টর দাস ইনব্যাফেল থেকে বিদেশের অনেক ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে নিজের বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হন এবং ক্যানাডার অটোয়া ইউনিভার্সিটি থেকে অবসর নিয়ে সেখানেই এখন এমেরিটাস প্রফেসার পদে কর্মরত। সমীর এবং দুলাল খুব সুন্দর ছবি আঁকত। সমীর আমার পি এইচ ডি থিসিসের বিভিন্ন চ্যাপ্টারের ছবি এঁকে দেয়। দুলাল তো অসাধারণ ছবি আঁকত; ওর আঁকা ছবি আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত হ'ত।

সমীর খড়গপুর আই আই টিতে মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার তৈরি করেন প্রফেসার নির্মল বরণ চক্রবর্তীর (এন বি সি) তত্ত্বাবধানে। সমীর ও প্রশান্ত ইনব্যাফেলে সেমিকন্ডাক্টর বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসার বিশ্বরঞ্জন নাগের (বি আর এন এ) কাছে ডক্টরেট করে। প্রশান্তর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী তার অপটিক্যাল সেমিকন্ডাক্টর-এর উপর কাজ এবং এই বিষয়ে ওর লেখা অনেক পেপার ও চারটি বিশ্বসমাদৃত বইয়ের জন্য। দেবীদাসও বি আর এন এর কাছে ডক্টরেট করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রফেসার হয়। একবার

দেবীদাস যখন একা অনেক রাত পর্যন্ত রিসার্চ ল্যাবে ছিল, ভুল করে ইউনিভার্সিটির ওয়াচম্যান ওকে বাইরে থেকে ল্যাবে তালা দিয়ে চলে যায়। মোবাইল ফোনের তখন প্রচলন ছিল না এবং দেবীদাসের ল্যাবে কোন টেলিফোন ছিল না। তবে ল্যাব থেকে ইমেল করা যেত। কিন্তু দেবীদাসের বাড়ীতে ইমেলের ব্যবস্থা ছিল না। দেবীদাস তখন আমেরিকায় তার এক ছাত্রকে ইমেল করে। অতঃপর ছাত্রটি দেবীদাসের বাড়ীতে টেলিফোন করে। অবশেষে দেবীদাসের ছেলে ইউনিভার্সিটি থেকে দেবীদাসকে উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে আসে। এরকম একটা ঘটনা একবার আমার সাথেও ঘটেছিল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে আমি ডি আর ডি ও-র একটা সিলেক্সন কমিটির মীটিং এটেন্ড করতে গিয়েছিলাম। গেস্টহাউসের বিরাট ছাদ খোলা পেয়ে সেখানে আমি মর্নিওয়াক করতে গেলাম। ফেরার সময় দেখি কেউ ছাদের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। দরজা ধাক্কাধাকি করে কোন সাড়া পেলামনা। সৌভাগ্যক্রমে আমার কাছে মোবাইল ফোন ছিল। তবে আমার কাছে গেস্টহাউস অফিসের ফোন নাম্বার ছিল না। ব্যাঙ্গালোরে একটি ডি আর ডি ও ল্যাবে কর্মরত আমার প্রাক্তন ছাত্র সুব্রতকে ফোন করলাম। সুব্রত গেস্টহাউস অফিসে ফোন করল। তবেই আমি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলাম।

মুহূর্তটা মনে আছে যেদিন ওয়েভগাইড বিষয়ের এম টেক ক্লাসের শুরুতে বি আর এন প্রদীপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রদীপ ইউনিভার্সিটি অফ লীডস-এ ডক্টরেট করতে যাবে কিনা। প্রদীপ এম টেক পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার রেজাল্টের প্রতীক্ষা না করে ইউনিভার্সিটি অফ লীডস-এ চলে গেল। সেমিকন্ডাক্টর বিষয়ে অগাধ পণ্ডিত বি আর এন অনায়াসে প্রাঞ্জল ভাষায় ইলেকট্রমেগনেটিক থিওরি আধারিত ওয়েভগাইড বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য মাইক্রওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দরজা খুলে দিলেন। রঞ্জন এন বি সি-র কাছে ডক্টরেট করে এবং আই আই টি খড়গপুরে প্রফেসার হয়। অনন্তকৃষ্ণান টাটা ইন্সটিট্যুট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে জয়েন করে রিসার্চ স্কলার হয় এবং বম্বে ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করে। ও এই ইন্সটিট্যুটের ন্যাশনাল সেন্টার ফর রেডিও এসট্রোফিজিক্স থেকে সিনিয়র প্রফেসার এবং ডিরেক্টর রূপে রিটায়ার করে। অনন্তকৃষ্ণানের উটি লার্জ রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনা ও তার পরিচালনায় অবদানের কথা কারোর

অজানা নেই। ও এখন পুনে ইউনিভার্সিটিতে এডজাঙ্কট প্রফেসার এবং রাজা রামান্না ফেলো রূপে কর্মরত। প্রশান্তর একটা লেখায় পড়েছিলাম আমাদের ইনব্যাফেলের শিক্ষক প্রফেসার মৃণাল কান্তি দাসগুপ্তর (এম কে ডি জি) 'রেডিও নয়েস' বিষয়ে একটি বক্তৃতা অনন্তকৃষ্ণানকে রেডিও এস্ট্রনোমিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এম কে ডি জি নোবেল লরিয়েট পি এম এস ব্লাকেটের কাছে ডক্টরেট করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে গ্যালাক্সির মাঝখানে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব প্রমান করেছিলেন। মনে আছে আমরা একবার ইনব্যাফেলের পাশ্ববর্তী সাহা ইন্সটিট্যুট অফ ন্যুক্লিয়ার ফিজিক্সে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রফেসার সত্যেন্দ্র নাথ বোস। প্রফেসার বোস একটি প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ঘরের ছেলে মৃণালের কথা কেউ বলেনা। উনি মৃণাল বলতে এম কে ডি জি-র উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে এম টেক করার পর আমি রেডিও এস্ট্রনোমি বিষয়ে ডক্টরেট করার জন্য ইনব্যালফেলে এম কে ডি জি-র কাছে জয়েন করি। এম কে ডি জি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ইনব্যাফেলে রিসার্চ শেষ না করেই তাঁর অনুমতি আর আশীর্বাদ নিয়ে আমি ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অরগানাইসেশনের (ডি আর ডি ও) ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ ল্যাবরাটরি (ডি এল আর এল), হায়দ্রাবাদ জয়েন করি। ল্যাবরাটরির ডিরেক্টর ছিলেন শ্রী নারায়ণ রাও। সিলেকশনের ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রী নারায়ণ রাও এবং এক্সপার্ট ছিলেন স্বনামখ্যাত রাডার বিজ্ঞানী ডঃ আর পি শেনয়। ডঃ শেনয় আমাকে রাডার রেঞ্জ সংক্রান্ত একটা নিউমেরিক্যাল প্রশ্ন করেছিলেন। ডঃ শেনয়ের কাছে চেয়ারম্যান শ্রী রাও জানতে চাইলেন আমার উত্তরটা ঠিক হয়েছে কিনা। ডঃ শেনয় বললেন আমি দশমিক পয়েন্টে একটা ভুল করেছি। আমি তাঁর সাথে সহমত না হয়ে ডঃ শেনয়কে বললাম যে খুব সম্ভবত তিনি আলোর গতি মিটারের বদলে সেন্টিমিটার স্কেলে নিয়েছেন। শ্রী রাও আমার বিশ্লেষণের অ্যাপ্রোচে ইম্প্রেশড হলেন। তিনি বললেন ওনার জানার দরকার নেই কে ভুল আর কে ঠিক, যেটা পরে জানা যাবে। তিনি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন আমি কবে নাগাদ জয়েন করতে পারি । ডঃ শেনয় আমাকে এম কে ডি জি-র কাছে ডক্টরেট সম্পন্ন করার পরামর্শ দিলেন। সেই সময় ডঃ শেনয়ের কথা না শুনে আমি ডি এল আর এল-এ জয়েন

করি। পরবর্তী কালে আমি ডঃ শেনয়ের সাথে ডি আর ডি ও-র অনেক প্রজেক্ট মনিটর করেছিলাম। এম কে ডি জি-র কথা বলতে গিয়ে অন্য অনেক মুহূর্তের কথা লিখে ফেললাম। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে এম কে ডি জি যখন তিনি বেনারসে আসতেন, ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল আতিথ্য গ্রহণ না করে আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। তিনি অনেক মজার ঘটনা বলতেন। যেমন, তিনি বাসে একটি মেয়েকে পছন্দ হওয়াতে তার পিছু পিছু ফলো করে তার বাড়ীতে পৌঁছে যান। সেই মেয়েকেই পুত্রবধূ করে বাড়ী নিয়ে আসেন। এম কে ডি জি, যার কাছে আমি ডক্টরেট করার জন্য প্রথমে গিয়েছিলাম, তার নাম মৃণাল (MRINAL), আর যার কাছে আমি পরে ডক্টরেট করি, এন বি সি, তার নাম নির্মল (NIRMAL)। আশ্চর্যজনক ভাবে MRINAL এবং NIRMAL শব্দ দুটি অ্যানাগ্রাম (anagram)। কারণ, দুটো শব্দে একই অক্ষরের সংখ্যা (এখানে ছয়) যে গুলো বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত। যেমন, এক বা একাধিক শব্দকে নিয়ে অ্যানাগ্রাম বানানো যায়। উদাহরণ স্বরূপঃ DORMITORY এবং DIRTY ROOM; MOTHER IN LAW এবং WOMAN HITLER। এই অধ্যায়ের শেষে আমি বন্ধু ভোলানাথকে নিয়ে এম কে ডি জি-র কথায় আবার ফিরে আসব।

ইনব্যামফেলে এন বি সি স্যার আমাদের বি টেক ক্লাসে ইলেকট্রমেগনেটিক থিওরি পড়াতেন। পড়াতে এসে তিনি ধরেই নিতেন যে বিষয়টা আমরা সবাই জানি। তাই বিষয়টা নিয়ে তিনি আমাদের সাথে আলোচনা করতেন, পড়াতেননা। তাই বিষয়টা গতানুগতিক ভাবে বুঝতে আমাদের বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। একদিন এন বি সি-র ক্লাসের পর আমরা যখন দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, তখন এন বি সি'র পড়ানোর প্রসঙ্গ তুলে প্রশান্ত বলল, "সাধেই কি অনেকেই ইনব্যাফেলের বি টেক ছেড়ে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির এম এস সি ফিজিক্স পড়তে চলে যাচ্ছে?" সংযোগবশত, সেই সময়েই আমাদের সাথে সিঁড়ি দিয়ে এন বি সি-ও নামছিলেন, যেটা প্রশান্ত লক্ষ্য করেনি। এই মুহূর্তটা প্রশান্তর কয়েকদিন রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। আত্মভোলা এন বি সি আদৌ প্রশান্তর মন্তব্য শুনতে পাননি এই বলে প্রশান্তকে আমি আশ্বস্ত করেছিলাম। এন বি সি-র পড়ানো প্রসঙ্গে আরেকটা মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায়। এন বি সি তখন খড়গপুর আই আই টিতে। সেখানে তিনি একবার

একটি শর্ট-টার্ম কোর্স প্রফেসার রাকেশ গাঙ্গুলির সহযোগিতায় আয়োজন করেন। জামশেদপুর থেকে খড়গপুরে গিয়ে আমিও এই কোর্স এটেন্ড করেছিলাম। ইনব্যাজফেল থেকে বি আর এন স্যার এই প্রোগ্রামে লেকচার দিতে এসেছিলেন। অডিও টেপরেকর্ডার তখন সবে বাজারে এসেছে। এন বি সি সেখানে রাকেশদা কে বললেন, "রাকেশ, তুমি সবার লেকচার টেপ করে নাও। রাকেশদা এন বি সিকে বললেন, "নিশ্চয় করব, তবে আপনার লেকচার বাদ দিয়ে। কারণ আমি আপনার লেকচারের কোন এভিডেন্স ডিপার্টমেন্টে রাখতে চাই না। আপনার বিরুদ্ধে কেউ এর অপব্যবহার করতে পারে।" উৎকণ্ঠিত হয়ে এন বি সি রাকেশদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন কেন কেন? আমি কি খারাপ পড়াই? ছোটবদ্যিরে জিগাও।" রাকেশদা বললেন, "বৈদ্যনাথ কি বলবে? আপনার কাছে ও পি এইচ ডি-র থিসিস লিখছে। ওর কি ভয় ডর নেই? ও যদি সত্যি কথাটা ফাঁস করে তবে ওর পি এইচ ডি-র কি হবে ?" (এন বি সি-র ছোটবদ্যি ছিলাম আমি অর্থাৎ বৈদ্যনাথ বসু, আর বড়বদ্যি ছিলেন বৈদ্যনাথ বিশ্বাস)। জোক এপার্ট, খড়গপুর আই আই টিতে বি টেকের পড়ুয়ারা এন বি সি-র কাছে প্রজেক্ট করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। যে কোন রিসার্চ প্রবলেমের উত্তর স্বাধীন ভাবে এবং গোড়া থেকে বের করে আনতে এন বি সি বরাবর উৎসাহ দিতেন। এন বি সি-র সাথে আমার অনেক মুহূর্ত লেখার ইছে আছে, যেমন আমার সাথে এন বি সি-র 'আড়ি আড়ি, কাল যাব বাড়ি' হওয়া, আই আই টি খড়গপুরে এন বি সি-র হাতে আমার বন্ধু হরিমোহন গুপ্তের চড় খাওয়া, যে ঘটনার কথা পরে আই আই টি দিল্লীতে প্রফেসার হিসেবে কর্মরত হরিমোহন আমাকে বলেছিল, এবং যে ঘটনার জন্য হরিমোহন দাবী করত যে এন বি সি স্যার আমার চেয়ে ওকেই বেশী স্নেহ করতেন। জানিয়ে রাখি, স্যারকে না জানিয়ে আমি খড়গপুর থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনে জামশেদপুরে এক শনিবার বিকেলে চলে গিয়ে পরের সোমবারে খড়গপুরে এসে জানতে পারলাম যে স্যার আমার সাথে আড়ি করে দিয়েছেন আর হরিমোহন স্যার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও আমার বাড়ী যাওয়ার কারণ না বলাতে স্যার হরিমোহনকে একটি চড় উপহার দিয়েছেন। এই 'আড়ি' অবস্থায় আমি আমার ডক্টরেট থিসিসের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে আর আই টি, জামশেদপুরে অ্যাসিস্টেন্ট লেকচারার হিসেবে জয়েন করি। ইতিমধ্যে সমীর আই আই টি

খড়গপুরে লেকচারার হয়ে স্যারের মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স ল্যাবে ওর রিসার্চের কাজ শুরু করে। সেই আমাদের 'আড়ি'র সময়ে একবার আমি যখন জামশেদপুর থেকে খড়গপুরে স্যারের ল্যাবে গিয়েছিলাম, স্যার আমাকে দেখে সমীরকে বললেন, "ওকে জিজ্ঞাসা কর ওকি ওর বৌদিকে খবর দিয়েছে যে ও এসেছে? ও যেন ক্যান্টিনে লাঞ্চ না করে।" এই 'আড়ি'র সময়েই এন বি সি স্যার জে ডাব্লিউ আর গ্রিফিথের সাথে কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গবেষণা করতে ইংল্যান্ডের লাফবোরো ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি লিভ নিয়ে সপরিবারে চলে গেলেন। সেখানে একদিন এক প্রফেসার এন বি সি স্যারকে আমার আর স্যারের লেখা ইংল্যান্ডের একটা জার্নালে সদ্য প্রকাশিত একটি পেপার দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আসলে কি সাবজেক্টের প্রফেসার, মশাই? মাইক্রইলেক্ট্রনিক্স না কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং না ভ্যাকুম ইলেকট্রনিক ডিভাইসের? পেপারটা ছিল শেষের সাবজেক্টের যা ছিল আমার ডক্টরেট রিসার্চের অন্তর্গত। স্যার পেপারটা পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং আমার সাথে 'আড়ি' কাটিয়ে 'ভাব' করে নিলেন। আমাকে চিঠিতে লিখলেন যে স্যার যখন দেশে ফিরবেন আমি যেন থিসিসের ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে স্যারের কাছে যাই। পরে এন বি সি স্যারকে নিয়ে আরো অনেক কথা লেখার ইচ্ছে রইল।

আমরা যখন ইনব্যাফেলে পড়তাম, তখন সেখানে 'সবার উপরে সত্য' ছিলেন প্রফেসার জে এন ভড় (জে এন বি)। ইনব্যাফেল প্রতিষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক শিশির কুমার মিত্রের সাথে তিনি যোগদান করেন। শুনেছি একবার বিনা অনুমতিতে জে এন বি-র অফিসঘরে ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার ঢুকে পড়াতে উনি খুব বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি তখন লাঞ্চের পর একটা ইজিচেয়ারে আধাশোয়া অবস্থায় ন্যাপ নিচ্ছিলেন। তিনি ভাইস-চ্যান্সেলারের সামনেই অ্যাটেনডেন্টকে ধমকালেন, "তোমাকে না বলেছি আমি যখন ঘুমিয়ে বিশ্রাম করছি তখন কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবেনা ?" ভাইস-চ্যান্সেলার এসেছিলেন আসন্ন ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ভেন্যু পরিদর্শনে। দোর্দন্ডপ্রতাপ সেই জে এন বি-র ক্লাস লেকচার আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তিনি চন্দননগর থেকে লোকাল ট্রেনে হাওড়ায় এসে, সেখান থেকে ইন্সটিট্যুটের মোটর গাড়ীতে ইনব্যাফেলে আসতেন এবং সেই ভাবেই আবার ফিরে যেতেন। ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে তিনি ইনব্যাওফেলের খোলস

থেকে বেরিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষারত নির্দিষ্ট লোকাল ট্রেনের কামরায় তাসের আড্ডায় মেতে যেতেন। জে এন বি-কে নিয়ে এবার আমাকে কেন্দ্র করে একটা মজার ঘটনা বলছি যেখানে জে এন বি-র সাথে আমার ইন্সটিট্যুটের মোটর গাড়ীতে চড়ার অভিজ্ঞতা ধরে রাখলাম। উপলক্ষ্য ছিল সমীরের বিয়ের বৌভাত। আমি আর মণিকুন্তলা সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গিয়েছিলাম জামশেদপুর থেকে কলকাতায়। উঠেছিলাম গিরীশ পার্কের কাছে আমার শ্বশুরবাড়ীতে, মণিকুন্তলা আর আমাদের কয়েক মাসের ছেলেকে (বিল্কু) নিয়ে। হাওড়া স্টেশন থেকে আমার শ্বশুরবাড়ী কাছেই। ইনব্যাফেল থেকে জে এন বি হাওড়া স্টেশনে বিবেকানন্দ রোড ধরে গিরীশ পার্ক এবং আমার শ্বশুরবাড়ীর পাশ দিয়ে ইন্সটিট্যুটের গাড়ীতে করে যেতেন। বৌভাতের অনুষ্ঠানস্থল আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে অনেক দূরে ছিল। সমীরকে অনুষ্ঠান পরিচালন সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে মাঝে মাঝে আমার সাথে পরামর্শ করতে দেখে উপস্থিত জে এন বি আমাকে দেখিয়ে প্রফেসার এ কে সি-কে জিজ্ঞেস করলেন, "অরুন, এই ছেলেটিকে তো চিনতে পারছিনা; ছেলেটি কে?" ওনাদের কথাবার্তা আমি স্পষ্ট শুনতে পারছিলাম । এ কে সি বললেন জে এন বি-কে, "ওর নাম বৈদ্যনাথ বসু। ও ইন্সটিট্যুটে সমীর, প্রশান্ত, প্রদীপের ক্লাসমেট ছিল।" জে এন বি বললেন, "কি জানি বাবা, ওকে আমি জন্মেও কোন দিন দেখেছি বলেতো মনে পরছেনা।" এ কে সি সেই সময়ে জে এন বি-কে অনুরোধ করলেন বাড়ী ফেরার সময় তিনি যেন আমাকে আর মণিকুন্তলাকে গিরীশ পার্ক পর্যন্ত তাঁর গাড়ীতে লিফ্ট দেন। অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে জে এন বি রাজী হয়ে গেলেন। ডিনারের শেষে জে এন বি-র হাঁকডাক সবাই শুনতে পেল—"বৈদ্যনাথ, কোথায় তুমি? বৌমা কোথায়? চল, তোমাদের গিরীশ পার্কে নামিয়ে দিয়ে আমাকে আবার ট্রেন ধরতে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে ।" মজাটা হল এরপর যখন গাড়ীতে যেতে যেতে আমি জে এন বি-কে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?" এরপর জে এন বি-র তাৎক্ষণিক অবাক-করা উত্তর "কি বলছ, বৈদ্যনাথ? তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি? আমি কত দিন তোমাকে পড়িয়েছি। আমার ক্লাসে তোমার মতন ব্রিলিয়েন্ট ছাত্রকে কি ভোলা যায়?" ভুলতে পারি না জে এন বি-র উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মার্টনেস। ভুলতে কি পারি সেই মুহূর্তগুলো?

সুহাসদা (সুহাস দত্ত রায়; ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং ম্যান অফ ইন্ডিয়া), যিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন আমার দুটো বইয়ের মুখবন্ধ লিখে, আমাকে বলেছিলেন, "বদ্যি, তোমার বন্ধুভাগ্যকে আমি হিংসা করি। তুমি কি তোমার বন্ধুদের প্রতি জেলাস ফিল কর না?" প্রশ্নটা উঠেছিল আমার ক্লাসমেট প্রদীপের কোশ্চেন সেটিং সম্বন্ধে। বলে রাখি, কোশ্চেন সেটিং বিষয়ে সুহাসদার অনুধাবন সর্ববিদিত। এই বিষয়ে সুহাসদার লেকচার শোনার সৌভাগ্য আমার দু'বার হয়েছে। যাই হোক, কোশ্চেন সেটিং সম্বন্ধিত সুহাসদা এবং প্রদীপের মজার ঘটনাটি শোনাতে ইছে হচ্ছে। কোশ্চেন সেটিং যে কত সোজা সেই ঘটনা দিয়ে আমি সুহাসদাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। দিল্লীর ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন (ইউ পি এস সি) ভবনে একটা সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার বানানোর জন্য সুহাসদার সাথে আমার মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল চার দিনের এক প্রোগ্রামে। একটা বড় হলে আলাদা আলাদা টেবিলে সুহাসদা আর আমার বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকেরা অনেক কোশ্চেন পাঠিয়েছিলেন। নির্দেশ ছিল প্রতিদিন অফিস আওয়ারে সেই কোশ্চেনগুলো থেকে আমাদের কোশ্চেন বাছার। অবশ্য দরকার হলে আমরা নিজেরাও কোশ্চেন দিতে পারি। আমার উপর দায়িত্ব ছিল মাইক্রওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কোশ্চেন বাছার। কাজের শেষে বিকেল বেলায় সুহাসদা আই আই টি দিল্লী-র কোয়ার্টারে ফিরে যেতেন। আমি থাকতাম ইউ পি এস সি ভবনের গেস্টহাওসে। প্রতিদিন সুহাসদা বিকেল পর্যন্ত কাজ করতেন, কিন্তু আমার কাজ লাঞ্চের আগেই হয়ে যেত। সুহাসদা এর রহস্য জানতে চাইলেন। সুহাসদা আমার (তাঁর 'ভাইটি'র) সিরিয়াসনেস সম্বন্ধে কিছুটা চিন্তিতও ছিলেন। আমি সুহাসদাকে বললাম যে আমি আমার ক্লাসমেট প্রদীপের হাতের লেখা চিনি। বেশির ভাগ কোশ্চেন আমি প্রদীপের কোশ্চেনগুলো থেকে বেছে নিই। সুহাসদা রেগে গিয়ে বললেন, "কেন, তোমার বন্ধু প্রদীপ সাহা কি ভুল করতে পারেনা?" আমার উত্তর ছিল— "প্রদীপ কক্ষণো ভুল করতে পারেনা।" সুহাসদা একদিন আমার কাছ থেকে প্রদীপের একটা কোশ্চেন নিয়ে বাড়ী গেলেন। পরের দিন সুহাসদা আমাকে বললেন, "ভাইটি, হ্যাট্স অফ টু ইউ এবং তোমার বন্ধু প্রদীপ! আচ্ছা বল, তুমি কি তোমার ক্লাসমেট প্রদীপকে হিংসে করনা?" আমি উত্তরে বললাম,

"ক্লাসমেট হলেও প্রদীপ আমার গুরু। ওর জ্ঞানকে আমি ভক্তিভরে নমন করি।" আমার লেখা ইলেকট্রমেগনেটিক থিওরি-র উপর একটা বই লেখার সময়ে প্রদীপ আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল, আর এই বইটির মুখবন্ধ লিখেছিলেন 'নান আদার দ্যান সুহাসদা'। সুহাসদা ঠিকই বলেছিলেন যে তিনি আমার বন্ধুভাগ্যকে হিংসা করেন। আমার বিয়ের আগে এক সময় মণিকুন্তলা ওর বাবা ও মা-র কলকাতায় অবর্তমানে যখন অসুস্থ হয়ে কলকাতার নীল রতন সরকার হাসপাতালে ছিল, তখন সমীর আর প্রশান্ত ইনব্যালফেলে ওদের ল্যাবের একটা ড্রয়ারে আমার জন্য টাকা রেখে যেত, যাতে দরকার পড়লে আমি সেখান থেকে তা আমি নিতে পারি। অমলদা তখন সেই হাসপাতালে মেডিকাল সায়েন্স পড়ত; অমলদার সহায়তায় আমি মণিকুন্তলাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম।

১৯৬৬ সালে পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ার সময়কার আমার ক্লাসমেট আর শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহাশয়দের কিছু কথা এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে লিখেছি। এই সময়ের প্রথম দিকে আমি, ভোলানাথ, নৃপেনদা বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেলেই থাকতাম। সেখান থেকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে হাঁটা পথেই আমরা দল বেঁধে কলেজে যেতাম। আমাদের দলে থাকত নৃপেনদা, ভোলানাথ, তারেশদা (কেমিস্ট্রির তারেশ দাস), প্রমীল (কেমিস্ট্রির প্রমীল দেব), মৃদুল (অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রির মৃদুল সেনগুপ্ত), অমলদা (ফিজিওলজির অমল সামন্ত), সুনীলদা (ফিজিওলজির সুনীল দাস) ও আরও অনেকে।

হস্টেলে মজার ঘটনার মধ্যে সেই সময় নর্থ বেঙ্গল থেকে অনার্স শিকারীদের আগমনের কথা মনে আসছে। শিকারীরা বলতেন তাঁদের স্কুলে অনার্স ডিগ্রী আছে এমন টীচার দেখাতে না পারলে স্কুলের অ্যাফিলেয়েশন বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভাবেই কলকাতায় হস্টেলে থেকেই হস্টেলের অনার্স ডিগ্রীধারী অনেকেই নর্থ বেঙ্গলের কোন না কোন স্কুলের টীচার হয়ে স্কুলে না গিয়েও কিছু টাকা পেত। বলা বাহুল্য এটা ছিল একটা অপরাধ। এই ভাবে টাকা না নিয়ে অর্থাভাবে ভোলানাথ বি টেক ক্লাস না করেই সত্যি সত্যি নর্থ বেঙ্গলের কোন এক স্কুলে চলে যেত দীর্ঘ সময়ের জন্য। এটা অবশ্যই ভোলানাথের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষায় ভাল

রেজাল্ট করার পথে বাধা হয়েছিল। রোববার সকালে ভোলানাথ ওর এক অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ধনবান ক্লাসমেট প্রবাল মল্লিককে পড়াতে যেত হস্টেলের কাছেই কৈলাস বোস স্ট্রীটে তাদের বাড়ীতে। প্রবালের বিশেষণে 'বড়লোক' না লিখে 'ধনবান' লিখলাম। 'বড়লোক' লেখায় আমার অনীহার কথা আমি আগেই লিখেছি। প্রবালের বাড়ীতে ভাল ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা থাকত তাই সেখানে ভোলানাথ আমাকে ওর 'অ্যাসিস্ট্যান্ট' করে নিয়ে যেত। আমরা আমাদের অর্থাভাবকে সামাল দিতে বন্ধুরা সব সবার টাকা ভাগ করে মিলে মিশে হস্টেলে থাকার খরচ বহন করতাম।

কিন্তু এরই মধ্যে হস্টেলের একটা তথাকথিত 'তোলাবাজি'র ঘটনা আমাদের সবাইকে নাড়া দিল। একদিন হস্টেলের ওপরতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে হস্টেলেরই একটি ছেলে "বৈদ্যনাথদা বাঁচান" বলে আমার পিছনে লুকিয়ে পড়ল। দেখলাম একটি 'দেখতে-গুন্ডা' মার্কা ছেলে ওকে তাড়া করে আসছে। অবশ্যই তখনকার মতন ওকে উদ্ধার করলাম। হস্টেলের ছেলেটির কাছে শুনলাম ওর কাছ থেকে গুন্ডাটি প্রতি মাসে তোলাবাজির চাঁদা নিয়ে যায়। কবে ছেলেটির কাছে ওর বাড়ী থেকে মানিঅর্ডার আসে গুন্ডাটি জেনে যেত। আমাকে অনেকে সাবধান করে দিল যে গুন্ডাটি আমাদের কলেজ পাড়ার একটা মাফিয়ার দলের লোক। ও আমাদের হস্টেলের একটি বোর্ডারের রুমে বন্ধু হয়ে নিয়মিত যাতায়াত করত। অপরাধের গোড়া এই বোর্ডারটিকে হস্টেল থেকে সরাবো বলে মনস্থ করলাম। ইতিমধ্যে একদিন হস্টেলের এক বোর্ডার রাজকিশোর সিংহ আমাকে বলল ওর ভাই রাজবীর, যে আমাদের হস্টেলেই থাকত, ওই গুন্ডাটির রেলওয়ে ইয়ার্ডের ওয়াগান ব্রেকারের আড্ডায় গিয়ে ওকে এমন শাস্তি দিয়েছে যে ও কোন দিন বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেলে ঢোকার সাহস করবেনা। সেই সময়ে একজন পুলিশ অফিসার ঘটনার তদন্তের জন্য আমার রুমে নিয়মিত আসতে থাকলেন। তিনি (প্রবীরদা) কোন এক সময়ে আমাদের হস্টেলেই থাকতেন। উনি বললেন যে উনি যে আমার 'প্রবীরদা' সেই খবরটি 'যথাস্থানে' অর্থাৎ গুন্ডাটির মাস্টারমাইন্ডের কাছে পোঁছে যাবে। তিনি এও বললেন যে বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেলে থেকে সায়েন্স কলেজে যাওয়ার পথে সাদা পোষাকে পুলিশ থাকবে আমাদের এস্ককর্ট হয়ে। আমার

ডানপিটে ছোড়দা জয়ন্তদাকে—যার ভয়ঙ্কর অ্যাকশনের কিছু কথা এর আগে বর্ণনা করেছি—সংগত কারণে তোলাবাজির এই ঘটনাটি জানতে দিইনি।

এরপর অপরাধের গোড়া গুন্ডাটির বন্ধু হস্টেলের বোর্ডারটিকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার করবার জন্য হস্টেল থেকে আমি, ভোলানাথ, তারেশদা ও আর কয়েকজন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের দ্বারস্থ হলাম। বোর্ডারটি হস্টেল থেকে বহিষ্কৃত হল। প্রিন্সিপ্যাল স্যার আমাদের অভিনন্দন জানালেন হস্টেলকে অপরাধমুক্ত করার সাহসিকতা দেখাবার জন্য। প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সাথে এই প্রসঙ্গে আমাদের হয়ে কথাবার্তা বলেছিল বি এস সি কেমিস্ট্রি অনার্সের ছাত্র তারেশদা (দাস)। তারেশদা এম এস সি পড়ার সময়েও আমাদের সাথে বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেলেই থাকত। হস্টেল ছাড়ার পর কিছুদিন তারেশদার সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। তারেশদার বাড়ী ছিল সাঁইথিয়া। তারেশদার বিয়ের নিমন্ত্রন পত্র পেয়েছিলাম। বিয়ে হ'ল এগারোই মাঘ, তেরশ আটাত্তর। এর কিছুদিন পর খবর পেলাম যে পেটের ব্যথার কষ্টের জন্য তারেশদা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে তারেশদা নিরুদ্দেশে চলে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তার হদিশ আর পেলামনা। তারেশদার ডায়েরির পাতা থেকে কিছু কথা—

আঁধার যদি থাকেই তবে থাক, একটি অনুরোধ
দু'চার ফোঁটা আলোর কাব্য রেখো
অমাবস্যা আসেই যদি তবে, একটি অনুরোধ
ঘাসের বুকে প্রদীপ সারি জ্বেলো।
পথের মাঝে পড়েই যদি কাঁটায় ভরা বন
কাঁটার বুকে রক্ত কুসুম রেখো
হৃদয় যদি নিংড়ে দিতেই হয়, কনক চাপা গ'ড়ে
তোমার পুজোর থালায় ভ'রে নিয়ো।

এবার একটা মজার ঘটনায় আসা যাক। হস্টেলে একবার মৃদুলকে না বলে অন্য কারুর চিঠি সবার অজান্তে লুকিয়ে পড়ার জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। পোস্টম্যান সবার চিঠি হস্টেলের কমনরুমে একটা টেবিলের উপর রেখে

দিতেন। যে যার চিঠি আমরা সেখান থেকে নিয়ে নিতাম। ও আমার নামে আসা ইনল্যান্ড লেটার খুলে, পড়ে, আঠা দিয়ে সেঁটে আবার কমনরুমে রেখে আসত। ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলে ওকে একটা শাস্তি দিয়েছিলাম। নিজের হাতের লেখা পালটিয়ে আমি ইনল্যান্ড লেটারে একটা প্রেমপত্র আমাকেই লিখে 'ইতি'তে একটি ডার্লিং মেয়ের নাম লিখলাম এবং হস্টেলের ঠিকানায় পোস্ট করলাম। চিঠিতে অনুনয়ের ভাষায় লেখা ছিল আমি যেন ডার্লিং এর সাথে সামনের রোববার সকাল দশটায় এসপ্ল্যানেডে মেট্রো সিনেমা হলের সামনে দেখা করি। অতঃপর সেই সামনের রোববার এসে গেল। সকাল ন'টায় আমি হস্টেল থেকে বেরিয়ে একটা ভিড় ট্রামে উঠে পড়লাম। মৃদুল আমাকে ফলো করল। এরপর মৃদুলকে ফাঁকি দিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে একটা উলটো ট্রামে উঠে শ্যামবাজার নেমে 30-B বাস ধরে দমদমে আমি আরতিপিসীর বাড়ী চলে গেলাম। সেদিন রাতে হস্টেলে ফেরার পর মৃদুল আমাকে জিগ্যেস, করল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি তো আমার পিসীর বাড়ী দমদমে গিয়েছিলাম। তুমি মেট্রো সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে কার জন্য অপেক্ষা করছিলে ?" এই ঘটনার পর থেকে মৃদুল লুকিয়ে লুকিয়ে আমার চিঠি পড়া বন্ধ করে দিল।

এর পর আর একটা মজার ঘটনা ঘটিয়েছিলাম হস্টেলে একটা 'গুরু নির্বাচন'/'গরু নির্বাচন' অনুষ্ঠিত করে। মূল প্রার্থী হিসেবে অত্যন্ত সাদা সিধে শঙ্কর রায়কে (কল্পিত নাম) আমি বেছে নিলাম, আর একমাত্র প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়া করালাম অমলদাকে (অমল সামন্ত)। শঙ্করদা, শুনলাম, একটি বিষয়ে এম এ ছিলেন এবং আরো একটি বিষয়ে এম এ করছিলেন। ওনাকে বললাম যে আমরা ওনাকেই আমাদের গুরু মানি, এবং আমরা ওনাকেই হস্টেলের গুরু ঘোষণা করতে চাই, কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষ অমল সামন্তকে গুরু ঘোষণা করতে চাইছেন। অমলদা তখন নীলরতন সরকার কলেজের হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ছিলেন। ঠিক হল নির্বাচন হবে। কাগজে "শঙ্কর রায়কে গরু নির্বাচিত করুন" লিখে হস্টেলের দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটিয়ে দেওয়া হল। 'গুরু' বানানটা ইচ্ছে করে 'গরু' লেখা হল। অমলদার জন্যও সেই রকম প্রচার চালান হল অবশ্য 'গুরু' বানানে ভুল না করেই। নির্বাচনী প্রচারে এই ভুলটা শঙ্করদা দেখালে আমরা ওনার কাছে ক্ষমা চেয়ে

নিলাম। দুই পক্ষের নির্বাচনী সভার আয়োজন করলাম। এক ছুটির দিন প্রমীলের সাথে দেখা করতে আসা ওর কয়েকজন বন্ধুকে অমলদার ভাড়াটে করা গুন্ডা বানিয়ে তাদের এবং হস্টেলের কয়েকজনকে নিয়ে শঙ্করদাদার রুমের সামনে হাতাহাতির সীন প্রস্তুত করা হল। শঙ্করদা আর অমলদা সবাইকে শান্তি বজায় রাখতে আবেদন করলেন। যথারীতি ভোট ও ভোট গণনা হল। বিপুল ভোটে শঙ্করদা 'জয় লাভ করিলেন'।

ইনব্যাগফেলে এম টেক পড়ার সময়ে এবং তারপর ডক্টরেটের জন্য রিসার্চ করার সময় কিছুদিন আমি বালীগঞ্জের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির টেক-হলে থাকতাম। আমার রুমমেট ছিল রঞ্জন (গঙ্গোপাধ্যায়) যার উল্লেখ আগে করেছি। টেক-হলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেল থেকে অনেক ভাল ছিল। কাছের মসজিদ থেকে ভোরবেলার ভারী মধুর আজান মনকে পবিত্র করে দিত। টেক-হলের কাছে ইউনিভার্সিটির আরেকটি ক্যাম্পাসের হস্টেলে আমার জামশেদপুরের ক্লাসমেট, সিনেমা জগতে তখন সদ্য-বিখ্যাত মৃণাল মুখার্জি থাকত, যার উল্লেখ আগে করেছিলাম। ছুটির দিন, 'ছুটি' সিনেমার নায়ক মৃণালের সাথে অনেক গল্পগুজব হ'ত। জামশেদপুরে মৃণালের বাড়ীতে দেখা হলে ওর বাবা, যিনি টিস্কোর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, আমাকে বকতেন—নিজেরা তো দিব্যি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছ, রিসার্চ করছ, তোমাদের বন্ধুটিকে সিনেমা থেকে উদ্ধার করতে পারনা? মৃণালের বাবা, আমি বিশ্বাস করি, পরে নিশ্চয় গর্বিত হয়েছিলেন মৃণালের সাফল্যে। কিছুদিন টেক-হলে থাকার পর আমি আরেক মৃণালের ডাক পেলাম। তিনি হলেন, আর কেউ নয়, ইনব্যাপফেলের জগদ্বিখ্যাত রেডিও অ্যাস্ট্রনমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসার মৃণাল কান্তি দাশগুপ্ত (এম কে ডি জি)। তিনি আমাকে সায়েন্স কলজের পাশে, বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে, অপেক্ষাকৃত নতুন পোস্টগ্র্যাজুয়েট হস্টেলে থাকার জন্য ডাকলেন। তিনি ছিলেন এই হস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি হস্টেলের ভিতরে তাঁর কোয়াটারে থাকতেন। টেক-হল থেকে এই হস্টেলে চলে এলাম। এখানে আমরা সিন্গল-সীটেড রুম পেলাম। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স বিভাগের আমার বন্ধু ভোলানাথের ক্লাসমেট সন্তোষ রাণা এই হস্টেলেই থাকত। নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশে একটা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবত। আমাকে জিজ্ঞেস করত আমি ওকে ঘুষি মারা শেখাতে পারি কি না।

ও একবার ওর ঝাড়গ্রামের বাড়ী থেকে এসে আমাকে বলল ও নাকি ওখানকার ভাগচাষীদের উস্কে দিয়েছে ওরা যেন ওর মা-র কাছ থেকে সন্তোষদের মালিকানার জমি কেড়ে নেয়। কয়েক বছর আগে 'রাজনীতির এক জীবন' বইটি লেখার জন্য সন্তোষ আনন্দ পুরস্কার পায়। হস্টেলে সন্তোষের সাথে দেখা করতে আসা প্রেসিডেন্সি কলেজের সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবত এমন একটি ছাত্রের সাথে দেখা হল যার নাম অসীম চ্যাটার্জী যে 'কাকা' নামেও পরিচিত ছিল। অসীম আমাকে দেশের জন্য সেবা করার একটি অনুরোধ জানাল। ও বলল, ও ঝড়ের বেগে এসে আমার রুমের বন্ধ জানালায় ওর নোংরা হয়ে যাওয়া জামাকাপড় গুঁজে রেখে যাবে এবং আমি ধোপাকে দিয়ে কাচিয়ে সেইগুলো আবার আমার রুমের বন্ধ জানালায় রেখে দেব।

একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এটা আমাদের বৈদ্য সমাজের লোকেদের পরস্পরের পাশে দাঁড়ানকে কেন্দ্র করে। একদিন জনৈক বৈদ্য সমাজের ভদ্রলোক এম কে ডি জি-র সাথে দেখা করতে ইনব্যাফেলে এলেন। এম কে ডি জি ছিলেন বৈদ্য (দাশগুপ্ত)। এম কে ডি জি তখন ইনব্যাফেলে ছিলেন না। ভদ্রলোকটিকে প্রফেসার অরুন কুমার সেন, যিনিও বৈদ্য ছিলেন, আমার সাথে হস্টেলে এম কে ডি জি-র সাথে দেখা করতে পাঠালেন। আমারা যখন এম কে ডি জি-র জন্য জন্য অপেক্ষা করছিলাম, ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও কি আমাদের মতন বৈদ্য?" অবশ্যই আমি বৈদ্য নই, আমরা তথাকথিত কায়স্থ সমাজের বসু। তবে ভদ্রলোককে আমি নিরাশ করলামনা; বরঞ্চ কিছুটা হতবাক করলাম আমার উত্তরে। তাঁকে আমি বললাম, "আমি আপনাদের বৈদ্য নই। আমি আপনাদের সবাকার প্রভু।" ভদ্রলোক বললেন, "বুঝলাম না।" আমি বললাম "এবার বুঝুন, আমি সেন নই, সেনগুপ্ত নই, দাশগুপ্ত নই, নই কোন বৈদ্য—তবে আমার নাম বৈদ্যনাথ।"

হস্টেলে চার তলায় আমার রুম নাম্বার ছিল ৮৫। আমার ঠিক পাশের ৮৬ নাম্বার রুমে কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র আমার বন্ধু তরুণ কুমার ভট্টাচার্য্যের সাথে দেখা করতে আসা পিঠাপিঠি ওর দুই বোন মণিকুন্তলা এবং শকুন্তলার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। আত্মীয় স্বজনদের

মধ্যে আমার খুড়তুত দিদি ইভুদি আমার সাথে দেখা করতে প্রায়ই আসত। মণিকুন্তলার সাথে ইভুদির এই হস্টেলেই পরিচয় হয়েছিল ওরা দু'জনেই একদিন যখন আমার সাথে দেখা করার জন্য ভিজিটর্স রুমে অপেক্ষা করছিল। মণি'কুন্তলা' এবং শ'কুন্তলা' দুই বোনেরই 'কুন্তল' চোখে পড়ার মতন দীর্ঘ ছিল। আমার হস্টেল রুমে এক ছুটির দিনে দুজনের কুন্তলের দৈর্ঘ্য মাপার সময় হটাৎ-করে-আসা আমার ছোড়দার (জয়ন্তদা) কাছে একদিন ধরা পড়ে গেলাম।

মণিকুন্তলা একদিন আমাকে গিরীশ পার্কের কাছে ৬, বিন্দু পালিত লেনে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গেল যেখানে ওর বাবা আর মার সাথে আমার আলাপ হল। মণিকুন্তলার মা শ্রীমতী অরুণা দে ভট্টাচার্য্য পার্ক সার্কাস এলাকায় জহর নন্দী বিদ্যালয়ে পড়াতেন। তাঁর এক সহকর্মী ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাসের স্ত্রী। জীবনানন্দ দাসের অনেক অজানা ব্যক্তিগত জীবনের কথা তাই আমরা জানতে পেতাম। মণিকুন্তলার বাবা ডঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্যের আদি বাড়ী ছিল হালিশহরে। তিনি কলকাতায় ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কাজ করতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন হোমিয়োপ্যাথ। হোমিয়োপ্যাথি এম ডি-তে তিনি গোল্ড মেডালিস্ট ছিলেন। তিনি রোগীর চিকিৎসার জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধনে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন, বিশেষত সেই সব অঞ্চলে যেখানে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রবণতা ছিল। তাঁর প্রবচন কবে কোথায় হবে তার সূচনা দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হ'ত। পরে জানতে পেরেছিলাম, আমাদের ইনব্যাফেলের প্রফেসার এম কে ডি জি এবং আমার ফুলমামা ডঃ সচ্চিদানন্দ গুহ, ডঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্যের ভক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাগ্মী, তাঁর প্রবচন শোনার অভিজ্ঞতা আমার একবার হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের 'মধুরেণ সমপায়তে' করি আমার বন্ধু ভোলানাথকে কেন্দ্র করে একটি মুহূর্তের কথা স্মরণ করে। বন্ধু ভোলানাথ মাঝে মাঝে হস্টেলে আমার সাথে দেখা করতে আসত। একদিন হস্টেল অফিসের পিওন আমাকে বললেন যে সুপারিন্টেনডেন্ট স্যার (এম কে ডি জি) আমাকে হস্টেল অফিসে ডাকছেন কারণ আমার এক বন্ধু নাকি ভিজিটর-রেজিস্টারে কি সব লিখেছেন। শুনেই তো আমি ভয়ে ভয়ে হস্টেল অফিসে হাজির

হলাম। আমি যেতেই স্যার অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাকে আহ্বান করলেন, "এস এস বৈদ্যনাথ, দেখ তোমার বন্ধু ভোলানাথ ভিজিটর-রেজিস্টারে কি লিখেছে। ভারী উইটি (witty) তোমার বন্ধুটি।" ভিজিটর রেজিস্টারে ছিল তিনটি কলাম। প্রথম কলামটি ছিল ভিজিটরের নাম লেখার। দ্বিতীয় কলামটি ছিল বোর্ডারের নাম লেখার। আর তৃতীয় কলামটি ছিল বোর্ডারের সাথে ভিজিটরের কি রিলেশন লেখার যেখানে লিখতে হবে "বাবা, মা, ভাই, বোন, পিসী, বন্ধু" ইত্যাদি। রিলেশনের কলামে "বন্ধু" না লিখে ভোলানাথ লিখেছিল "গুড"। সত্যিতো, ভোলানাথের সাথে আমার "রিলেশন" ভাল ছিল।

# মিসাইলম্যানকে আমি নিরাশ করলাম

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লিখেছি আমি এম টেক পাস করে ইনব্যাফেলে ডক্টরেটের জন্য রিসার্চ শেষ না করেই হায়দ্রাবাদের ডি আর ডি ও-ডি এল আর এল জয়েন করি। অবশ্য সেই সময় আমার পোস্টিং হয় জামনগরের ইন্ডিয়ান নেভাল শিপ (আই এন এস), ভালসুরাতে। আই এন এস, ভালসুরা আসলে কোন 'শিপ' বা জাহাজ নয়। ইন্ডিয়ান নেভির প্রতিষ্ঠানটি নেভাল অফিসারদের একটি ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে সেই সময়ে ডি এল আর এল, হায়দ্রাবাদের একটা ফিল্ড রিসার্চ স্টেশন ছিল। রেলগাড়িতে কলকাতার হাওড়া থেকে জামনগরে আসতে সেই সময়ে তিন রাত্রির জার্নি করতে হ'ত। হাওড়া স্টেশনে আমাকে সী-অফ করতে মণিকুন্তলা এসেছিল আর এসেছিল সমীর ও প্রশান্ত ছাড়া আমার ইনব্যাফেলের অন্যান্য ক্লাসমেটরা। রেলগাড়ীর আমাদের বিরামগাও কামরাটিকে প্রায় সাত ঘণ্টা বাদে অন্য একটি রেলগাড়ীর সাথে জুড়বার জন্য সুরাট স্টেশনে দাঁড়া করান হল। আমি স্টেশনের কাছাকাছি সুরাট শহরের এদিক ওদিক ঘুরে রেলগাড়ীর আমাদের কামরাটিতে এসে দেখি আমার টিনের স্যুটকেস এবং বেডিং বা শতরঞ্চি দিয়ে মোড়া বিছানাটি উধাও। উৎকণ্ঠা নিয়ে কামরার বাইরে প্ল্যাটফর্মে আমার সহযাত্রী পরিবারটিকে জিজ্ঞেস করাতে ওনারা আমাকে অভয় দিলেন। দেখলাম ওদের লাগেজের সাথে আমার লাগেজটিও প্ল্যাটফর্মে রোদ পোহাচ্ছে। সৌরাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় রেলগাড়ীতে আমরা সবাই পানীয় জলের সমস্যা অনুভব করেছিলাম। ছোট ছোট বাচ্চারা গ্লাসে গ্লাসে জল নিয়ে যাত্রীদের বিক্রি করছিল।

ভোরবেলায় জামনগর স্টেশনে নামলাম। রেলগাড়ী থেকে নেমেও মনে হচ্ছিল যেন চলছি তো চলেইছি। নির্জন প্ল্যাটফর্মে একটি বেঞ্চে বসে আমার মনে হল যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলে কিছু থেকে থাকে তবে আমি সেখানেই বসে আছি। নতুন জায়গা, পরের দিন ল্যাবে জয়েন করার কথা। কোথায় থাকব ঠিক নেই। ঠিক সেই সময় একটি সুদর্শন ছেলে এসে

আমাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বৈদ্যনাথ বসু? আপনি কি ডি এল আর এল-এ জয়েন করতে এসেছেন? আমি সেখানকার জুনিয়ার ক্লার্ক। আমার নাম মহীপত সিং হিমায়ত সিং ঝালা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে, আনঅফিসিয়ালি, আপনাকে রিসিভ করতে এসেছি।" প্রথমে আমার 'মুশকিল-আসান' ঝালা আমাকে একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। পরের দিন আমি ল্যাবে জয়েন করলাম। কর্মস্থল হল ডি এল আর এল-এর একটা ফিল্ড রিসার্চ স্টেশন, আই এন এস, ভালসুরা। সেখানে আমাদের কাজ ছিল অনিয়মিত (anomalous) ট্রপস্ফিয়ারিক প্রপাগেশন উদ্ভুত রাডারে ফলস ডিটেকশন সম্বন্ধিত ডাটা সংগ্রহ করা।

এর পর শুরু হল আমার থাকার জন্য একটা ভাড়া বাড়ী খোঁজা। ঝালা জানাল যে আমি 'বিবাহিত' এবং 'নিরামিষাশী' এই শর্তে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। আমরা প্রথম প্রচেষ্টায় সফল হলাম। বাড়ীর মালিক বাইরে থাকাতে মালিকের স্ত্রী, যাকে হিন্দীভাষীরা মালকিন বলেন, গুজরাতীতে ঝালাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি মাছ মাংস খাই কি না। আমি বাঙালী বলে ওনার সন্দেহ অমূলক ছিল না। এর উত্তর না দিয়ে আমি রেগে মেগে ঝালাকে বললাম সকাল সকাল মাছ আর মাংসের নাম নিয়ে বাড়ীর মালকিন আমার মতন এক বৈষ্ণবকে অপমান করেছেন। এই বলে ওই বাড়ী থেকে সেই মুহূর্তে বেড়িয়ে আসার জন্য ঝালাকে জোর করতে থাকলাম। আমার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ ঝালা মালকিনকে বলাতে উনি খুব লজ্জিত হয়ে আমাকে বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী হয়ে গেলেন। মালকিন না চাইতেও ওনাকে ওয়ালেট থেকে বের করে মণিকুন্তলার ছবি দেখিয়ে আমি বিয়ে না করেও নিমেষে 'অবিবাহিত' থেকে 'বিবাহিত' হয়ে গেলাম। ভাড়াবাড়ীতে একটি মাত্র ঘর ছিল। বাড়ীর মালিকের সাথে টয়লেট ও বাথরুম শেয়ার করতে হ'ত। ঘরে আমার আসবাব পত্র বলতে ছিল শতরঞ্চির উপর মাটিতে পাতা আমার বিছানাটি এবং তার পাশে আমার টিনের স্যুটকেসটি। প্রথমটিকে আমি আমার চেয়ার-কাম-বিছানা এবং দ্বিতীয়টিকে আমার পড়ার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করলাম। মাঝে মাঝে মালকিন ভদ্রমহিলা তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে তাঁদের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিতেন এবং একটি তাকের উপর রাখা ফটোস্ট্যান্ডে সেই সময়ের 'মিছিমিছি' আমার বৌয়ের অর্থাৎ মণিকুন্তলার ফটো দেখাতেন। কেরোসিন তেলের স্টোভে একটু আধটু

রান্না করে নিতাম। পাড়ার দোকানে এলাচ দেওয়া উটের দুধের সাথে পাউরুটি বা বিস্কুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিতাম। ল্যাবের বাঙ্গালী সহকর্মী বিজ্ঞানী প্রতুলানন্দ পালের নিষেধ সত্ত্বেও আমি উটের দুধ ছাড়তে পারলাম না। ল্যাবের তথাকথিত বিজ্ঞানীরা আমার সাথে একজন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের (ঝালার) বন্ধুত্ব ভাল চোখে নিত না। আমি ঝালাকে ওর শৈক্ষিক যোগ্যতা (যাকে সোজা বাংলায় বলে এজুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন) বাড়াবার জন্য উৎসাহ দিতাম। ঝালা ওর এজুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন বাড়িয়ে ডি আর ডি ও-র ফিনান্স অফিসার হয়।

জামনগরে কিছুদিন পর ঝালা আমাকে ওর বাড়ীর একদম কাছে এমন একটা ভাড়া বাড়ী খুঁজে দিল যেখানে আমি মাছ মাংস রান্না করতে পারি। বাড়ীতে দুটো ঘরের একটা ঘর আমাকে ভাড়া দেওয়া দেওয়া হয়েছিল। বাকি ঘরটি বন্ধই থাকত। বাড়ীটি জামনগর গান্ধীনগরে ঝালা যে রাস্তায় থাকত সেই রাস্তার ওপরেই। ঝালার বাবা জামনগর মহারাজের ঘোড়সওয়ার বাহিনী থেকে রিটায়ার করেছিলেন। ঝালার বাড়ী রাস্তার এক প্রান্তে ছিল যেখান থেকে ঝালার বাবার দূরবীন দিয়ে আরব সাগর দেখা যেত। এই বাড়ীটি আগের বাড়ী থেকে আমাদের ভালসুরার ল্যাবের কাছে ছিল। সেখান থেকে বাসে করে আমরা পাব্লিক বাসে ভালসুরার ল্যাবে যেতাম। আমি নেভীর লাইব্রেরীতে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। পাব্লিক আওতার বাইরে নেভীর নিজস্ব প্রপ্রাইটারি বা মালিকানাভুক্ত বইয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক কনসেপ্ট সোজা করে দেওয়া থাকত যা আমি প্রচলিত বইয়ে পাইনি। ল্যাবে একদিন জনৈক নেভাল অফিসার আমাকে ওদের ক্লাবে যাওয়ার আহ্বান জানালেন। সেখানে খাওয়া দাওয়ার সাথে, আমি ভয় পেয়েছিলাম, ড্রিংক পরিবেশিত হবে। বেঁচে গেলাম যে সে সব কিছুই হল না। দেখলাম, সেখানে একটা আলোচনা সভা বা সেমিনার হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিভিন্ন দিক নিয়ে। অভাবনীয় যে নেভাল অফিসারদের এরকম একটা ক্লাব থাকবে। তাই এটা ছিল আমার এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত!

গান্ধীনগর থেকে ইন্ডিয়ান নেভাল শিপ (আই এন এস) ভালসুরাতে যাওয়ার সময় আমি একবার পাব্লিক বাসে আমার আই এন এস-এ ঢোকার গেটপাস হারিয়ে ফেললাম। আমাকে আই এন এস-এর হেডের (জনৈক ক্যাপ্টেনের) কাছে গিয়ে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে ল্যাবে ঢুকতে হল।

বিকেলের মধ্যে পাব্লিক বাসের কন্ডাক্টার আমার গেটপাসটি খুঁজে পেয়ে ক্যাপ্টেনের অফিসে জমা দেন। ক্যাপ্টেনের তৎপরতায় এটা সম্ভব হল। ক্যাপ্টেন আমাকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে আমার গেটপাসটি ফেরত দিলেন। তিনি আমার সাথে নানা টেকনিক্যাল বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমি প্রয়োজন হলে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারি।

জামনগরে আমি কারুর সাথে বাঙলায় কথা বলতে পারছিনা দেখে ঝালা আমার চেয়ে বেশী দুঃখিত হয়ে এক রবিবার ছুটির দিনে আমার সাথে 'বাঙালী শিকারে' বেরুল। বাঙালী এক দাস পরিবারের সাথে ঝালার জানাশোনা ছিল। তাঁরা ছিলেন স্বর্ণকার। জামনগরের মহারাজার আমন্ত্রণে তাঁরা সুদূর বাংলা থেকে জামনগরে স্থায়ীভাবে পুরুষাণুক্রমে থাকছিলেন। তাদের সাথে পরিচয় করার জন্য আমরা বাসে করে আমাদের বাড়ী থেকে অনেকটা দূর এলাম। বাস ঠেকে নেমে রাস্তায় ঝালার দেখা হয়ে গেল দাস পরিবারের ঝালার বন্ধুর সাথে। আমি ঝালার বন্ধুর সাথে বাঙলাতেই কথাবার্তা শুরু করলাম। কিন্তু বন্ধুটি আমার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারল না। ও ভাঙাভাঙা হিন্দীতে কিছু বলার বৃথা চেষ্টা করল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যাত্রায় আর ঝালার বাঙালী শিকার হল না। এরকম অভিজ্ঞতা একবার আমার সাউথ কোরিয়া-র সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে হয়েছিল। আমার সহকর্মী চাইনিজ প্রফেসার বি এফ জিয়া আমাকে ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত এক তামিলনাড়ুর ভারতীয়র সাথে আলাপ করতে নিয়ে যান যাতে আমরা 'ভারতীয়' ভাষায় কথা বলতে পারি। আমি তাঁর সাথে হিন্দিতে আলাপ শুরু করি যা তিনি আদৌ বুঝতে পারলেন না। অতএব আমরা ইংরাজিতেই আলাপ করলাম। জামনগরে ঝালার বাঙালী শিকারের মতন সিওলে জিয়ারও ভারতীয় শিকার হল না।

জামনগরে জামশেদপুরের বাড়ীর সকলকে এবং তার সাথে অবশ্যই মণিকুন্তলাকে মিস করতাম। জামনগরে যাওয়ার এক বছর আগে পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে কলকাতায় মণিকুন্তলার সাথে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। চিড়িয়াখানার একটি নিভৃত জায়গায় একটি বেঞ্চে আমরা অনেকক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম। জামনগর থেকে মণিকুন্তলাকে চিঠিতে লিখলাম, যদিও আমি জামনগরে, মণিকুন্তলা যেন আগামী পনেরোই আগস্ট

চিড়িয়াখানার সেই একই জায়গায় এবং সম্ভব হলে সেই একই বেঞ্চে বসে আমার কথা ভাবে। মণিকুন্তলাকে আমার কথা ভাববার সময় নির্দিষ্ট করে দিলাম। ওকে লিখলাম আমিও জামনগরে ঠিক সেই সময়েই ওর কথা ভাববো। এই ভাবে দূরত্বের বাধা ডিঙিয়ে আমরা এক হয়ে যাব। আমি জানতাম মণিকুন্তলা চিড়িয়াখানার সেই একই জায়গায় নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই যাবে। আর সেখানে মণিকুন্তলার জন্য একটি অপার বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেই মুহূর্ত কি ভোলা যায় যখন সত্যি সত্যি মণিকুন্তলা আমাকে সেই জায়গার সেই বেঞ্চেই দেখতে পেল!

সেই যাত্রায় আমি কলকাতায় মণিকুন্তলার সাথে দেখা করে সেখান থেকে জামশেদপুরে গিয়ে মাকে নিয়ে আবার জামনগরে ফিরে যাই। মাকে নিয়ে জামনগরে খুব হৈচৈ করে থাকতাম। আমি ল্যাবে থাকার সময়ে আমাদের বাড়ীতে একটা লেডীস ক্লাব বসে যেত। মার কাছে মহিলারা শাড়ী পড়ার 'বিহারী' স্টাইল শিখত। সেখানে বিহারী বলতে ওরা বিহারী, বাঙালী, অসমীয়া, ইত্যাদি পূর্বভারতীয়দের সবাইকে বোঝাত, যেমন আমরাও তখন মাদ্রাজী বলতে তামিল, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরলা, কর্ণাটক প্রদেশের দক্ষিণভারতীয়দের বুঝতাম। মনে পড়ে যায়, এক লাইনে আসা উটের লম্বা সারি আমাদের বাড়ীর কাছে একটা গোলাকার জলাশয়ে জল খাওয়ার জন্য একটি একটি করে দাঁড়িয়ে একটি গোলাকার বৃত্ত রচনা করত। জল খাওয়ার পর আবার উটের সারি একটা লম্বা লাইন করে চলে যেত। এই মনমনোহর দৃশ্য মা আর আমাকে মুগ্ধ করত। জামনগরে থাকাকালীন আমরা সেখানকার এয়ারফোর্স কলোনির দুর্গা পূজা দেখার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। তাঁদের দ্বারা অভিনীত থিয়েটার আমাদের মুগ্ধ করেছিল। মাকে নিয়ে আমরা ফরাসি ডাক্তার জিন সেইডম্যানের তত্ত্বাবধানে মহারাজা রঞ্জিত সিং দ্বারা ১৯২০ দশকে প্রতিষ্ঠিত সোলারিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। সোলারিয়ামটি এমনভাবে তৈরী যে এর 'ঘূর্ণ্যমান' উপরতলাটি সারাদিন ধরে সোজাসুজি সূর্যের কিরণ পায়। চর্মরোগ, টিবি, রিউম্যাটিস্ম, ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় সোলারিয়ামকে অতীতে ব্যবহার করা হ'ত।

জামনগরে আমাদের বাড়ীর কাছে পাড়ার দোকানে কুড়ি কিলো চাল কিনতে চাওয়াতে দোকানদার মুশকিলে পড়ে গেলেন। উনি বললেন ওখানকার কোন দোকানদার একসাথে পাঁচ কিলোর বেশী চাল রাখেন না।

কারণ ওখানকার লোকেরা চাল তো দূর, গমের আটার রুটিও খায়না। ওরা শুধু বাজরার আটার রুটি খায় নয়ত নাকি ওদের পেট ভরেনা। এরকমই দেখেছি সিওলে যেখানে কোরিয়ানরা লাঞ্চ বা ডিনারের শেষ পাতে ছোট এক হাতা ভাত খেত। সেখানে আমরা অনেক পরিমান মানে কুড়ি কিলো চাল কিনতে চাওয়াতে ওরা অবাক হয়েছিল। জামনগরে আরেকটা অভিজ্ঞতা হল মাছের বাজারে। সেখানে দাঁড়িপাল্লায় ওজন না করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের একটি আয়তকার কাঠের পিঁড়ির উপরে ছোটছোট সামুদ্রিক মাছগুলো ছড়িয়ে তাদের পরিমাপ করে দাম ঠিক করা হ'ত। অর্থাৎ, সেখানে মাছের পরিমাণের মাপকাঠি ওজনের সের না হয়ে ক্ষেত্রফলের বর্গগজ ছিল। ছুটির দিনে ঝালা যখন আমাদের বাড়ীতে লুকিয়ে মাছ খাচ্ছিল, তখন ওর বোন গুনবা হঠাৎ আমাদের বাড়ী চলে এসেছিল। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, তবে সে যাত্রায় ঝালাকে মাছকে কাঁচাকলা বলে চালিয়ে বাঁচিয়ে দিলাম।

ঝালার সাথে মাকে নিয়ে জামনগর থেকে দ্বারকাযাত্রা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ঝালার উদ্ভাবনী দুষ্টুমির জন্য। ঝালার কাছে আমাদের তিনজনের ট্রেনের টিকিট ছিল। কিন্তু ঝালা গল্পটা এই ভাবে সাজাল যে আমি আর মা দ্বারকা যাচ্ছি আর ও আমাদের সি-অফ করতে জামনগর রেলস্টেশনে এসেছে। ট্রেনের কামরায় উঠে আমাদের জিনিষপত্র ঠিক জায়গায় রেখে ও আমাদের জোরে জোরে বোঝাতে লাগল, যাতে সহযাত্রীরা শুনতে পায়, দ্বারকা স্টেশনে নেমে আমরা কোন ধর্মশালায় উঠব, কোথায় কোথায় যাব, ইত্যাদি। ট্রেন ছাড়ার সিগন্যাল হিউসিল শোনা গেল। সহযাত্রীরা ঝালাকে ট্রেনের কামরা থেকে নামার জন্য বলতে থাকল। ট্রেনের কামরা থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম থেকে কামরার জানালা দিয়ে আমাদের সাথে গল্পগুজব করতে থাকল। কিন্তু হটাৎ, একটা জলের বোতল দিতে ও আবার আমাদের ট্রেনের কামরায় উঠে পড়ল। ঝালার 'এই নামছি এই নামছি'র মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেন স্পীড নেওয়ার পর শুরু হল ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে ঝালার প্ল্যাটফর্মে নামার উপক্রম আর সহযাত্রীদের ঝালাকে ঠেকিয়ে রাখা যাতে ও নামতে গিয়ে বিপদে না পড়ে। অবশেষে ধরে বেঁধে ঝালাকে বসিয়ে সহযাত্রীদের শলা পরামর্শ হল ঝালা কি ভাবে পরের স্টেশনে নেমে ফেরত ট্রেনে জামনগর ফিরে যেতে পারে। পরের স্টেশনে ঝালা নেমে গেল। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে এক ঠোঙা বাদাম ভাজা দেওয়ার জন্য আবার আমাদের

কামরায় উঠে পড়ল এবং আবার ওর চলন্ত ট্রেন থেকে নামার ও সহযাত্রীদের বাধা দেওয়ার পর্ব শুরু হল। এরপর সহযাত্রীদের জানিয়ে দিল যে ও আমাদের ভরসা করতে পারছেনা এবং সেও আমাদের সাথে দ্বারকা যাবে। টিকিট চেকার এলে ওনাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে আমাদের টিকিটগুলো চেক করাল। নানা দুষ্টুমিতে এইভাবে ঝালা আমাদের জামনগর থাকার মুহূর্তগুলো আনন্দময় করে তুলেছিল।

ঝালার সৌজন্যে মা'র চার ধামের এক ধাম, শ্রী কৃষ্ণের দ্বারকা রাজভূমি দেখার ইচ্ছা পূর্ণ হল। দ্বারকাধীশ বা জগত মন্দির ইত্যাদি দর্শন করে দ্বারকা থেকে আমরা প্রায় তিরিশ কিলোমিটার উত্তরে আরব সাগরের ছোট বন্দর নগর ওখা গেলাম। 'ওখা' একটি গুজরাতী শব্দ যার অর্থ হল 'ঊষা'। শ্রী কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী ঊষা (বাণাসুরের কন্যা) বা ওখার নামে নগরটির নাম। সেখানে আমাদের শ্রী কৃষ্ণ মন্দিরের দর্শন হল। ওখা থেকে নৌকা করে আরব সাগের খাঁড়ির একটি দ্বীপ, বেট দ্বারকা যাওয়ার সুন্দর অনুভূতি এখনো আমার মনবীণার তারকে ঝংকৃত করে। বলা হয়, শ্রী কৃষ্ণের আদি বাড়ী ছিল শঙ্খোধর বা বেট দ্বারকা। সেখানে আমার মার আকর্ষণ ছিল শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির। মনে আছে বেট দ্বারকায় মার স্যান্ডেলটা ছিঁড়ে গেল। সেখানে রাস্তায় মুচি পাওয়া গেলনা। মুচির বাড়ীর সন্ধান পেলাম। একটা দড়ি টেনে কলিং বেল বাজাতে মুচি দোতলা থেকে একতলায় এসে বসার ঘরটিতে আমাদের আদর করে বসিয়ে মার স্যান্ডেলটা সারিয়ে দিলেন।

ইনব্যাফেলের আমার সিনিয়ার অমলদার (ঘোষ) সাথে জামনগরে আলাপ হয়েছিল। উনি সেখানে ভারত সরকারের লাইটহাউস অ্যান্ড লাইটশিপস বিভাগে কাজ করতেন। ওনার মাকে নিয়ে উনি সোমনাথ যাচ্ছিলেন। সঙ্গে আমার মাকেও নিয়ে গেলেন। এইভাবে মা'র সোমনাথের জ্যোতির্লিংগ মন্দির দর্শনের ইচ্ছেও পূর্ণ হল। মাকে নিয়ে ভারতের নানা তীর্থস্থানে যাওয়ার মুহূর্তগুলো মনের ভিতর ভিড় করে আসছে। অন্যান্য অধ্যায়ে তাদের ধরে রাখার ইচ্ছে নিয়ে আবার জামনগরে ফিরে আসা যাক। রাডার বিজ্ঞানী ডঃ আর পি শেনয়, যার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লিখেছি, একদিন আই এন এস, ভালসুরা-তে আমাদের ল্যাব ভিজিট করতে এলেন। পি এইচ ডি কমপ্লিট না করে ডি এল আর এল জয়েন করার জন্য তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। ঠিক সেই সময়ে বন্ধু সমীর লাহিড়ীর ইনব্যাফেল

থেকে লেখা একটা চিঠি পেলাম, যেখানে ও লিখেছে যে ওর একটা রিসার্চ পেপার একটি প্রসিদ্ধ জার্নালে ছাপার জন্য স্বীকৃত হয়েছে। এই ঘটনাদুটো আমাকে উদ্বুদ্ধ করল ডি এল আর এল ছেড়ে পি এইচ ডি করার জন্য অ্যাকাডেমিক্স-এ চলে আসতে। এই ভাবে আমি জামনগর থেকে আই আই টি খড়গপুরে এন বি সি স্যারের কাছে পি এইচ ডি করার জন্য চলে এলাম। জামনগরের পাড়া প্রতিবেশীরা রেল স্টেশনে চোখের জলে আমাদের বিদায় দিলেন। আমার বড় ছেলে বিল্কু একবার আমার মাকে, ঝালার চিঠি আসার পর, অনুযোগ করেছিল কেন ওর ঠাম্মা তার একটি ছেলেকে (ঝালাকে) এত দূর রোজগার করতে পাঠাল।

জামনগর ছাড়ার পর ঝালার সাথে আমার সুসম্পর্ক অব্যাহত ছিল। জামনগরে ওর শৈক্ষিক যোগ্যতায় ও ছিল ম্যাট্রিক পাস। ওকে আমি ওর শৈক্ষিক যোগ্যতা বাড়াবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকি। ও জামনগর থেকে হায়দ্রাবাদে—প্রথমে ডি এল আর এল-এ এবং পরে ডি আর ডি এল-এ—ট্র্যাসফার হয়। ডি এল আর এল-এর প্রজেক্ট রিভিউ করতে হায়দ্রাবাদে গেলে ঝালাদের বাড়ীতে অবশ্যই যেতাম। হায়দ্রাবাদে আমার থাকার ব্যবস্থা ডি আর ডি এল গেস্টহাউসে হ'ত। হলে ডিনারের সময় শ্রদ্ধেয় এ পি জে কালাম-এর সাথে একবার দেখা হয়েছিল। একা মানুষ, তিনি ল্যাব ডিরেক্টারের কোয়ার্টারে না থেকে গেস্টহাউসে-ই থাকতেন। ঝালা তখন ফিনান্স অফিসার, এবং কালাম স্যারের খুব কাছের লোক হয়ে সুনামের সাথে কাজ করত। কালাম স্যার ডি আর ডি এল-এ প্রায় দশ বছর ডিরেক্টার হিসেবে থাকাকালীন 'নাগ', 'ত্রিশুল', 'অগ্নি' ইত্যাদি মিসাইল প্রোগ্রামকে সফল করতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই ভাবে তিনি নিজেকে 'ভারতের মিসাইলম্যান' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই মিসাইলম্যানের প্রসঙ্গ এল যখন একবার আমি ঝালাকে হায়দ্রাবাদে একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে চাইলাম। সময়টা যখন ব্যাঙ্গালোরের একটি ডি আর ডি ও ল্যাব (মাইক্রোওয়েভ টিউব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার) আমাকে আমন্ত্রণ জানাল অ্যামেরিকা থেকে আমন্ত্রিত আর্নল্ড এক্কারের লেকচার শোনার এবং তাঁর সাথে ইন্টারেক্ট করার জন্য। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে ওয়ার্ল্ড সাইন্টিফিক পাবলিশার্স প্রকাশিত আমার লেখা একটি বই সমাদৃত হয়েছিল। বেনারস থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট না থাকাতে আমি

হায়দ্রাবাদে গিয়ে সেখানে ঝালার বাড়ী এক রাত্রি থেকে পরের দিন সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার প্ল্যান করলাম। কিন্তু ঝালার বাড়ী গিয়ে জানতে পারলাম ও কয়েক দিন আগে কাঞ্চনবাগে ডি আর ডি এল-এর কোয়ার্টারে শিফ্ট করে গেছে। সেখান থেকে কাঞ্চনবাগের ঝালার কোয়ার্টারে গিয়ে জানতে পারলাম যে ছুটির দিন রবিবার হলেও ঝালা অফিসে আছে। ঝালার স্ত্রী মনোহরবা টেলিফোনে আমার আসার খবর ঝালাকে জানাতে, ঝালা দুদিনের জন্য ও ওর দাদা অর্থাৎ আমার সাথে কাটাবে এই কারণ দেখিয়ে ডিরেক্টার কালাম স্যারের সাথে দুদিনের ছুটির দরখাস্ত নিয়ে দেখা করল। কালাম স্যার ঝালাকে একদিনের ছুটি গ্র্যাট করে ওর সাথে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাকে ওনার কাছে নিয়ে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু ঝালা ঠিক করে নিয়েছিল যে ও আমাকে নিয়ে কালাম স্যারের কাছে যাবেনা। ওর ভয় হল কালাম স্যার নানা অছিলায় আমাকে বুঝিয়ে ঝালার ছুটি ক্যান্সেল করে দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা কোথাও পড়েছিলাম। কালাম স্যার ইসরো, ব্যাঙ্গালোরের চেয়ারম্যান থাকার সময় জনৈক বিজ্ঞানকর্মীকে একটি কাজ দিয়েছিলেন যা তিনি দিনের শেষে করতে না পারায় পরের দিন কাজটি করবেন বলে কালাম স্যারকে বলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন যে সেই দিন সন্ধ্যের সময় তাঁর ছেলেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ছেলেকে নিয়ে একটি প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু কালাম স্যার রাজী না হওয়াতে তাঁকে একটু রাতে বাড়ী ফিরতে হল। ছেলেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারায় তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি বাড়ীতে গিয়ে একটা 'মিউসিক ফেস' করবেন। সেসব কিছুই হল না। তিনি ছেলেকে বাড়ীতে দেখতে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানতে পারলেন যে কালাম স্যার নিজেই তাঁদের বাড়ীতে এসে তাঁদের ছেলেকে নিয়ে ছেলের বাবার প্রতিশ্রুত প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু ঝালা জানত না যে পরের দিন সকালে আমার হায়দ্রাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার ফ্লাইট। ঝালা আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে ওর ছুটি ক্যান্সেল করে অফিস জয়েন করল। আর আমি আর্নল্ড এক্কারের লেকচার প্রোগ্রাম এটেন্ড করতে হায়দ্রাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছে গেলাম। ঝালা আমাকে নিয়ে মিসাইলম্যানের সাথে দেখা করার অঙ্গীকার পালন করতে পারলনা। মিসাইলম্যানকে আমি নিরাশ করলাম।

# মশারিটা তো নিলে না

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে, পি এইচ ডি করার জন্য ডি এল আর এল-এর কাজ ছেড়ে আমি জামনগর থেকে এন বি সি স্যারের কাছে খড়গপুর আই আই টি-র ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে এলাম। আশ্চর্য, খড়গপুর আই আই টি-র যে ডিপার্টমেন্টে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে অর্থাভাবে আমি বি টেক ক্লাসে এডমিশন নিতে পারিনি সেই ডিপার্টমেন্টেই আমি পি এইচ ডি-র রিসার্চ করতে এলাম। আমি চেয়েছিলাম স্যারের কাছে কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কাজ করব। তখন তিনি ওই বিষয়েই রিসার্চ করছিলেন। খড়গপুরে যখন তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন আমার হাতে ছিল এস চন্দ্রশেখরের বিখ্যাত বই 'প্লাজমা ফিজিক্স', যা তিনি দেখে ফেলেছিলেন। ফলস্বরুপ, তিনি কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, প্লাজমা ফিজিক্স সম্পর্কিত একটি বিষয়ে আমার পি এইচ ডি-র রেজিস্ট্রেশন করালেন (বিষয়বস্তু ছিলঃ নন-লিনিয়ার এফেক্টস ইন ডবল-বিম অ্যান্ড বিম-প্লাজমা অ্যামপ্লিফায়ার্স)। জিনিয়াস ছিলেন বলে একই সঙ্গে এন বি সি স্যার বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের গাইড করতে পারতেন। তাইতো তিনি কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস সি হওয়া সত্ত্বেও সমীরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় আই আই টি, খড়গপুরে মাইক্রোইলেক্ট্রনিকস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমীর (লাহিড়ী) ছিল আমার ইনব্যাফেলের ক্লাসমেট। এন বি সি-র কথা লিখতে গিয়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর কথা মনে আসে, যিনি একাধারে ছিলেন পদার্থবিদ, বটানিস্ট, এবং মাইক্রোঅয়েভ ইঞ্জিনিয়ার। এই প্রসঙ্গে একটি যথোপযুক্ত উক্তিও মনে আসে—

"প্রকৃতি তো একটাই—সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভাজন মানুষের চাপানো, প্রকৃতির নয়। প্রকৃতপক্ষে এমত বিভাজন করা মানুষের অসামর্থ্যের পরিচায়ক; সম্পূর্ণকে একসাথে দেখার আমাদের সীমিত ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে।" — উইলিয়াম সিসিল ড্যাম্পিয়ার।

["There is only one nature — the division into science and engineering is a human imposition, not a natural one. Indeed, the division is a human failure; it reflects our limited capacity to comprehend the whole." —William Cecil Dampier]

খড়গপুর আই আই টি-তে আমি রিসার্চ স্কলারদের জন্য চিহ্নিত হস্টেল বি সি রায় হলে থাকতাম। খড়গপুর রেল স্টেশন থেকে আই আই টি-তে সাইকেল রিকশা করে আসতে হ'ত। রিকশা-চালকরা বেশীর ভাগই অন্ধ্র প্রদেশের তেলেগুভাষী ছিলেন। তাঁরা অনেকেই মদের নেশায় চুর হয়ে রিকশা চালাতেন। কথিত ছিল, দিয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সেই রকম একজন রিকশা-চালক যদি তাঁর সামনে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়েন তবে কাঠিটি দপ করে বড় আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠবে। মদ খেতে বারণ করলে রিকশা-চালকরা সে নিষেধ শুনতেন না। কারণ হিসেবে কারণবারি মদকে রিকশার পেট্রল বলতেন। পেট্রল অর্থাৎ কারণবারি ছাড়া নাকি তাঁদের গাড়ী চলবেনা। হস্টেলে আমাদের সিঙ্গল-সিটেড রুম ছিল। সন্ধ্যাবেলায় আমার রুমে ওয়ার্ড-বয়দের পড়াতাম—ওদের স্কুল ফাইনালের জন্য তৈরি করতে সাহায্য করতাম।

খড়গপুর আই আই টি-তে অপূর্বদা (দত্ত) আমাদের পাশের হস্টেলে থাকতেন। অচিন্ত্যদা (মুখার্জি) আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়াতেন। দু'জনেই এন বি সি স্যারের কাছে পি এইচ ডি-র জন্য কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে রিসার্চের কাজ করতেন। এক রবিবার ছুটির দিনে অপূর্বদার ল্যাবে একটা এক্সপেরিমেন্ট করার কথা। কিন্তু অপূর্বদা ল্যাবে না গিয়ে হস্টেলে তাস খেলায় মত্ত ছিলেন। অপূর্বদাকে ল্যাবে না পেয়ে স্যার অপূর্বদার হস্টেলে গিয়ে অপূর্বদাকে ল্যাবে পাঠিয়ে নিজেই অপূর্বদার জায়গায় তাস খেলতে বসে গেলেন। দিলীপদা (ভট্যাচার্য্য) প্রফেসার বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির কাছে পি এইচ ডি-র জন্য কাজ করতেন। আমরা যখন আড়াইশ টাকা ইন্সটিট্যুট ফেলোশিপ পেতাম, দিলীপদা পেতেন পাঁচশ টাকা, একটা ডিফেন্স প্রজেক্ট থেকে। দিলীপদা তাঁর স্ত্রী, আমাদের ইন্দিরা বৌদিকে নিয়ে ইন্সটিট্যুট লাগোয়া প্রেমবাজারে একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন। দিলীপদার ছেলে বাবাই (উদ্দালক) পরে ডিপার্টমেন্ট থেকেই প্রথম স্থান নিয়ে বি টেক করে

ইউ এস এ চলে যায় এবং ও এখন ইনটেল, অরিগন-এ কর্মরত। আই আই টি মেকে সেবা নিবৃতির পর দিলীপদা আদিসপ্তগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের একাডেমী অফ টেকনলজির ডিরেক্টার হন। প্রফেসার বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমার রিসার্চে কাজে লাগতে পারে একটি জার্নালের বিশেষ বিশেষ ইস্যু আমাকে দিতেন। ডিপার্টমেন্টর আরেকজন প্রফেসার বিশ্বনাথ দাস আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। প্রফেসার জি এস সান্যাল আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন। পরে তিনি খড়গপুর আই আই টি'র ডিরেক্টার হন। সেখানে তাঁর নামে 'জি এস সান্যাল স্কুল অফ টেলিকম্যুনিকেশনস' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রফেসার জি এস সান্যাল এবং প্রফেসার বিশ্বনাথ দাস দুজনেই পূর্ব ভারত থেকে 'ইন্টারন্যাশনাল সিম্পোসিয়াম অন মাইক্রোওয়েভস-মাইক্রোওয়েভ পায়োনিয়ার অ্যাওয়ার্ড' দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। এরপর ২০১৬ সালে এই অ্যাওয়ার্ড আমি পাওয়ার পর, এপর্যন্ত পূর্ব ভারত থেকে তিনজনের এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি যখন এন বি সি স্যারের কাছে পি এইচ ডি-র জন্য কাজ করছি, তখন ডিপার্টমেন্ট হেড প্রফেসার জি এস সান্যাল আমাকে ডিপার্টমেন্টের সব ল্যাবে গিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টের ইক্যুপমেন্টের লিস্ট বানাতে বললেন। কাজটি বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। এক দিকে এই কাজটি দিয়ে প্রফেসার সান্যাল আমাকে ডিপার্টমেন্টকে জানার সুযোগ করে দিলেন, অন্য দিকে এন বি সি স্যার এই কাজের জন্য আমার রিসার্চ ব্যাহত হচ্ছে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। খড়গপুর আই আই টি থেকে অফিসিয়াল কাজে প্রফেসার বিশ্বনাথ দাস বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এলে ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল আতিথেয়তা না নিয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে এসে থাকতেন। সেই ভাবে ইনব্যাফেল থেকে এম কে ডি জি (মৃণাল কান্তি দাশগুপ্ত) স্যার বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এলে আমাদের কোয়ার্টারেই থাকতেন।

প্রফেসার জি এস সান্যাল প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। যখন তিনি খড়গপুর আই আই টি'র ডিরেক্টার ছিলেন, তখন তিনি স্বনামধন্য দিল্লী আই আই টি'র প্রফেসার ভারতী ভটের সাথে, দুই মেম্বারের একটি ইউ জি সি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আমাদের ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিনিং ডিপার্টমেন্ট ভিজিট করেন। উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের সেন্টার অফ রিসার্চ ইন মাইক্রোওয়েভ ট্যুব্স-কে ভরণ-

পোষণ অনুদানের জন্য ইউ জি সি-কে সুপারিশ করা। সেই সময় ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন প্রফেসার এস কে শ্রীবাস্তব এবং সেন্টারের কোঅর্ডিনেটর ছিলেন প্রফেসার আর কে ঝা। ভিজিটের পর ভাইস-চ্যান্সেলারের সৌজন্যে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা হল। ইউনিভার্সিটি-র একজন নিমন্ত্রিত অতিথি, যিনি মনে হচ্ছিল ভাইস-চ্যান্সেলারের বিশেষ জানাশোনা, মন্তব্য করছিলেন যে আমাদের দেশের নিজস্ব স্বাধীন যোগ্যতা নেই কোন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করার। উদাহরণ হিসেবে তিনি বললেন যে ভারতে স্কুটার কোম্পানিগুলি বিদেশী পার্টস আনিয়ে সেগুলোকে শুধু এসেম্বেল করে। প্রফেসার ভারতী ভট এই মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি বললেন যে তিনি নিজে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা মাইক্রোওয়েভ ইক্যুপমেন্ট তৈরি করেছেন। কিন্তু কোনও কোম্পানী তাঁর টেকনলজি নো-হাউ নিচ্ছেন না। সবাই তাঁর ইক্যুপমেন্ট থেকে নিকৃষ্টমানের বিদেশী ইক্যুপমেন্ট নিতে আগ্রহী। তর্ক অনেক দূর গড়াবার আগে প্রফেসার জি এস সান্যাল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "যেমন ৪ এর স্কোয়ার রুট +২ এবং -২ দু'টোই ঠিক, তেমনই আপনারা দু'জনেই ঠিক। এবার লাঞ্চ নেওয়া যাক, নয়তো আমরা প্লেন মিস করব।"

আমার লেখা প্রপোসালের ভিত্তিতে সুপারিশের মিনিটস বা বিবরণ লেখা হয়েছিল। কিন্তু টাইপিস্টের ভুলের জন্য সুপারিশের বিবরণীতে দুজন সাইন্টিস্টের পোস্ট বাদ হয়ে গিয়েছিল। আমার অবর্তমানে সুপারিশ-বিবরণটি টাইপ হয়েছিল, এবং আমাদের সেন্টারের প্রফেসার ঝা-র উপস্থিতিতে তার উপর প্রফেসার সান্যাল এবং প্রফেসার ভট মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলারের সাথে লাঞ্চের পর ডিপার্টমেন্টে এসে এই সুপারিশ-বিবরণটি-র প্রতিলিপিতে একটি মারাত্মক ভুল দেখতে পেলাম। দেখলাম, যেসব পোস্ট সেন্টারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল তার মধ্যে দুটি সাইন্টিস্টের পোস্ট বাদ হয়ে গেছে। এই ভুলের জন্য দুজন সাইন্টিস্ট বেকার হয়ে যাবেন। এই ভুল শোধরানোর জন্য এয়ারপোর্টে গিয়েও প্রফেসার সান্যাল এবং প্রফেসার ভটকে পাওয়া গেলনা। তাঁদের ফ্লাইট ততক্ষণে যথাক্রমে কলকাতা এবং দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। কমিটির সুপারিশ-বিবরণটি প্রফেসার সান্যালের কাছেই ছিল, যেটা তাঁর ফিরে গিয়ে খড়গপুর আই আই টি থেকে ইউ জি সি-কে পাঠানোর কথা।

টেলিফোনে কিছুতেই প্রফেসার সান্যালের সাথে যোগাযোগ করা গেল না। যেহেতু আমি প্রফেসার সান্যালের বিশেষ পরিচিত, ঠিক হল আমি খড়গপুর আই আই টি গিয়ে প্রফেসার সান্যালের সাথে দেখা করে এই ভুল শোধরানোর চেষ্টা করব। অতএব, ট্রেনে, বিনা রিসার্ভেসনে এবং অনেক কষ্ট সহ্য করে, বেনারস থেকে খড়গপুর পৌঁছুলাম।

কিন্তু যেদিন সকালে খড়গপুরে পৌঁছুলাম, আই আই টি-তে গিয়ে শুনলাম যে ডিরেক্টার প্রফেসার সান্যালকে কোন কারণে তাঁর অফিসে রিসার্চ স্কলাররা 'ঘেরাও' করে রেখেছে এবং অফিস থেকে বাড়ীতে যেতে দিচ্ছে না। এন বি সি স্যার আমাকে নিয়ে ঘেরাও টপকে প্রফেসার সান্যালের সাথে দেখা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। সেই দিনটা আমি আমার বন্ধু সমীর লাহিড়ীর কোয়ার্টারে থাকলাম। পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে সমীরের কাছে খবর এল যে শরীর খারাপ হয়ে পড়াতে রিসার্চ স্কলাররা ঘেরাও মুলতুবি রেখে প্রফেসার সান্যালকে তাঁর কোয়ার্টারে আসতে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার ব্রেকফাস্ট মুলতুবি রেখে এক দৌড়ে প্রফেসার সান্যালের কোয়ার্টারে চলে গেলাম। সিক্যুরিটির কর্ডন ভেঙে "আমি বৈদ্যনাথ বসু" বলতে বলতে স্যারের কোয়ার্টারের বারান্দায় উঠে পড়লাম। সৌভাগ্যক্রমে স্যার আমার গলা চিনতে পারলেন এবং শুনতে পেলাম স্যার বলছেন, "সিক্যুরিটি, বৈদ্যনাথকে আসতে দাও।" স্যার বললেন, "ঝা নিশ্চয় একটা ভুল করেছে।" স্যারকে কি ভুল হয়েছে জানালাম। উঁচু তাকে রাখা একটা ফাইল স্যার তাঁর কাছে আনতে বললেন। তখনও ঐ 'ঘেরাও'-এর কারণে তিনি সুপারিশ-বিবরণটি ইউ জি সি-কে পাঠাতে পারেন নি। টেলিফোনে প্রফেসার ভারতী ভটের সম্মতি নিয়ে সুপারিশ-বিবরণটির যথাস্থানে দু'জন সাইন্টিস্টকে জুড়ে দিলেন। আমাদের দু'জন সাইন্টিস্ট সহকর্মী বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

আবার আমার রিসার্চ মেন্টার এন বি সি স্যারের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। স্যারের সাথে প্রথমে আড়ি এবং তার পরে ভাব হওয়ার পর স্যার একবার শম্পা, পম্পা, ও স্যারের স্ত্রীকে (ঝর্না বৌদি) নিয়ে জামশেদপুরে আমবাগান রোডের আমাদের যৌথ পরিবারের বাড়ীতে এসে থেকেছিলেন, এবং সেখান থেকে মণিকুন্তলা, আমাদের ছেলে বিল্কু, ও আমাকে নিয়ে রাঁচি বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণে আমরা বিড়লা ইন্সটিট্যুট অফ

টেকনলজি (বি আই টি), মেসরা ক্যাম্পাসে আমার খড়গপুর আই আই টি-র রিসার্চ স্কলার বন্ধু সিয়ারাম শর্মার কোয়ার্টারে উঠেছিলাম। স্যারের কাছে সিয়ারাম পি এইচ ডি-র জন্য রিসার্চ করছিল। বি আই টি-তে আমি রকেট লঞ্চিং-এর পরীক্ষণ দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। সিয়ারামের বাড়ীতে আমরা পিকনিক করার আনন্দ পেয়েছিলাম। তবে এই রাঁচি ভ্রমণে হুন্ডরু, জোনা, ও রাজরাপ্পা-র 'ঝর্না' দেখতে এসে ইটের ওপরে হিটিং এলিমেন্ট ছড়ানো উনুনে রান্না করতে আমাদের 'ঝর্না' বৌদিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। মনে পড়ল, রাজরাপ্পা-তে জলের স্রোতের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা কালো পাথরের টুকরোগুলো দূর থেকে দেখে ছোট্ট বিল্কু তাদের জলহস্তী (হিপ্পোপটেমাস) ভেবেছিল। অনেক দিন পর এই বিল্কুরই বিয়ে উপলক্ষ্যে স্যার ও ঝর্না বৌদি আমাদের বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে এসেছিলেন।

খড়গপুর আই আই টি-তে থাকার সময় ছুটির দিনে আমি এবং স্যারের অন্যান্য রিসার্চ স্কলার-রা স্যারের কোয়ার্টারে চলে যেতাম। মনে আছে গ্রীষ্মের শেষে স্যারের কোয়ার্টারের বাগান থেকে আকাশে উত্তর-দিকে-ধাবমান মেঘের বাহিনী দেখিয়ে স্যার বলতেন এরা হিমালয় পর্বতে ধাক্কা খেয়ে পনের দিন পর ফিরে এলে বর্ষা শুরু হবে। স্যারের কোয়ার্টারে অপূর্বদা এলে আমাদের আড্ডা জমে উঠত। স্যারের কোয়ার্টারে অপূর্বদার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম। একদিন অপূর্বদার আঙুলে একটা ব্যান্ডেজ দেখে বৌদি জিজ্ঞেস করল, "অপূর্ব, তোমার আঙুলে কি হয়েছে?" কোন কিছু ছুরি দিয়ে কাটতে গিয়ে অপূর্বদার আঙুল কেটে গিয়েছিল। কিন্তু অপূর্বদার ছোট উত্তর ছিল, "কিছুই হয়নি বৌদি; চিন্তার কিছু নেই, ক্যান্সার হয়েছে।"

স্যার একবার আমাকে একটি এম টেক থিওরি পেপারের কয়েকটা ক্লাস নিতে বললেন। বিষয়টি ছিল ট্র্যাভেলিং-ওয়েভ ট্যুব (এক ধরনের মাইক্রোওয়েভ ট্যুব) সম্বন্ধিত। সেই ক্লাস আমার বন্ধু হরি মোহন গুপ্ত ও বিনয় সরকার (তখন ওরা এম টেকের ছাত্র ছিল) অ্যাটেন্ড করেছিল। হরি মোহন আই আই টি দিল্লীর প্রফেসার হয়েছিল। বিনয় সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড মাইক্রোওয়েভ ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ, বোম্বাই-এর ডিরেক্টার হয়েছিল। অদ্ভুত যোগাযোগ যে পরবর্তী কালে ভারতে প্রথম

ট্র্যাভেলিং-ওয়েভ ট্যুব (যে বিষয়ে আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম) ডেভেলপ করার কৃতিত্ব সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিট্যুট (সি রি), পিলানীর যে টিমের, আমিও সেই টিমের একজন সদস্য হয়েছিলাম। ছাত্র হিসেবে ওই ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছিলেন ইন্ডিয়ান এয়ার-ফোর্সের একজন অভিজ্ঞ অফিসার। তিনি বললেন আমি কয়েকটা ক্লাস নেওয়ার পর তিনিও কয়েকটা ক্লাস নেবেন। কারণ, তাঁর ট্রাভেলিং-ওয়েভ ট্যুব (আমার ক্লাসের বিষয়টি) ব্যবহার করার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। স্যারও আমার সাথে তাঁর ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছিলেন।

বি সি রায় হলে থাকাকালীন অরুণদার (ডক্টর অরুণ চ্যাটার্জীর) আমার সাথে পরিচয় হয়। তিনি পোস্ট ডক্টরাল ফেলো ছিলেন, খুব সম্ভবত ম্যাথেমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে। আমার রুম থেকে একটা রুম ছেড়ে তাঁর রুম ছিল। তিনি সব সময় স্যুটেড-বুটেড থাকতেন। ডাইনিং হলে তিনি ওয়েল ড্রেস্ড হয়ে আসতেন। একদিন মাঝ রাতে তিনি আমার রুমে আলো জ্বলছে দেখে 'নক' করলেন। তিনি আমার রুমে এসে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। জানতে চাইলেন সেইদিন ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্টের সময় আমরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম কি না। তিনি প্রায়ই আমাকে এই ধরণের অবান্তর প্রশ্ন করতেন। তিনি নিজেই বললেন যে এই রকম সন্দেহ করা তাঁর একটা মানসিক বিকার, যার কারণ তাঁকে নাকি তাঁর গ্রামের একজন তাঁকে তথাকথিত 'বাণ' মেরেছে। একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের এরকম কুসংস্কার থাকতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। এর অনেক বছর পর খড়গপুর আই আই টি-তে সমীরের সাথে এক রবিবার টেক-মার্কেটে বাজার করতে গিয়ে অরুণদার সাথে দেখা হল। মনটা খারাপ হয়ে গেল অরুণদাকে অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় ভিক্ষা করতে দেখে। অরুণদা আমাকে চিনতে পারলেন। সমীর বাজার করে বাড়ী গেল আর আমি অরুণদার সাথে বাজারের একটা রেস্টুরেন্টে চা সিঙ্গারা খেতে খেতে গল্প-গুজব করলাম। তিনি আমাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। বাড়ীতে গিয়ে সমীরের কাছে গিয়ে শুনলাম আমার সাথে অরুণদার স্বাভাবিক ব্যবহার করাটা নাকি সাময়িক। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও নাকি অরুণদাকে সুস্থ করা যায়নি।

এ রকম আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। চন্দনগর লাগোয়া মানকুণ্ডুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সুপ্রীম নলেজ ফাউন্ডেশন গ্রুপ অফ ইন্সটিট্যুশনে

থাকাকালীন জনৈক অচেনা ভদ্রলোকের ফোন পেলাম। তাঁর নামটা উহ্য থাক। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করতেন। তাঁর প্রবলেমটা ছিল তাঁর মাথার ভিতরটা নাকি দিনরাত দপদপ করে মাইক্রোয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাইব্রেট করার দরুন। যার জন্য তিনি রাতের পর রাত ঘুমাতে পারছেন না। কারণ হিসেবে তিনি বললেন তাঁর এক সহকর্মীর কথা যিনি এখন বেঁচে নেই। তাঁর সাথে ওনার বনিবনা হ'তনা। মারা যাওয়ার আগে তিনি নাকি ওনাকে মাইক্রোয়েভ 'বাণ' মেরে তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরটা ওলট পালট করে দিয়েছেন। আমার নামটা তিনি নাকি ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে কলেজে ফোন করে আমার ফোন নাম্বারটা জানতে পেরেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস মাইক্রোয়েভ রেডিয়েশন দিয়ে আমি নাকি তাঁকে ভাল করে দিতে পারি। আমি বেনারসে থাকাকালীন ওনার ফোন এলে আমার ছোট ছেলে আপ্পুর বউ শ্বেতা অরোরাকে ফোনটা দিতাম। শ্বেতা আমার সেক্রেটারি হয়ে ওনার ফোন ধরত। আপ্পু এবং শ্বেতা দু'জনেই জুলজিতে ডক্টরেট। শ্বেতা ওনাকে নানারকম পরামর্শ দিত। কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ নিতেই আগ্রহী ছিলেন। উনি ছিলেন অবিবাহিত এবং থাকতেন ভাইয়েদের সাথে একান্নবর্তী পরিবারে। একবার আমি ওনাকে একটি চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি মাপের তামার পাত বালিশের নীচে পেতে শোয়ার পরামর্শ দিলাম কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়াই। দিন পনের তিনি খুব ভাল ছিলেন। কিন্তু আবার তাঁর ফোন আসা শুরু হল। এর পর, ওনাকে আমার উপস্থিতিতে মানকুণ্ডুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসতে বললাম এমন একটা দিনে যেদিন বি টেক ক্লাসের মাইক্রোয়েভ প্র্যকটিক্যাল ক্লাস আছে। উনি কলকাতা থেকে নিজস্ব গাড়ীতে ড্রাইভারকে সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে এলেন। ওনাকে নিয়ে আমি মাইক্রোয়েভ ল্যাবে গেলাম। কলেজের শিক্ষক জয়ন্ত (ঘোষ) ছিল ল্যাব ইনচার্জ। জয়ন্তকে সমস্ত ব্যাপারটা আগের থেকে জানানো ছিল। ছেলেরা যেখানে মাইক্রোয়েভ বেঞ্চে এক্সপেরিমেন্ট করছিল সেখানে জয়ন্ত ওনাকে নিয়ে বসালেন। জয়ন্তর বসার টেবিলের পাসে আমি আর জয়ন্ত প্রায় আধা ঘণ্টা বসে রইলাম আর উনি ভাবলেন যে উনি নিজেকে মাইক্রোয়েভ রেডিয়েশনে এক্সপোস করলেন। আমি বোধহয় একটা মহত্ত্বপূর্ণ সাইকোলজির এক্সপেরিমেন্ট করলাম। আমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হল। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি এখন কলকাতার একটি বৃদ্ধাশ্রমে থাকেন এবং তাঁর সাথে আমার

ফোনে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন আছে।

এই সব মুহূর্তগুলো মনের ভিতর উঁকি দিয়ে এসে অপ্রাসঙ্গিক করে দিচ্ছেনা তো খড়গপুর আই আই টি-তে এন বি স্যারের কথা লিখতে গিয়ে? তাই আবার ফিরে আসা যাক স্যারের প্রসঙ্গে। যখন আর আই টি, জামশেদপুরে কাজ করতাম তখন লম্বা ছুটি যেমন গরমের ছুটির সময় জামশেদপুর থেকে খড়গপুরে এসে বেশ কয়েক দিনের জন্য কখন স্যারের বাড়ী, কখন সমীরের বাড়ীতে এসে থাকতাম। সমীরের মা ও ভাই সুবীর জামশেদপুর থেকে মণিকুন্তলা ও আমার আসার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। সুবীর ছেলেবেলা থেকেই হাঁটা চলা করতে পারত না। সবাই, বিশেষ করে সমীরের স্ত্রী সুলেখা, সুবীরকে আগলে আগলে রাখত। সমীরদের বাড়ীর কাজ করতে আসতেন চারুদি যার কথাও মনে পড়ে; তিনি সুবীরের খুব যত্ন নিতেন। স্যারের বি-টাইপ কোয়ার্টারে থাকার সময়, স্কুল থেকে ফিরে এসে স্যারের ছোট মেয়ে পম্পা ওর ক্লাস শুরু করত ওর একমাত্র ছাত্র আমাকে নিয়ে। 'টিচার' পম্পার লেখায় ব্ল্যাকবোর্ড অর্থাৎ রান্নাঘরের দরজা ভরে যেত। হেডমিস্ট্রেস পম্পার মা অর্থাৎ আমাদের ঝর্না বৌদির নির্দেশে ছুটির ঘণ্টা বাজত। টিচার চান করতে চলে যেতেন। আমি ক্লাস থেকে ছুটি পেতাম।

অনেক দিন আগেকার কথা, আমার একটা পেপার একটি জার্নালে ছাপানোতে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম। এন বি সি স্যার পেপারটির একমাত্র সহ-লেখক (কো-অথর)। একবার জামশেদপুর থেকে খড়গপুরে গিয়ে স্যারকে পেপারটা দেখাতে চাইলাম। স্যারকে ডিপার্টমেন্টে ধারে কাছে দেখতে না পেয়ে ডিপার্টমেন্টের তদানীন্তন হেড প্রফেসার সান্যালকে তাঁর চেম্বারে গিয়ে পেপারটা দেখালাম। তিনি পেপারটার ফ্রন্ট পেজটা দেখে দ্রুত গতিতে পেপারের পৃষ্টাগুলো উল্টিয়ে পেপারটা প্রায় না পড়েই আমার সাথে শেকহ্যান্ড করে বললেন, "কনগ্র্যাচুলেশ, মাই বয়! কিপ ইট আপ!" এন বি সি স্যারের সাথে দেখা হল স্যারের বাড়ীতে লাঞ্চের সময়। খড়গপুরের প্রচণ্ড গরম। স্যার পাখা বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ ভাত নাকি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ডাইনিং টেবিলে বসে স্যার আমার পেপারটা পড়তে লাগলেন। লাঞ্চের সময় পেপারটা স্যারকে দিয়েছি বলে বৌদি আমাকে বকুনি দিয়ে খাওয়া শুরু করতে বললেন। স্যার অনেকক্ষণ ধরে পেপারটা পড়লেন। তারপর পেপারটা টিপ করে একটা সোফার উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "পেপার লেখাটা তো

দিব্যি আয়ত্ত করেছো, কিন্তু রিসার্চ কি কিছু করছো"? বৌদি স্যারকে বকুনি দিল, "বদ্যি কি রিসার্চের বিনা ভিত্তিতেই পেপারটা লিখেছে"? স্যার বৌদিকে বললেন, "যার বোঝার সে ঠিকই বুঝেছে।"

স্যার একবার জাপানে কনফারেন্সে যাওয়ার আগে কলকাতায় সপরিবারে স্যারের বোনের মানিকতলার বাড়ীতে উঠেছিলেন। আমিও সে সময়ে কলকাতায় ছিলাম। স্যারের লাঞ্চের পর দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ধরার কথা। লাঞ্চের পর 'এখুনি আসছি' বলে স্যার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বৌদি আমাকে বললেন, 'বদ্দি, স্যারকে না জানিয়ে তোমার স্যারকে ফলো করতো। খুব দেরী করলে, যদিও তোমার স্যারকে ফলো করার জন্য স্যারের বকুনি খাবে, স্যারকে প্লেন ধরার কথা মনে করিয়ে দেবে।' আমি দেখলাম স্যার শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে সুভাষ বসুর স্ট্যাচুর সামনে কিছুক্ষণ থাকলেন। স্যার এরপর বাড়ী ফিরে এসে অবশ্যই বৌদির বকুনি খেলেন।

স্যারের গাইডেন্সে আমি যখন আমার পি এইচ ডি করি, তখন ওনার ডক্টরেট ডিগ্রী ছিল না। তখন অনেক বিখ্যাত প্রফেসারদের ডক্টরেট ডিগ্রী ছিল না। যেমন, প্রফেসার সান্যালের ও ছিল না। ডক্টরেট ডিগ্রী না থাকাতে অনেককে অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রফেসার এস এন বোস-কেও এরকম অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। একটা উদাহরণ 'মনের জানালায় উঁকি দিয়ে যায়'। ডক্টরেট ডিগ্রী না থাকাটা বি এইচ ইউ-তে অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের স্বনামধন্য প্রফেসার প্রসাদ রঞ্জন খাস্তগীরের রীডার থেকে প্রফেসারের পদে উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসার সি এস ঝা-র মধ্যস্থতায় সেই বাধা দূর হয়। প্রফেসার ঝা বি এইচ ইউ থেকে আই আই টি দিল্লী-তে ফিরে যাওয়ার পর দিল্লীতে একটা ইউ জি সি কমিটির মীটিং-এ প্রফেসার খাস্তগীরের কথা গল্পচ্ছলে বলেছিলেন। প্রফেসার ঝা ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান। আমাকে দেখে প্রফেসার ঝা জিজ্ঞাসা করলেন, "বসু কেমন আছ? বি এইচ ইউ ঠিকঠাক চলছে তো? আর প্রফেসার খাস্তগীর কেমন আছেন"? তিনি বললেন যে বি এইচ ইউ-তে সিলেকশন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে খাস্তগীর স্যারের প্রফেসার পদের জন্য ইন্টার্ভিউ তাঁর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। খাস্তগীর স্যারের ইন্টার্ভিউ প্রায় আধা ঘণ্টা চলার পর প্রফেসার সি এস ঝা-র মনে হল যে সিলেকশন বোর্ড একটা ক্লাস এবং সেই ক্লাসের মাষ্টারমশায় হলেন

প্রফেসার খাস্তগীর, আর সিলেকশন বোর্ড অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা সব মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে খাস্তগীর স্যারের লেকচার শুনছেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে খাস্তগীর স্যার ক্লাস পিরিয়েড শেষের ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে বাস্তবে ফিরিয়ে এনে মনে করিয়ে দিলেন যে বাইরে অন্যান্য ক্যান্ডিডেট অপেক্ষা করছেন।

এন বি সি স্যার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস সি ডিগ্রী পান। বর্ধমান থেকে খড়গপুরে এসে স্যারের ডি এস সি থিসিসের হাতে লেখা ড্রাফটের চ্যাপটার একটা একটা করে বৈদ্যনাথদা (বিশ্বাস) বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে একজন দক্ষ টাইপিস্টকে দিয়ে টাইপ করাতেন। এক রবিবার নিয়ে গিয়ে পরের রবিবার স্যারের কাছে টাইপ করা চ্যাপটার খড়গপুরে নিয়ে আসতেন। কোনও পৃষ্ঠায় ভুল থাকলে বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে আবার সংশোধন করে আনতে হ'ত। স্যারের থিসিস কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত যা বৈদ্যনাথদা (বিশ্বাস), অপূর্বদা (দত্ত) ও অচিন্ত্যদা (মুখার্জী)-দের রিসার্চ ইন্টারেস্টের ছিল। আমার রিসার্চ ইন্টারেস্টের বিষয় অন্য ছিল–মাইক্রোওয়েভ ট্যুব। আমার পক্ষে স্যারের থিসিসের টেক্সট বোঝা অসম্ভব ছিল। তা সত্ত্বেও স্যারের সংশোধিত চ্যাপটার স্যারের নির্দেশে আমাকে সংশোধন করতে দেওয়া হ'ত। এই কাজটা করতে আমি জামশেদপুর থেকে স্যারের বাড়ী খড়গপুরে আসতাম। দাদারা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে দেখে আমার নিজেকে একজন 'ইম্পরট্যান্ট' ভেবে আনন্দ হ'ত। অপূর্বদা ও অচিন্ত্যদা আমাকে দেখে বলত, "এই যে কমা, ফুলস্টপ এসে গেছে।" আমি একটা ঘরে স্যারের থিসিস চ্যাপটার চেক করতাম আর দাদারা স্যারকে লুকিয়ে ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিত যে সংশোধন করলে আমি ওদের হাতে পিট্টি (মার) খাব। মনে আছে, অপূর্বদা নিজের পি এইচ ডি থিসিস লেখার ব্যাপারে বেশ কেয়ারলেস ছিলেন। থিসিসের টেক্সটে হয়ত লিখেছেন অমুক ফিগারে কোনো একটা রেজাল্ট দেওয়া আছে, অথচ দেখা গেল থিসিসে সেই ফিগারটাই নেই। স্যারের নির্দেশে অপূর্বদার থিসিস চেক করার সময় আমাকে এই সব খেয়াল রাখতে হ'ত। স্যার আমার 'টেকনিক্যাল রাইটিং'-এর প্রশংসা করতেন। কিন্তু এই নামের আমার লেখা একটা বই প্রেন্টিস হল অফ ইন্ডিয়া যখন প্রকাশিত করল তখন স্যারের চিন্তা হল আমি আমার রিসার্চ ছেড়ে এই ধরণের বই ছাপার দিকেই শুধু মন দিচ্ছি না তো। স্যার তাঁর শঙ্কা জানিয়ে আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন রিসার্চ ছেড়ে দিয়ে 'কি

করে ঘুড়ি ওড়াতে হয়' এই বিষয়ে বই না লিখি। তবে সুহাসদা (দত্ত রায়) (দিল্লী আই আই টি-র প্রফেসার) আমার 'টেকনিক্যাল রাইটিং' বইটির মুখপত্র লিখে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেপরোয়া ভাবে পি এইচ ডি থিসিস জমা দেওয়ার একটি বেনজির উদাহরণ লিপিবদ্ধ করার লোভ সামলাতে পারছিনা। ঘটনাস্থল হল বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আমাদের ডিপার্টমেন্ট। আমার এক সিনিয়ার প্রফেসারের টেবিলে তাঁর এক ছাত্রের থিসিসের ড্রাফট পড়তে গিয়ে আমি চমকে গেলাম। ছাত্রটির অনুপস্থিতিতে থিসিসটি টাইপ করা ও বাইন্ড করার দায়িত্ব যে টাইপিস্টের কাছে দেওয়া হয়েছিল তিনি থিসিসের তাঁরই টাইপ করা একটি সঠিক চ্যাপ্টারের বদলে তাঁরই টাইপ করা অন্য থিসিসের একটি চ্যাপ্টার বসিয়ে দিয়েছিলেন। এযে মারাত্মক ভুল।

আবার স্যারের ডি এস সি থিসিসের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। জামশেদপুর থেকে ইনব্যাফেলে গেলে অপূর্বদা আমাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতেন থিসিস পরীক্ষার রিপোর্ট এসেছে কিনা জানতে। এর আগে অপূর্বদা চেষ্টা করেও রিপোর্ট দেখতে পায়নি। রিপোর্টটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস অপূর্বদাকে না দেখালেও সৌভাগ্যক্রমে একবার আমাকে দেখিয়েছিল। একজন পরীক্ষক থিসিসের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তবে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে থিসিসের একটি চ্যাপটার তাঁর অনুধাবনের বাইরে ছিল। পরে স্যারের কাছে শুনেছিলাম যে তিনজন পরীক্ষকের একজন ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসার এম শোয়ার্টজ।

স্যারের থিসিসের কথা লিখতে লিখতে আমার নিজের পি এইচ ডি ভাইভা-ভোসি (মৌখিক) পরীক্ষার কথা মনে পড়ে গেল। যদিও আমার পি এইচ ডি থিসিসের কাজ বেশীর ভাগই এন বি সি স্যারের কাছে আই আই টি খড়গপুরে হয়েছিল, স্যারের নির্দেশে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার থিসিস জমা দিই। যদ্দূর মনে পড়ে, তখন আই আই টি'র বি টেক-কে আর ইউনিভার্সিটির পি এইচ ডি-কে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হ'ত। আমার পি এইচ ডি ভাইভা-ভোসির পরীক্ষক ছিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং (বি ই) কলেজ, শিবপুরের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকম্যুনিকেশন ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার এস. এস. বড়াল। প্রফেসার বড়াল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস সি ছিলেন এবং ইনব্যাফেলে প্রফেসার শিশির কুমার মিত্রের ল্যাবে

আয়নোস্ফিয়ার ও অ্যাপেলটন লেয়ারের বিষয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি প্রফেসার মিত্রের কিংবদন্তি বই 'দি আপার এটমোস্ফিয়ার' এডিট করেছিলেন। প্রফেসার বড়াল কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি এস সি ফিজিক্স অনার্স করেছিলেন। উল্লেখ্য, নৃপেনদা (পুরকাইত), ভোলানাথ, সুহাসদা (দত্ত রায়) এবং আমিও প্রফেসার বড়ালের মতন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি এস সি ফিজিক্স অনার্স করেছিলাম।

পি এইচ ডি ভাইভা-ভোসির দিন জামশেদপুর থেকে হাওড়া রেলস্টেশনে এসে সেখান থেকে প্রফেসার বড়ালকে ফোন করে জানতে চাইলাম যে ভাইভা-ভোসির জন্য আমি তাঁর কাছে কখন যেতে পারি। তিনি তখনই তাঁর কলেজের কোয়ার্টারে এসে সেখানেই লাঞ্চ করতে বললেন। তাঁর কোয়ার্টারে এসে জানতে পারলাম যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং ঘুম থেকে উঠে আমাকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টে যাবেন এবং সেখানেই আমার ভাইভা-ভোসি হবে। সেই দিনে ছিল ডিপার্টমেন্টের টিচার্স মীটিং (শিক্ষক সভা)। সভাস্থলে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমার থিসিসটা সবার মাঝে সারক্যুলেট করে বললেন ক্যান্ডিডেট নির্মলের ছাত্র তাই কাজটা ভাল হবেই। নিতান্ত মজার ছলে তিনি বললেন থিসিসটা তিনি দন্তস্ফুট করতে পারেননি কারণ বর্ণিত কাজটা দুরূহ অ্যানালেটিক্যাল ডিডাকশনে ভরা। তিনি উপস্থিত সবাইকে সাবধান করে দিলেন তাঁরা যেন না বুঝে অসংলগ্ন প্রশ্ন না করেন। তারপর তিনি সবাইকে স্কুল লেভেলের একটা প্রশ্ন করলেন এবং তার উত্তর ব্ল্যাকবোর্ডে অ্যানালেটিক্যাল ডিডাকশনসহ দিতে বললেন। সবাই ইতস্তত করাতে তিনি আমাকে চক-পেন্সিলের সাথে ব্ল্যাকবোর্ডে পাঠিয়ে কৌতুক করে বললেন যে আমি যদি ডিডাকশনসহ সঠিক উত্তর দিতে পারি তবে তিনি সহ সমবেত শিক্ষকবৃন্দ আমাকে 'মিস্টার' বৈদ্যনাথ বসু না ডেকে 'ডক্টর' বৈদ্যনাথ বসু ডেকে মিষ্টি খাওয়াবেন। অ্যানালেটিক্যাল ডিডাকশনসহ সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে আমি ভাইভা-ভোসির প্রথম ধাপ পার করলাম। প্রশ্নটা ছিল টইটুম্বুর জলে ভরা গ্লাসে ভাসমান একটি বরফের খণ্ড গলে (মেল্ট করে) গেলে জল গ্লাস উপচিয়ে গ্লাসের বাইরে পড়ে যাবে কিনা। ভাইভা-ভোসির দ্বিতীয় ধাপে থিসিসের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রফেসার বড়ালের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছিলাম।

খড়গপুর আই আই টি-তে আমার রিসার্চ গাইড এন বি সি স্যার

আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার এইচ এন বোসের মন্ত্রমুগ্ধ করা ক্লাস করতে পাঠাতেন। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে প্রফেসার গগন বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি-র অথরিটি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মভোলা প্রকৃতির। ভোলামন প্রফেসার গগন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক মজার গল্প শোনা যেত। আমি নিজেই একদিন দেখলাম তিনি লাইব্রেরীর বই ইস্যু করার কাউন্টারে পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদি কিনতে চাইলেন। সেই সময়ে (১৯৬৮ সালের কথা) আই আই টি বিল্ডিং-এর ভিতর লাইব্রেরীকে বাঁদিকে রেখে একটা করিডর দিয়ে বিল্ডিং-এর বাইরে গিয়ে পোস্টঅফিসে যেতে হ'ত। লাইব্রেরী কাউন্টারের কোন একজন ওনাকে যত্ন করে বসিয়ে পোস্টঅফিস থেকে পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদি কিনে ওনাকে দিলেন। শোনা কথা, একবার রিকশা করে খড়গপুর রেল স্টেশন থেকে এসে প্রফেসার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেন তাঁর কোয়ার্টার তালা বন্ধ। খোলা জানালা দিয়ে তিনি দেখলেন ভেতরে কেউ নেই এবং আসবাবপত্র সব উধাও। অতএব তিনি ডিপার্টমেন্টে চলে এলেন। ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁকে তার সঠিক কোয়ার্টারে পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। পরে রহস্য উদ্ঘাটিত হল। তিনি যে সম্প্রতি কোয়ার্টার পালটেছেন তা ভুলে গিয়ে তাঁর আগের খালি কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন। লোকের মুখে শোণা ওনার আরেকটি ঘটনা—একবার ইন্সটিট্যুট থেকে ফিরে নিজের কোয়ার্টারে না গিয়ে পাশের কোয়ার্টারের বসার ঘরে গিয়ে 'কই চা দাও' বলে হাঁক পারলেন। ধরা পড়ে গিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করার চেষ্টায় বললেন—তোমাদের বাড়ী অনেক দিন আসিনি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার ভোলামন প্রফেসার গগন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ স্মৃতি শক্তির কথা বলি। একবার আমি কলকাতা থেকে ষ্টীল এক্সপ্রেসে জামশেদপুরে যাচ্ছিলাম। আমার ছোড়দা (জয়ন্তদা) হাওড়া রেল স্টেশনে আমাকে সি অফ করতে এসেছিল। জয়ন্তদা আমার পাশের জায়গায় বসেছিলেন। হটাৎ দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে প্রফেসার গগন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কম্পার্টমেন্টে উঠে কোন সিটে না বসে প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকলেন। জয়ন্তদাকে প্রফেসার গগন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় জানালাম। জয়ন্তদা হকারের কাছ থেকে আমাদের জন্য কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল কিনলেন। আমি ওনাকে ওনার বোতলটি এগিয়ে

দেওয়াতে তিনি খুশি হলেন। খেতে খেতে হটাৎ খাওয়া বন্ধ করে বললেন—একি আমি খাচ্ছি কেন? তোমরা কে? ইতিমধ্যে কম্পার্টমেন্ট লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। জয়ন্তদা নেমে গেল। জয়ন্তদার ছেড়ে যাওয়া সিটে স্যারকে বসালাম। স্যারকে বললাম—আপনি আমাকে চিনবেননা কিন্ত আমি আপনাকে চিনি কারণ আমি খড়গপুর আই আই টি-তে এন বি সি স্যারের কাছে আমার ডক্টরাল রিসার্চ করতাম। আমি ওনাকে আমার নাম বললাম। তিনি বললেন—তুমিই বৈদ্যনাথ বসু, নির্মলের ছাত্র? তিনি একটা জার্নালের নাম বলে বললেন—তুমি এই জার্নালটা লাইব্রেরী থেকে ইস্যু করেছিলে। আমার অনুরোধে লাইব্রেরী থেকে নির্মলের মাধ্যমে তুমি জার্নালটা লাইব্রেরীতে ফেরত দেওয়াতে আমার অনেক উপকার হয়েছিল। তিনি জার্নালের নাম, ভল্যুম নাম্বার, ইস্যু নাম্বার ইত্যাদি মনে করে করে আমাকে বলেছিলেন। 'ভোলামন' নামে পরিচিত প্রফেসার গগন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ স্মৃতি শক্তির জোরে আমাকে মনে রেখে তিনি আমাকে স্তম্ভিত করে দিলেন।

খড়গপুরে মশার উৎপাত বরাবরই ছিল। মনে আছে আই আই টি খড়গপুরে বি টেক-এ সিলেক্ট হওয়ার চিঠিতে আমাকে একটি মশারি নিয়ে আই আই টি খড়গপুরে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল। এর অনেক বছর পর জামশেদপুর থেকে এন বি সি স্যার আয়োজিত আই আই টি খড়গপুরে একটা শর্ট-টার্ম কোর্স অ্যাটেন্ড করতে এসে সেই মশারির অভাবে মশার কামড়ে রাতে ঘুমুতে পারলাম না। ঠিক হল দিলীপদার (ভট্টাচার্য) বাড়ী থেকে একটা মশারি নিয়ে আসব। দিলীপদা ততদিনে প্রেমবাজার থেকে আই আই টি-র কোয়ার্টারে চলে এসেছিলেন। সন্ধ্যের সময় দিলীপদার বাড়ী গিয়েছিলাম মশারি আনতে। দিলীপদার ছেলে বাবাই তো আমাকে ছাড়তেই চায়না। ইন্দিরা বৌদি আমাকে ডিনারের আগে ছাড়লেন না। তবে খাওয়া দাওয়া করতে যে কাজের জন্য আমি দিলীপদার বাড়ী এসেছিলাম তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। ডিনারের পর অত রাতে বাবাই-এর চোখে ঘুম নেমে এসেছে। আমাকে 'সি অফ' করতে দিলীপদা আর বাবাইকে কোলে নিয়ে ইন্দিরা বৌদি যখন বাড়ীর দোরগোড়ায়, তখন আমি যে কাজের জন্য এসেছিলাম সেটা মনে করাতে ঘুম চোখে বাবাই আমাকে বলল—মশারিটা তো নিলে না।

# অতিথিকে আপ্যায়ন করবেন না?

আমি যখন আই আই টি খড়গপুরে ছিলাম মণিকুন্তলা একবার ওর দাদা তরুণ, আর বোন ছুটুর (শকুন্তলা) সাথে বি সি রায় হলে এসেছিল। এম টেক করার পর তরুণ দুর্গাপুরে চলে গেল ষ্টীল ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়ে। মণিকুন্তলার বাবা যিনি ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কাজ করতেন গৌহাটিতে কিছুদিনের জন্য ট্র্যাসফার হয়ে যান। সেই সময়ে একবার খুব শরীর খারাপ হওয়াতে মণিকুন্তলাকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হল অমলদার (সামন্ত) সহায়তায়—যে অমলদা আর জি করে ডাক্তারি পড়তেন এবং যার কথা আমি আগে লিখেছি। ঠিক হয়েছিল অ্যাপেনডেক্টমমি বা সার্জারি করে মণিকুন্তলার অ্যাপেন্ডিক্স বাদ দেওয়া। কিন্তু হাসপাতালে একটা সংক্রমন ছড়িয়ে যাওয়াতে সার্জারি না করেই মণিকুন্তলাকে হাসপাতাল থেকে ওদের ভাড়াবাড়ী ৬, বিন্দু পালিত লেনে (গিরীশ পার্কের কাছে) নিয়ে আসা হল। ওদের বাড়ীতে মণিকুন্তলা আমাকে দৈর্ঘ্য মাপার একটা এক ফুটের কাঠের স্কেল দেখাল যেখানে আমার হাতের লেখায় আমার নাম লেখা ছিল 'বৈদ্যনাথ বসু রায় চৌধুরী'। কি করে মণিকুন্তলাদের বিন্দু পালিত লেনের বাড়ীতে স্কুলে ব্যবহার করা আমার স্কেলটা পৌঁছে গিয়েছিল তা জানা গেল না।

যে সময়ের কথা বলছি তখন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাল চিকিৎসা করার জন্য সবাই কলকাতায় আসত। কিন্তু মণিকুন্তলার ক্ষেত্রে ঠিক হল ওকে কলকাতা থেকে জামশেদপুরে টেল্কোর বিখ্যাত ডাক্তার এ কে দত্ত-কে দেখাতে হবে। 'কোন এক বৃষ্টিমধুর দিনে রিকশার পর্দা নামানো নিভৃত ঘেরাটোপে আমার আর মণিকুন্তলার প্রথম পরশ'-কে আমার মা ধরে রাখলেন মণিকুন্তলার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে মণিকুন্তলাকে জামশেদপুরে নিয়ে গিয়ে। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে আমি সব চেয়ে ছোট—কিন্তু মায়ের নির্দেশে সবার আগে আমার বিয়ে হল। আমরা কায়স্থ আর মণিকুন্তলার বাবা ভট্যাচার্য্যি ব্রাহ্মন। জয়ন্তদা (ছোড়দা) প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঝামেলা হলে লড়ে

যাবেন বলে। কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন, কারণ মণিকুন্তলার মা-ও কায়স্থ ছিলেন।

আমার দাদা (বড়দা) তখন টেল্কোতে কাজ করতেন। বিয়ের পর মণিকুন্তলাকে নিয়ে টেল্কোর ডাক্তার এ কে দত্ত-র কাছে নিয়ে যেতে দাদার কোন অসুবিধা হল না। ডাক্তার দত্ত, টেল্কোর ড্যুটি আওয়ার্সের পর, তার নীলডি কলোনির কোয়ার্টারে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। ডাক্তার দত্ত আর জি কর হাসপাতালের ওষুধপত্র বাতিল করে দিয়ে নতুন ভাবে মণিকুন্তলার একটা দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। উত্তরোত্তর মণিকুন্তলার স্বাস্থ্য ভাল হতে থাকল।

আমার বিয়ের দুদিন আগে মণিকুন্তলার ভাই তরুণের বৌভাত হল ওদের বিন্দু পালিত লেনের বাড়ীতে। আমার বিয়েও সেই বাড়ীতে হল। দমদমে আরতিপিসীর বাড়ী থেকে জয়ন্তদা আমাকে এবং আমাদের জনাকয়েক বরযাত্রীদের নিয়ে বিবাহ স্থলে গেলেন। আমার বিয়ের সময় আমি খড়গপুর আই আই টি-তে রিসার্চ স্কলার ছিলাম। সেখান থেকে আমার বন্ধু মাইকেল আর কলকাতা থেকে আমার ইনব্যাফেলের ক্লাসমেটরা এসেছিল আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে। আমার বৌভাতের অনুষ্ঠান আমাদের সাকচীর ১১৭, সঞ্জয় রোডের ভাড়াবাড়ীতে আমাদের যৌথ পরিবারে আয়োজিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আমরা—কলকাতার আত্মীয়স্বজনরা—মণিকুন্তলাকে নিয়ে কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে হৈ হৈ করে জামশেদপুরের টাটানগরের স্টেশনের জন্য সকাল বেলায় রওয়ানা হলাম।

বৌভাতের দিন আমার স্কুলের ক্লাসমেট ভানু (রঞ্জিত মুখার্জী), যে সঞ্জয় রোডের পাশের আমবাগান রোডে থাকত, আমার সাথে দেখা করে উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বি এস সি-র রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে কি না। এর কারণ, ভানুর বৌ নীলা বি এস সি পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছে এবং ভানু জানতে পেরেছিল যে মণিকুন্তলাও বি এস সি পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য অপেক্ষারত। এই ঘটনায় ভানুর সাথে আবার নতুন করে যোগসূত্র স্থাপিত হল। ইতিমধ্যে আমার স্কুলের ক্লাসমেট শম্ভু ওদের যৌথ পরিবারকে নিয়ে সঞ্জয় রোডে একটা ভাড়াবাড়ীতে আমার

প্রতিবেশী হয়ে চলে এল। বৌভাতের পরের দিন মধুচন্দ্রিমা মুলতুবি রেখে খড়গপুরে আই আই টি-তে ফিরে যাই। অনেকদিন পর সীমিত টাকা-পয়সা হাতে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে দীঘা গিয়েছিলাম। ওখানে পৌঁছে অ্যাকোমোডেশনের জন্য এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে ঘুরতে-ঘুরতে একটি হোটেলের সামনে একটি ভ্রমণার্থী যুব-দলের সাথে হোটেল-মালিকের বাক-বিতণ্ডা কানে এল। হোটেলে একটি খালি রুম দেখে হৈ-হৈ করে দলটি সেই রুমে ঢুকে যেতে চাইছে আর হোটেল-মালিক তাদের বাধা দিয়ে বলছেন যে এই রুমটি আগে থেকে এক দম্পতির জন্য রিজার্ভ করা আছে। এই সুযোগ হাতছাড়া না করে—আমরা এসে গেছি—বলে আমি আর মণিকুন্তলা রুমটিতে ঢুকে পড়লাম। দলটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হোটেল পরিত্যাগ করল। বলা-বাহুল্য, কেউই আগে থেকে রুমটি রিজার্ভ করেনি। যুব-দলটি থেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেল-মালিক রুমটির অ্যাকোমোডেশন আমাদের দিয়ে দিলেন। সীমাহীন সমুদ্রের সৌন্দর্যে আমরা হারিয়ে গেলাম।

সমুদ্র সৈকতে পূর্ণ দাস বাউলকে দেখার সৌভাগ্য হল। ঝাউ-বনে একটি শিশু আমাদের কাছে দুটো দুই নয়া—নয়া অর্থাৎ নয়া পয়সা—চাইল। ওকে একটি পাঁচ নয়া পয়সা দিলাম। পাঁচ নয়াটি ফিরিয়ে দিয়ে ও দুটো দুই নয়াই চাইল। ও যে পড়তে জানে না আর হিসেব জানে শুধু মুদ্রাকে পাথরের টুকরো জ্ঞানে এক-দুই-তিন করে গুনতে। এদিকে আমরা হিসেব করলাম এক বেলা খেয়ে, প্রতিদিনের হোটেল-রুম-চার্জ এবং জামশেরপুরে ফিরে যাওয়ার বাস-ভাড়া ও ট্রেন-ভাড়া মাথায় রেখে আর কত দিন দীঘায় থাকা যায়।

১১৭, সঞ্জয় রোডের যার বাড়ীতে আমরা ভাড়াটে ছিলাম তিনি (শ্রী রাম মুখার্জি) তখন তাঁর ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেই বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর এক ছেলে অমরনাথ আমার স্কুলের ক্লাসমেট ছিল। পরে আমার দাদার সাথে মুখার্জি বাবুর ছোট মেয়ে পলি'র বিয়ে হয়। খড়গপুর থেকে জামশেদপুরে এলে তাঁর নাতি পিকলু (মেজ ছেলের ছেলে)—তখন পাঁচ-ছ বছরের—আমাকে অনেক হিন্দী গান শোনাত। একবার জামশেদপুর থেকে খড়গপুরে ফেরার দিনের আগের রাতে পিকলুকে একটা প্রচলিত গান গাইতে বললামঃ

'সবেরেওয়ালী গাড়ীসে চলে জায়েঙ্গে'। পিকলু বলল ওর বাবা ওকে হিন্দী গান গাইতে বারণ করে দিয়েছেন। পিকলু ওর বৈদ্যনাথ কাকুকে খুব ভালবাসত। ভেবে ভেবে পিকলু একটা উপায় বের করল। গানের সুর একই রেখে ও গানের লিরিক হিন্দী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে গাইল 'সকাল বেলার গাড়ীতে চলে যাব'। বুদ্ধিমান পিকলু ওর বাবাকে অমান্য না করেই আমার অনুরোধ রাখল।

খড়গপুর আই আই টি থেকে (যেখানে আমি রিসার্চ স্কলার ছিলাম) মাঝে মাঝে জামশেদপুরে চলে আসতাম। সঞ্জয় রোডের বাড়ীতে জনৈক প্রতিবেশী ভদ্রমহিলার সাথে আমার মা'র আলাপ হল নিম্নবর্ণিত ওনার প্রশ্ন এবং মার উত্তরের মাধ্যমে। মার সাথে মণিকুন্তলার কি সম্পর্ক ছিল তা এই প্রশ্নোত্তর থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

— কিছু মনে করবেন না, আপনার মেয়ের মাথায় সিঁদুর। ওতো বিবাহিত তবে ও ওর শ্বশুরবাড়ী যায় না কেন? আপনার কাছেই থাকে। দেখতে ভারী সুন্দর। বারান্দায় আপনার কোলে শুয়ে থাকে, ওর লম্বা চুল আপনি বেঁধে দেন, ওকে আপনি যত্ন করে খাইয়ে দেন। আপনাদের দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।

— বুঝলাম না, আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। আমার কোন মেয়ের তো বিয়ে হয়নি। ঐ মেয়েটি আপনি যার কথা বলছেন সে আমার ছোট বৌমা, আমার ছোট ছেলের বৌ। ছোট ছেলে খড়গপুরে থাকে এবং আই আই টি-তে ডক্টরাল রিসার্চ করে; মাঝে মাঝে আসে; আপনি হয়ত তাকে দেখেননি।

বাড়ীর সবাই মণিকুন্তলাকে নিয়ে জামশেদপুরে খুব হৈচৈ করে থাকত। আমাদের প্রিয় অ্যালসেসিয়ান 'মন্টি'ও মণিকুন্তলাকে আপন করে নিল। প্রথম প্রথম অবশ্যই মণিকুন্তলা 'গৃহ-কর্মে নিপুণা' ছিল না। একবার খুব যত্ন সহকারে মণিকুন্তলা একটি ব্রাশ দিয়ে আমার শার্টের কলার পরিষ্কার করছিল। আমি মণিকুন্তলাকে বললাম, 'এই ভাবে ব্রাশ করলে শার্টের কলারের ময়লা কলারের মধ্যে ঢুকে যাবে। তুমি কলারের পরিষ্কার দিকটা ব্রাশ কর। তাহলে পেছন দিক থেকে ব্রাশের চাপে কলারের ময়লা বেরিয়ে যাবে।' মণিকুন্তলা খুব বাধ্য ছিল। ও যখন আমার নির্দেশে অন্য রকম ভাবে

শার্টের কলার ব্রাশ করতে থাকল, আমি মাকে ডেকে এনে মণিকুন্তলার শার্টের কলার ব্রাশ করা দেখাতে নিয়ে গেলাম। মা মণিকুন্তলাকে কাছে টেনে নিয়ে আমাকে খুব বকুনি দিল। আরেকবার, মনে পড়ে, ভাতের হাঁড়ির ভেতর থেকে শুখনো মাড়ের তবকগুলো মণিকুন্তলা সরিয়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমি মণিকুন্তলাকে বললাম ওগুলো না ফেলে যত্ন করে তুলে রাখতে যাতে ওগুলো সাবুর পাঁপড়ের মতন ভেজে চায়ের সাথে আমরা খেতে পারি। মণিকুন্তলা আমার কথা মতন ভাতের মাড়ের পাঁপড়গুলো তুলে রাখল। মণিকুন্তলাকে ঠকানোর জন্য আবার মায়ের কাছে বকুনি খেলাম।

মণিকুন্তলা ওদের কলকাতার বাড়ী থেকে ওর হারমোনিয়ামটা নিয়ে এসেছিল। মণিকুন্তলার রবীন্দ্র সংগীত ও পল্লীগীতি আমাদের বাড়ীকে সংগীতময় করে তুলল। মণিকুন্তলার সাথে যোগ দিল আমার ক্লাসমেট অমরনাথের ভাই প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী শঙ্কর (মুখার্জি বাবুর ছোট ছেলে)। আমাদের পাশের বাড়ীর ভাড়াটে ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত সেতার শিল্পী বটুকেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের বাড়ীর বাইরের বারান্দা থেকে তাঁর বাড়ীর জানালা দিয়ে ভেসে আসা তাঁর সেতারের মূর্ছনায় নিজেকে হারিয়ে দেওয়ার।

এই সময় খড়গপুরে আমার পি এইচ ডি রিসার্চ গাইড এন বি সি স্যার স্টাডি লিভ নিয়ে ইংল্যান্ডের লাফবোরো ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলেন। ঠিক করলাম একটা কর্মসংস্থান হ'লে জামশেদপুরে চলে আসব। জামশেদপুরে টেল্কোতে আমাদের ইনব্যাফেলের সিনিয়ার প্রদীপদা (ঘোষ) ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ইনচার্জ ছিলেন। তিনি খবরের কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দিলেন যেখানে সর্বনিম্ন শৈক্ষিক যোগ্যতা ছিল এম টেক আর অভিজ্ঞতা ছিল আমার রিসার্চের বিষয়ে কাজ করার। অর্থাৎ তিনি আমার নিযুক্তির ব্যবস্থা করে রাখলেন। ইতিমধ্যে আরেকটা সুযোগ এল। আমাদের স্কুলের জুনিয়ার অজিত ঘোষ খবর দিল জামশেদপুরের আদিত্যপুরের আর আই টি-র ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে টিচিং পোস্ট খালি আছে। এখন এই ইন্সটিট্যুটের নাম হয়েছে ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজি (এন আই টি)। অজিত ওই কলেজের ম্যাথেমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে লেকচারার ছিল। প্রদীপদা আমাকে টেল্কো থেকে আর আই টি-কে প্রাধান্য দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। প্রদীপদা পড়ানো ভালবাসতেন এবং তাঁর টেল্কোর কোয়ার্টারে ছুটির দিনে

‘এ এম আই ই’-র পড়ুয়াদের পড়াতেন। আমি আর আই টি-র ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার ললিত কিশোরের সাথে তাঁর অফিসে দেখা করলাম। তিনি সাউদাম্পটান ইউনিভার্সিটি থেকে মাইক্রোওয়েভ ফিজিক্সে পি এইচ ডি করেছিলেন। তিনি চাইলেন আমার সহযোগিতায় ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে মাইক্রোওয়েভ বিষয়ে এম টেক কোর্স শুরু করতে। তিনি আমার পি এইচ ডি থিসিসের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে আমার আর একটা আকর্ষণ ছিলেন মদন মোহন মহান্তি স্যার যিনি আমার কলেজ জীবনের প্রথম ক্লাস নিয়ে আমাকে ফিজিক্স পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শুনলাম ওখানে ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টেও টিচিং পোস্ট খালি আছে। তবে আমার প্রয়োজনীয় শৈক্ষিক যোগ্যতা সত্তেও আমি সেই ডিপার্টমেন্ট জয়েন করার চেষ্টা করিনি। আমি আর আই টি-র ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে প্রথমে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে অ্যাসিস্টেন্ট লেকচারার এবং পরে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে লেকচারার হিসেবে কাজ শুরু করলাম। পরে আমি আর আই টি থেকে ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় দশ মাসের জন্য সি এস আই আর-এর পিলানী, রাজস্থানে অবস্থিত ল্যাবরাটরি সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিট্যুট জয়েন করি এবং সেখান থেকে আবার ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার রূপে আর আই টি-তে ফিরে আসি। সাধারণত দেশে সেই সময়ে তিনটি টিচিং পোজিশন থাকত—লেকচারার, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার বা তার সমতুল্য রীডার, এবং প্রফেসার। আমি আমার প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির (বি এইচ ইউ-র) প্রফেসার হয়েছিলাম। তবে সাধারণত আমরা টিচিং পোজিশনের সবাইকে প্রফেসার হিসেবে অভিহিত করে থাকি।

আর আই টি-র ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সব ডিসিপ্লিনের পড়ুয়াদের ফার্স্ট ইয়ারে ফিজিক্স পড়তে হ’ত। শিক্ষকদের একাধিক সেকশনে তাদের ফিজিক্স পড়াতে হ’ত, অবশ্যই সব সেকশনে একই সিলেবাস অনুসরণ করে। একশ নম্বরের থিয়োরি পেপারে চল্লিশ নম্বর থাকত ইন্টার্নাল পরীক্ষায় এবং বাকি ষাট নম্বর থাকত এক্সটার্নাল পরীক্ষায়। একবার আমি যে সেকশনে পড়াতাম সেই সেকশনের পড়ুয়াদের একজন চারটি প্রশ্নের

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে দশে দশ পেয়ে ইন্টার্নাল পরীক্ষায় চল্লিশে চল্লিশ অর্থাৎ ফুল মার্কস পেল, অথচ বাকি সেকশনের কেউ ফুল মার্কস পেল না। টিচার্স মীটিং-এ, ইউনিফর্মিটির খাতিরে, ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার কিশোর আমাকে মার্কস কমাতে বললেন। এছাড়া আরেকটা কথা উঠে এল যে, যদিও ম্যাথেমেটিক্স বিষয়ে ফুল মার্কস দেওয়া যেতে পারে, 'ফিজিক্সে' ফুল মার্কস দেওয়া যায় না। ডিপার্টমেন্ট হেডের প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম না। যে সেকশনে ফুল মার্কস ওঠেনি, সেই সেকশনের একটি পরীক্ষার খাতায়—সবাইকে দেখালাম—যে একজন একটি প্রশ্নের উত্তরে দশে দশ পেয়েছে। এই ভাবে সে বাকি তিনটি প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তরে দশে দশ পেয়ে চল্লিশে চল্লিশ অর্থাৎ ফুল মার্কস পেতে পারত—পরীক্ষার বিষয়টি 'ফিজিক্স' হওয়া সত্ত্বেও। আমার যুক্তি না মানার কারুর উপায় ছিল না। আমি মার্কস কমালাম না।

পরীক্ষার খাতা দেখার প্রসঙ্গে মনে পড়ে একবার একটি ছাত্র ইন্টার্নাল ফিজিক্সের পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের উত্তর লেখার পর বাকি প্রশ্নের উত্তরে আঁকিবুঁকি লিখে সব শেষে একটি মহিলার চিত্র এঁকে অ্যানসার বুক জমা দিল। অ্যানসার বুকটি আমার কাছেই এল। আমি ছাত্রটিকে ডেকে এই সব করার কারণ জিগ্যেস করলাম। ছাত্রটি বলল ও জানত যে অ্যানসার বুক আনন্দ রাও স্যার দেখবেন, যিনি নাকি উত্তর লেখার পৃষ্ঠার সংখ্যা দেখে নম্বর দিয়ে থাকেন। ছাত্রটিকে আমি শ্রী রাও-এর মতন নমস্য শিক্ষক সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করার জন্য ভর্ৎসনা করলাম। পরে শ্রী রাও ছুটি নিয়ে আই আই এস সি, ব্যাঙ্গালোর থেকে থেকে পি এইচ ডি করেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল খাতা দেখার আরেকটি মজার ঘটনা যা মণিকুন্তলার মা—যিনি কলকাতায় একটি স্কুলে পড়াতেন—আমাকে শুনিয়েছিলেন। তাঁর স্কুলে, ভূগোল পরীক্ষার খাতায় একটি ছাত্রী লিখেছিল—ঘড়ির কাটা বন বন করিয়া ঘোরে; ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কহে।

জামশেদপুরে আর আই টি-তে থাকাকালীন আমার রিসার্চ, যা আমি খড়গপুর আই আই টি-তে শুরু করেছিলাম, তা অব্যাহত ছিল। বিষ্টুপুর মেইন রোডের একটি প্রেস থেকে সাদা কাগজের শিট কিনে আমার ডিপার্টমেন্টের বসার টেবিলে বিছিয়ে তার উপর আমি লম্বা লম্বা ম্যাথেমেটিকাল এক্সপ্রেশন ডিরাইভ করতাম, যা বাজার থেকে কেনা দিস্তা

কাগজের শিটে করতে গেলে জায়গায় ধ'রতনা। সহকর্মী লেকচারার শ্রী রমা কান্ত চৌধুরী প্রেস থেকে আনা কাগজ বিছানো টেবিলে বসে আমাকে পরামর্শ দিতেন—ইয়হ সব বানন্ডালবাজি ছোড়ো। ইসসে জ্যাদা সে জ্যাদা তুমহারা রিসার্চ পেপার বনেগা, আউর হো সকতা হৈ, ইয়হ তুমহারা পি এইচ ডি থিসিস লিখনে মে কাম আয়ে, আউর উসকে চলতে তুম লেকচারার সে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার ভী বন যাও। ইসসে তুমহারা কিতনা তনখ্বাহ বঢ়েগা? উসসে আচ্ছা হোগা, ইয়দি উসকে বদলে, জৈসে কি মৈনে কিয়া, তুম কই ভৈঁসে রখ লো। দুধ বেচ কর তুমহে জিতনা পৈসা মিলেগা ওয়হ প্রফেসার কা তনখ্বাহ সে জ্যাদা হোগা। তবে এটা ছিল তাঁর নেহাত মজা করে বলা। সত্যি তিনি দুধ বিক্রি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করতেন। তিনি অনায়াসে দেড় ঘরের বা আড়াই ঘরের নামতা বলতে পারতেন। পরে তিনি ছুটি নিয়ে খড়গপুর আই আই টি থেকে পি এইচ ডি করেন।

একটা মজার ঘটনা শেয়ার করার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। সহকর্মী লেকচারার শ্রী আনন্দ রাও অন্ধ্রপ্রদেশে থাকাকালীন হিন্দি ভাষার যোগ্যতার একটি প্রমানপত্র পাওয়ার কথা সবাইকে বলে গর্ব অনুভব করতেন। তিনি বা আমি কেউই হিন্দিভাষী নই। তিনি দাবি করতেন যে তিনি আমার চেয়ে ভাল হিন্দি জানেন। তিনি একবার জামশেদপুরের বাইরে একটি কলেজে এক্সটার্নাল পরীক্ষক হওয়ার আহ্বান পেলেন। জায়গাটি রেলগাড়িতে সোজা যাওয়া যায়। কিন্তু আমি ওঁকে রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে 'জহন্নুম' রেল স্টেশনের আগাম টিকিট কাটতে বললাম। জহন্নুম শব্দটির অর্থ যে নরক তা যারা হিন্দি বা উর্দু জানেন তাদের জানার কথা। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে শ্রী রাও শব্দটির অর্থ জানতেন না। টিকিট কাউন্টারে জহন্নুম রেল স্টেশনের টিকিট চেয়ে শ্রী রাও কি বিপাকে পড়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। টিকিট কাউন্টার থেকে ফিরে এসে শ্রী রাও আমাকে কিছু না বলে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। এরপর থেকে নিজেকে হিন্দি ভাষায় আমার চেয়ে বেশী পারদর্শী ভাবা বন্ধ করলেন। পরে শ্রী রাও ছুটি নিয়ে আই আই এস সি, ব্যাঙ্গালোর থেকে পি ইচ ডি করেন। ১৯৭৬ সালে আমাদের গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি আমার মায়ের সাথে যখন কুণ্ডু স্পেশাল ট্যুরিস্ট গ্রুপের সাথে দক্ষিন ভারত ভ্রমণে যাই, তখন আমি আই আই এস সি, ব্যাঙ্গালোরে তাঁর সাথে দেখা করি। তিনি

আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। লক্ষ্য করলাম তাঁর বাড়ীর ঘরের সিলিঙে পাখা লাগাবার হুক নেই। ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়ায় তখন পাখা চালাবার প্রয়োজন হ'ত না। এখন ব্যাঙ্গালোরে সে কথা ভাবা যায় না। ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার আগে কুণ্ডু স্পেশাল গ্রুপের সাথে আমরা মহীশূরে গিয়েছিলাম। সেখানে দুর্গাপুজার দশহরা মিছিলের ভিড়ে আমার মানিব্যাগটি পকেটমার হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরে শ্রী রাওয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা আমাকে ধার নিতে হল। শুনলাম, সেই সময়ে সারা দেশ থেকে পকেটমারের দল মহীশূরের দশহরা মিছিলে একত্রিত হ'ত।

মাকে নিয়ে কুণ্ডু স্পেশাল ট্যুরিস্ট গ্রুপের সাথে আমার দক্ষিন ভারত ভ্রমণের অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত আমার 'মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে' যায়। প্রায় এক মাস সাত দিনের এই ভ্রমণের সময়কাল সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ইন্সটিট্যুটের গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে ছিল। কুণ্ডু স্পেশালে টিকিট পাওয়া সেই সময়ে অত সোজা ছিল না। দুটো টিকিট পাওয়া গিয়েছিল। কুণ্ডু স্পেশালের কর্তৃপক্ষ আমার নাম ডঃ বৈদ্যনাথ বসু-র আগে 'ডঃ' থাকায় আমাকে ডাক্তার ভেবে ভুল করে আমাকে টিকিট পাওয়ার অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কুণ্ডু স্পেশাল গ্রুপের সাথে মাকে নিয়ে কোরোমেন্ডেল এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে মাদ্রাজ (চেন্নাইয়ের তৎকালীন নাম) অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমাদের ট্যুরিস্ট গ্রুপের ম্যানেজার বাবু সবাইকে ডাক্তারি সংক্রান্ত সমস্যা হলে আমার সাথে পরামর্শ দিলেন। কারণ ডাক্তারের জায়গায় আমার নাম লেখা ছিল যদিও আমি আদৌ ডাক্তারির কিছুই জানতাম না। মাদ্রাজে নেমে গ্রুপের এক মাসীমাকে নিয়ে আমাকে রেল স্টেশনের অনতিদূরে একটি চাইনিজ ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হল। গ্রুপের অন্য এক সহযাত্রীর পেটে খুব ব্যথা হওয়াতে রেলওয়ের ডাক্তারকে ডেকে এনে তাকে পরীক্ষা করিয়ে রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা ম্যানেজার বাবু আর আমাকে করতে হল। অবশ্যই সেই সহযাত্রীটির গ্রুপের সাথে দক্ষিন ভারত ভ্রমণ তখনকার মতন স্থগিত রাখতে হল। এক রাতের জন্য কুণ্ডু স্পেশাল আমাদের জন্য মাদ্রাজের একটি হোটেলের কয়েকটা রুম বুক করেছিলেন। ম্যানেজার বাবু ভ্রমণ-সঙ্গী পরিবারদের সদস্য-সংখ্যা অনুযায়ী রুমের সাইজকে মাথায় রেখে সবাইকে রুম বরাদ্দ করে দিলেন। শুধু জনৈক সহযাত্রী 'খান' কাকু বাধ সাধলেন। তিনি জোর করে মাত্র দুজনের জন্য

একটা বড় রুম অধিকার করে বসলেন। ম্যানেজার বাবু আমার শরণাপন্ন হলেন। আমি বড় রুমটা একটা বড় পরিবারকে দিয়ে একটা ছোট রুমে চলে যাওয়ার জন্য খান কাকুকে অনুরোধ করলাম। আমি বললাম এতে আল্লা তাঁকে দুআ দেবেন। খান কাকু আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে তাঁর পদবী খান হলেও তিনি হিন্দু এবং তাই ওনাকে আল্লার দোহাই দেওয়ার দরকার নেই। অবশ্য আগে থেকেই জানতাম যে তিনি হিন্দু। আমি তাঁকে বললাম ভাল কাজ করলে ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আল্লা দুআ দেন। যাই হোক, যেন তেন প্রকারে খান কাকুকে বুঝিয়ে ম্যানেজার বাবুর সমস্যার সমাধান করে দিলাম। হোটেলে এক রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন আমরা মাদ্রাজ রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা কুণ্ডু স্পেশালের জন্য নির্ধারিত দুখানা কামরায় (কম্পার্টমেন্টে) শিফ্ট করলাম। কম্পার্টমেন্টের বাইরে কুণ্ডু স্পেশালের ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ম্যানেজার বাবুর টেম্পোরারি ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা-পয়সা রাখার ব্যবস্থা ছিল।

ম্যানেজার বাবু আমাদের মাদ্রাজ শহরের বে অফ বেঙ্গলের তীরে মারিনা সমুদ্র-সৈকত, কপালেশ্বর মন্দির, গভর্মেন্ট মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখার সুযোগ করে দিলেন। দিনের শেষে আমরা মাদ্রাজ রেলওয়ে স্টেশনে আমাদের বাসায় ফিরে এলাম। কুণ্ডু স্পেশালে আমাদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, এবং ডিনারের এলাহি ব্যবস্থা ছিল। রেল স্টেশনে ট্যুরিস্ট গ্রুপের জন্য রান্না করার জায়গা বরাদ্দ থাকত। কুণ্ডু স্পেশালের রান্নার টীম—যাদের মা সৈন্য বাহিনী বলত—বিভিন্ন স্টেশনে আমাদের আগেই পৌঁছে যেত। কুণ্ডু স্পেশালের ব্যবস্থা অনুযায়ী দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য আমাদের কম্পার্টমেন্ট দুটিকে নির্ধারিত ট্রেনের সাথে জুড়ে দেওয়া হ'ত। এই ভাবে আমরা মাদ্রাজ শহরের কাছেই চেঙ্গলপট্ট রেল স্টেশনে নেমে বেদগিরি পর্বতের উপর রুদ্রকোটি শিব মন্দিরে তীর্থস্থল 'পক্ষী তীর্থ' দেখলাম। সেখানে প্রতি দিন সকাল এগারটা থেকে দুপুর দুটোর মধ্যে পাহাড়ের উপর মন্দিরের পুরোহিতের দেওয়া প্রসাদ গ্রহণ করতে আসা এক জোড়া পক্ষীদের দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের হল। এ ছাড়া দেখলাম মহাবলীপুরমের শিব মন্দির এবং অপূর্ব সমুদ্র সৈকত। এরপর আমাদের মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) রাজ্যের আরও বিভিন্ন শহরের যে সব দ্রষ্টব্য দেখবার সৌভাগ্য হল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল তাঞ্জোরের (তাঞ্জাভুর) বৃহদীশ্বর মন্দির; তিরুচিরাপল্লির

জাম্বুকেশ্বর মন্দির এবং ন্যাশনাল ইন্সিটিচ্যুট অফ টেকনলজি; মাদুরাই-এর অপূর্ব মীনাক্ষী দেবীর মন্দির; রামেশ্বরমের দুই কিলোমিটারের বেশী, দেশের দীর্ঘতম পাম্বন রেলওয়ে সেতু এবং জ্যোতির্লিঙ্গ শিবম মন্দির। এছাড়া ছিল পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রম এবং দূরবীন দিয়ে দেখা প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা; বে অফ বেঙ্গল, অ্যারাবিয়ান সী এবং ভারত মহাসাগরের মিলন তীর্থ কন্যাকুমারী এবং সেই তীর্থে নয়নাভিরাম সূর্যোদয় ও সূর্য্যাত এবং কন্যাকুমারীর অনতিদূরে মোটর-বোট-গম্য দ্বীপে বিবেকানন্দ-রক। মাদ্রাজ রাজ্য থেকে এরপর আমরা কেরল রাজ্যে গেলাম যেখানে আমাদের আকর্ষণ ছিল ত্রিবেন্দ্রাম (তিরুভানান্তাপুরম) শহরের কোভালাম সমুদ্র সৈকত এবং শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দির; আর পাটানামতিত্তা জেলার সাবরমালা মন্দির। কর্ণাটক রাজ্যে আমাদের আকর্ষণ ছিল গার্ডেন সিটি ব্যাঙ্গালোর (ব্যাঙ্গালুরু) এবং সেখানকার লালবাগ বটানিক্যাল গার্ডেন, কাব্বন পার্ক, উলসুর লেক, বিধান সৌধ, এবং মিউজিয়াম। আর ছিল মহীশূর শহরের বৃন্দাবন গার্ডেন এবং রাজ প্রাসাদ এবং সেখানে পুলিশ ব্যান্ডের অর্কেস্ট্রা পরিবেশন। কুণ্ডু স্পেশাল ট্যুরিস্ট গ্রুপের সাথে দক্ষিন ভারত ভ্রমণের সমাপন করলাম আমরা অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতির ভেঙ্কেটেশ্বর (বিষ্ণু) মন্দির দর্শন করে। ভ্রমণের অন্তিম ক্ষণে ভ্রমণসাথী সুন্দরীদের সম্বন্ধার্থী মায়েদের আমার মা নিরাশ করলেন তাঁদের আমার রক্ষা-কবচ মণিকুন্তলা আর বিল্কুর ফটো দেখিয়ে। এক দিকে অনেক দিন পর বাড়ী ফেরার আনন্দ আর অন্য দিকে ভ্রমণসঙ্গীদের ছেড়ে যাওয়ার মনোবেদনা নিয়ে আমরা হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে ফিরে এসে একে অপরকে বিদায় জানালাম।

কুণ্ডু স্পেশাল গ্রুপের সাথে আমার ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে আলাদা করে একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে নিয়ে আবার আবার আর আই টি প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আর আই টি-তে তিন জন প্রিন্সিপ্যালের কথা মনে পড়ছে। প্রথম জন হলেন প্রিন্সিপ্যাল এস এন আস্থানা। আর আই টি-তে জয়েন করার আগে প্রফেসার ললিত কিশোরের নির্দেশে টিচিং পোস্টের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল এস এন আস্থানার সাথে দেখা করেছিলাম। 'মে আই কাম ইন' ইত্যাদির পরে ওনার চেম্বারে ঢোকার পর উনি আমার দিকে না তাকিয়ে আমাকে ইশারায় ওনার টেবিলে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা রাখতে বললেন। তিনি কোন কিছু পড়ছিলেন। একবারের জন্যও উনি আমার মুখ দেখলেন

না। কাউকে পাত্তা না দেওয়ার (আপাতদৃষ্টিতে তো আমার তাই মনে হয়েছিল) তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তাঁকে আমি মনে রেখেছি। দ্বিতীয় জন হলেন প্রিন্সিপ্যাল এ জি মিরাজগাওঁকর। আমার একটা রিসার্চ পেপারের ম্যান্যুস্ক্রিপ্ট বিদেশী জার্নালে ইন্সটিট্যুট ডিস্পাচ থেকে পাঠাবার জন্য তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল মিরাজগাওঁকরের পারমিশনের জন্য তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে পত্রপাঠ বিদায় করার সময় বললেন, ইয়হ তো তুম্হারা অপনা পেপার হ্যায়, ইসসে ইন্সটিট্যুট কা ক্যা লেনা দেনা হ্যায়। ইন্সটিট্যুট থেকে পাঠালে আমার আর্থিক সুরাহা হ'ত। এখন মনে হয়, প্রিন্সিপ্যাল মিরাজগাওঁকর যদি আমার পেপারের কো-অথর (সহ লেখক) হতেন, তবে তিনি লাফিয়ে ঝাপিয়ে পেপারটা ইন্সটিট্যুট থেকে পাঠিয়ে দিতেন। তৃতীয় জন হলেন প্রিন্সিপ্যাল বি এন রায়। তাঁর কাছে আমার আরেকটা পেপারের ম্যান্যুস্ক্রিপ্ট বিদেশী জার্নালে ইন্সটিট্যুট ডিস্পাচ থেকে পাঠাবার অনুরোধ নিয়ে দেখা করলাম। প্রথমে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি বললেন, ইন্সটিট্যুট থেকে কোন ব্যবস্থা না থাকলে তিনি নিজের ব্যক্তিগত খরচে আমার পেপারের ম্যান্যুস্ক্রিপ্ট আমার নির্দিষ্ট বিদেশী জার্নালে পাঠাবেন। উনি আমাকে আমার রিসার্চে আত্মনিয়োগ করতে বললেন। পরে আমি তখন আর আই টি ছেড়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে (বি এইচ ইউ-তে) অধ্যাপনা করছি ১৯৯২ সালে ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার প্রফেসার সি এস ঝা মারফৎ আমার কাছে আর আই টি-র প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব এল। ইউনিভার্সিটিতে আমার রিসার্চের কাজের এবং রিসার্চ স্টুডেন্টদের ক্ষতি হওয়ার কথা ভেবে আমি প্রফেসার ঝা-কে ক্ষুণ্ণ করলাম। একই কারণে আমি ইন্সটিট্যুট অফ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোরে ডি আর ডি ও 'চেয়ার প্রফেসার' হওয়ার সম্মতি না দিয়ে ডিফেন্স ল্যাব মাইক্রোওয়েভ ট্যুব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এম টি আর ডি সি)-এর ডিরেক্টারদের ক্ষুণ্ণ করেছিলাম (প্রথমে একবার ডঃ এম ডি রাজ নারায়ণ-কে এবং পরে শ্রী কে ইউ লিমায়ে-কে)।

প্রিন্সিপ্যাল বি এন রায়ের কথা লিখতে গিয়ে আর আই টি-র জাতিভিত্তিক প্রসঙ্গ—যাকে চলতি কথায় 'কাস্টিস্ম' বলে—চলে আসে। পড়ুয়াদের মধ্যে তথাকথিত বিহারের ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড জাতির দ্বন্দ ছিল যেখানে কিছু শিক্ষকদেরও উস্কানি ছিল। শোনা গেল প্রিন্সিপ্যাল বি এন রায় ভূমিহার

ফরওয়ার্ড জাতির ছিলেন এবং তিনি যে কলেজ থেকে আর আই টি-তে এসেছিলেন সেই কলেজ থেকে ভূমিহার জাতির কিছু ছাত্রদের নিয়ে এসেছিলেন তাদের ট্র্যাসফারের ব্যবস্থা করে, এবং সেই ছাত্রদের দলনেতা ছিল 'লোহা সিং' যার আসল নাম ছিল বিজয়েন্দ্র প্রতাপ সিং। ফরওয়ার্ড জাতির ছাত্র নেতা লোহা সিং-এর মোকাবিলা করার জন্য তখন আর আই টি-তে ছিল ব্যাকওয়ার্ড জাতি থেকে ছাত্র নেতা অর্জুন সিং। আর আই টি-তে এই দ্বন্দ মাঝে মাঝে কাস্ট-রায়ট বা জাতিগত দাঙ্গার চেহারা নিত, এবং অনেক ছাত্র আহত হ'ত।

আর আই টি-তে এই রকম এক দাঙ্গায় একবার প্রিন্সিপ্যাল এস এন আস্থানা ভাল্লার আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে ছিলেন। দাঙ্গাকালীন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে, ইন্সটিট্যুট এলাকায় কারফ্যু ঘোষিত হ'ত এবং ইন্সটিট্যুট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত (closed sine die)। ইন্সটিট্যুটে রিসার্চের কাজে আমি একবার এমনই মগ্ন হয়েছিলাম যে টের পেলামনা কখন ইন্সটিট্যুটে দাঙ্গা হল এবং কখনই বা ইন্সটিট্যুট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারলাম না কেনই বা সি আর পি এফ-এর কয়েকজন জওয়ান আমার দিকে রাইফেল তাক করে আছে। বরাবরের মতন অন্ধকারে অনেকটা রাস্তা হেঁটে শহর এলাকায় এসে বাস ধরে যখন বাড়ীতে পৌঁছুলাম তখন দেখলাম আমাদের বাড়ীর মুখে অনেকে জটলা করে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানেই প্রথম শুনতে পেলাম যে আর আই টি এলাকায় কারফ্যু জারি হয়েছে এবং ইন্সটিট্যুট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

একবার অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্সের প্রফেসার জনক প্রসাদ সিংহ হন্তদন্ত হয়ে আমার সাথে দেখা করে আমার লেখা একটা নোটিসের উল্লেখ করে বললেন—এটা আপনি কি করেছেন? আপনার কি ভয় ডর নেই? সংশ্লিষ্ট নোটিসটি লাইব্রেরী, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এবং বিভিন্ন হস্টেলে পাঠানো হয়েছিল। নোটিসে আমি লিখেছিলাম রোল নাম্বার ১২৫, বিজয়েন্দ্র প্রতাপ সিং (যার প্রচলিত নাম লোহা সিং সবার মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করত) যেন ফিজিক্স প্র্যাক্টিক্যাল এক্সট্রা ক্লাসে এসে সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট করে, নয়ত সে মিনিমাম পাস মার্ক পাবেনা। প্রফেসার জনক প্রসাদ সিং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; তিনি আমাকে সাবধান করে দিলেন যে লোহা সিংহ প্র্যাক্টিক্যাল

এক্সট্রা ক্লাসে আসুক আর না আসুক আমি যেন তাকে 'এ' গ্রেড নম্বর দিই যেমন সবাই দিয়ে থাকেন। বিজয়েন্দ্র প্রতাপ সিং (লোহা সিং) প্র্যাক্টিক্যাল এক্সট্রা ক্লাসে না আসাতে আমি ওর হস্টেলে গিয়ে ওকে ডেকে পাঠালাম। প্রথমে ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা আমার সাথে দেখা করে জানতে চাইল আমি কেন লোহা সিং-এর সাথে দেখা করতে চাই। আমি ওদের কোন কারণ না বলে বিজয়েন্দ্রকে ডেকে দেওয়ার জন্য বললাম। বিজয়েন্দ্র এলে ওকে আমার আসার কারণ বললাম। ওকে বললাম অবশ্যই যেন রোজ প্র্যাক্টিক্যাল এক্সট্রা ক্লাসে এসে সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট করে কারণ আমি চাইনা যে ও ফেল করে। ওকে জানিয়ে দিলাম যে ওকে আমি 'রেগুলারিটি'-তে শুন্য মার্ক্স দিয়েছি যার নড়চড় হবে না। ওর বন্ধুদের অবাক করে দিয়ে ও আমার পা ধরে আমাকে প্রনাম করে পরের দিন আমার প্র্যাক্টিক্যাল এক্সট্রা ক্লাসে আসার প্রতিশ্রুতি দিল।

পরের দিন ডেমনস্ট্রেটর শ্রী শম্ভু শরণ শ্রীবাস্তব হন্তদন্ত হয়ে আমাকে জানাল যে লোহা সিং সব এক্সপেরিমেন্ট 'সহী সহী কর রহে হ্যায়ঁ'। এর অনেক দিন পর, ১৯৮০ দশকের কোন এক সময়ে—তখন আমি বি এইচ ইউ বেনারসে কর্মরত—জামশেদপুরে এসে একদিন আমাদের বাড়ী থেকে আর আই টি-তে যাওয়ার জন্য বিষ্টুপুর মেইন রোডে স্টেট বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটা বিরাট গাড়ী এসে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি সুদর্শন যুবক—বিজয়েন্দ্র প্রতাপ সিংহ ওরফে লোহা সিং—গাড়ী থেকে বেড়িয়ে ভক্তিভরে আমার পদস্পর্শ করে আমার আশীর্বাদ নিল। নিজের সমস্ত কাজ ফেলে ও আমাকে ওর গাড়ীতে করে আমাকে আর আই টি-তে পৌঁছিয়ে দিতে চাইল। আমি না বলতে পারলাম না। গাড়ীতে যেতে যেতে ও বলল—আমি আপনাকে সারা জীবন মনে রাখব। আমি একজন 'হিস্ট্রি-শীটার' জেনেও ইন্সটিট্যুটে একমাত্র আপনি আমাকে আপনার ক্লাস সত্যি সত্যি করতে বাধ্য করে সংশ্লিষ্ট সেশানালে সবার চেয়ে কম মার্ক্স দিয়েছিলেন। আপনার দেওয়া মার্ক্সকে আমি আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করি। আমি তো লোহা সিং-এর ভূমিহার জাতির ছিলাম না। লোহা সিং-এর আমার প্রতি শ্রদ্ধা আমার কাছে বড় এক প্রাপ্তি। এই সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলাম, আন্তরিকতা দিয়ে জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক ভেদাভেদের উর্ধ্বে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

টেল্কোর ডাক্তার এ কে দত্তর ট্রিটমেন্টে মণিকুন্তলার স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হল। তবে একবার ডাক্তার দত্তর কাছে মণিকুন্তলার নিয়মিত মেডিক্যাল চেকআপে একটা বাধা উপস্থিত হল, যখন টেল্কো এডমিনিস্ট্রেশনের নির্দেশে টেল্কোর ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। লাঞ্চ আওয়ারে ডাক্তার দত্ত তাঁর কোয়ার্টারে আসেন জেনে মণিকুন্তলাকে নিয়ে আমি তাঁর কোয়ার্টারে চলে এলাম। ডাক্তার দত্তর স্ত্রী বললেন যে আমাদের মতন কত রোগী এসে ফিরে গেছেন। তিনি আমাদেরও ফিরে যেতে বললেন। আমি হাল ছাড়লাম না। ডাক্তার দত্ত আমাদের টেল্কো এডমিনিস্ট্রেশনের নির্দেশের কথা জানালেন। আমি ডাক্তার দত্তকে এডমিনিস্ট্রেশনের নির্দেশ মেনে মণিকুন্তলাকে চেকআপ করার উপায় বাৎলে দিলাম। উপায়টি হল আমাদের কাছ থেকে কোন 'ফি' না নিয়ে মণিকুন্তলাকে চেক-আপ করা। এরপর ডাক্তার দত্তর মণিকুন্তলাকে চেক-আপ না করার কোন উপায় ছিল না। এ ছাড়া তিনি কয়েকটা স্লিপে 'See me' লিখে তার নীচে ওনার সিগ্নেচার দিয়ে দিলেন, যাতে প্রয়োজন মতন মণিকুন্তলাকে নিয়ে আমি টেল্কো ডিসপেনসারিতে সোজাসুজি তাঁর কাছে চলে যেতে পারি। ডাক্তার দত্তর সাথে আমার আরেকটি সাক্ষাৎ হয়েছিল বিষ্টুপুর মেইন রোডের দোকানে যেখানে তিনি তাঁর ছেলের জন্য কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের বই কিনতে গিয়েছিলেন। ধন্বন্তরি ডাক্তারকে নিয়ে দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে আমি আমার নমস্কার জানালাম; তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার তিনি দোকানে এসে সরাসরি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেকে ডাক্তারি না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবো? আমি ওনাকে বললাম—ছেলে যা পড়তে চাইছে তাই পড়ান। উনি আমাকে নমস্কার করে থ্যাঙ্ক ইউ বলে চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, এরপর সান্যাল ব্রাদার্স বইএর দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা আমাকে ভি আই পি ভেবে ভুল করে বসল।

আর আই টি-তে জয়েন করার পর খড়গপুর থেকে আমি যখন জামশেদপুরে চলে এলাম আমাদের সঞ্জয় রোডের বাড়ীতে আমাদের যৌথ পরিবারে সকলের থাকার জন্য পর্য্যাপ্ত ছিল না। বাড়ীর পিছনের উঠোনে রান্না ঘরের পাশে একটা ছোট রুম ভাড়া নেওয়া হল আমার আর মণিকুন্তলার জন্য। সাকচী বাজারের একটা ফ্যান রিপেয়ারের দোকান থেকে একটা

টেবিল ফ্যান ভাড়া করে আনলাম। কয়েক মাস ভাড়া দেওয়ার পর দোকানের টেকনিশিয়ান মালিক, যিনি একটা ২২০ ভোল্টের লাইভ তাঁর হাতে নিয়ে তার শক খেতে খেতে গ্রাহকদের সাথে কথা বলতেন, ফ্যানটির মালিকানা আমাদের দিয়ে দিলেন। ফ্যানটির 'ঘত-ঘত' আওয়াজে সারা বাড়ী উচ্চকিত হয়ে উঠত। আমার দিদিমণির দেড় বছরের মেয়ে তানিয়া মামাবাড়িতে এলে বলত—আমি ছোট মামীর 'ঘত-ঘত' ঘরে যাব। তবে আমাদের নতুন ঘরের সুখ বিধাতার বেশী দিন সহ্য হল না। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন এক মাঝ রাতে আমাদের ঘরের 'রিইন্ফোর্সড' ইটের ছাদ আমাদের উপর ভেঙ্গে পড়ল। আমরা দুজনেই কিছু সময়ের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। ইটের স্তূপ থেকে বেরিয়ে আমি ঘরের ছিটকিনি খুলি। বাড়ীতেই অরূপদার (ডাক্তার অরূপ মৈত্র যিনি একজন প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার ছিলেন) তত্ত্বাবধানে আমাদের চিকিৎসা শুরু হয়। মনিকুন্তলাকে ওর কপালে কয়েকটা স্টিচ নিতে হয়। মনিকুন্তলা সেই সময়ে সন্তানসম্ভবা ছিল।

আমাদের সঞ্জয় রোডের পাশের রোড আমবাগান রোডে টিস্কোর রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার রাস বিহারী ব্যানার্জী তাঁর ভারী সুন্দর বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীর সাথে থাকতেন। তিনি তাঁর বাড়ীর কোন অংশ ভাড়া দিতেন না। সবাই আশ্চর্য হল যে আমি আর আই টি-র শিক্ষক এই পরিচয়ে তিনি বাড়ীর একতলার একটি অংশ আমাদের ভাড়া দিতে রাজী হয়ে গেলেন। আমরা ১১৭, সঞ্জয় রোড থেকে ১৪৪, আমবাগান রোডে চলে এলাম। আমাদের প্রিয় অ্যালসেসিয়ান মন্টি ওর আলাদা ঘর পেয়ে গেল। রাস বিহারী বাবুর স্ত্রীর মধ্যে আমি এক মাসীমা পেয়ে গেলাম। রাস বিহারী বাবু আদর করে নিজের ঘরের সংলগ্ন একটি জায়গা নিরিবিলিতে আমার লেখাপড়ার জন্য তৈরি করে দিলেন। আমবাগান রোডে ভানুদের বাড়ীর সামনের মাঠে মন্টির বলের খেলা দেখতে অনেকের ভিড় জমে যেত। মন্টির অনেক উচ্চতা পর্যন্ত লাফিয়ে বল ধরা দেখবার মতন ছিল। মন্টির অগোচরে সেই মাঠের কোন এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে মন্টির বলটি লুকিয়ে দিতাম। মন্টি গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছে সামনের দু পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে বলটি বের করে আনত। মেডিক্যাল চেকআপের জন্য মন্টিকে ভেটেরিনারি হাসপাতালে নিয়ে যেতাম জুবিলি পার্কের ভিতর দিয়ে।

বড় ছেলে বিল্কুর জন্ম হওয়ার আগে মণিকুন্তলা কলকাতায় বিন্দু পালিত

লেনে ওর বাপের বাড়ী চলে গেল। মণিকুন্তলার বাবা মায়ের অত্যন্ত যত্নে বিল্কুর জন্ম হল কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে। মণিকুন্তলা ও বিল্কুকে নিয়ে আমি জামশেদপুরে বিল্কুর অন্নপ্রাশনের আগে চলে এলাম। তবে অন্নপ্রাশনের আগেই বিল্কুর নামকরণ হয়ে গেল। কয়েক মাসের বিল্কুর একবার পেট খারাপ হওয়াতে একবার অরূপদাকে কল করা হয়। বিল্কুকে চেক আপ করার পর প্রেস্ক্রিপশন লেখার সময় অরূপদা বিল্কুর নাম জানতে চাইলেন। তখনও বিল্কুর নামকরণ হয়নি। আমরা তাই বিল্কুর নাম বলতে পারলাম না। উনি বললেন তিনি একটা নাম লিখে দিতে পারেন যদি আমরা সত্যি-সত্যি সেই নাম রাখি। আমার মা রাজী হয়ে গেলেন। অরূপদা বিল্কুর নাম রাখলেন 'ইন্দ্রনীল'। অদ্ভুত যোগাযোগ অরূপদার মতন ইন্দ্রনীলও প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনার ডাক্তার হল।

সেই সময় সুযোগ পেলেই আমি আর মণিকুন্তলা খড়গপুরে স্যার (আমার পি এইচ ডি গাইড)-এর কাছে চলে যেতাম; কখন স্যারের বাড়ী কখনও বা সমীরের বাড়ীতে থাকতাম। একবার বৌদি (স্যারের স্ত্রী ঝর্ণা বৌদি) আমাকে নিয়ে স্যারকে লুকিয়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রী (এস্ট্রলজার) অমরেশ ভট্টাচার্যের কাছে গেলেন আমার ভবিষ্যৎ জানতে। বৌদি বিশেষ করে কবে আমার পি এইচ ডি হবে জানতে চেয়েছিলেন। এস্ট্রলজার ভট্টাচার্য আমার হাতের রেখা দেখে বললেন, আমার জন্ম তারিখ তেসরা ফেব্রুয়ারি নয়, ওটা হবে পয়লা ফেব্রুয়ারি, আঠেরোই মাঘ। সত্যিই আঠেরোই মাঘ হিসেবে আমার জন্মদিন পালন করা হ'ত। যে বছর আমি স্কুলের বোর্ডের পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ করছিলাম সে বছর আঠেরোই মাঘ ছিল তেসরা ফেব্রুয়ারি। সেই হিসেবে ফর্মে আমি ভুল করে আমার জন্ম তারিখ তেসরা ফেব্রুয়ারি লিখেছিলাম। সেই থেকে আমার অফিসিয়াল ডক্যুমেন্টে এই দু' দিনের ভুলটা রয়েই গেছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র অনুযায়ী তিনি আমাকে একটি রত্ন ধারণ করতে বললেন। তিনি আমার সম্বন্ধে চারটি ভবিষ্যদ্বাণী লিখে দিয়েছিলেন। তার তিনটিতে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাল-ভাল কথা লেখা ছিল, কিন্তু একটিতে আমার তিরিশ বছর বয়সে কঠিন অসুখে জীবন সংশয় হওয়ার কথা লেখা ছিল। আশ্চর্য, সেই বয়সেই সত্যি-সত্যি আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সেই সময়ে আমাদের ডাক্তার অরূপদা সাকচীর উত্তরে সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে মানগো-তে গিয়ে আটকা পড়ে ছিলেন, কারণ নদীর পুল

বন্যায় জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল। তখন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ব্রহ্মপদ মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হয়। তিনি প্রথমে যে ওষুধ দেন তাতে কাজ হয়না। পরে তাঁকে ডাকা হলে তিনি না এসে ওষুধ পালটিয়ে দেন। তিনি বড় ডাক্তার বলে তাঁর ওষুধই চলতে থাকে যদিও উত্তরোত্তর আমার অসুখ বাড়তেই থাকে। ততদিনে বন্যার জল কমে যাওয়াতে নদীর ওপার থেকে অরূপদা ফিরে এসেছেন। তখন কারুর বারণ না শুনে মণিকুন্তলা আমাদের বাড়ীর কাছে অরূপদার বাড়ী ছুটে চলে যায় এবং অরূপদাকে আমাদের বাড়ী ধরে নিয়ে আসে। অরূপদা এসে 'এ আপনারা কি করেছেন?' বলে নিজের গাড়ীতে করে আমাকে ক্রিটিকাল কন্ডিশনে বিষ্টুপুরের কাছে ধাদকিডি-র টিস্কোর মেইন হাসপাতালে ভর্তি করেন। 'বড্ড দেরী হয়ে গেছে' বলে ডাক্তার ত্রিপাঠী যমে-ডাক্তারে টানাটানি করে আমার ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিলেন। আমি জেনারেল ওয়ার্ডে ছিলাম। সারা শরীরে ছিল অসম্ভব যন্ত্রণা। আমার বেড কেউ ধরলে বেডে যে ভাইব্রেশন হ'ত তাতে শরীরের যন্ত্রণা আর তীব্র হয়ে উঠত। সারা শরীরে ঠাণ্ডার কাঁপুনি যা সাত আটটা লেপেও থামত না। পরীক্ষা করার জন্য ইউরিনের স্যাম্পেল নেয়া যেতনা, কারণ ইউরিনের বদলে 'পাস' (পুঁজ) কালেক্ট করতে হ'ত। স্যালাইন ওয়াটার একটার পর একটা দেওয়াতে বিষ্টুপুরের মেডিক্যাল স্টোরগুলিতে স্যালাইন ওয়াটারের টানাটানি পড়ে গিয়েছিল। শুনলাম আমার পায়ে গ্যাংরিন হয়ে গিয়েছিল আমি টিস্কোর কর্মচারী (এমপ্লয়ী) না হওয়াতে মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের খরচ আমাদের বহন করতে হ'ত। আর আই টি-র আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টোরকিপার শ্রী নন্দ কিশোর রাম আর আই টি থেকে মেডিক্যাল এডভান্স এনে দিয়েছিলেন। আর আই টি-র সহকর্মীরা এবং ছাত্রছাত্রীরা আমাকে দেখবার জন্য আসত। মনে আছে, হাসাতালের বেডে আমাকে বাঁচার জন্য উৎসাহিত করার জন্য কেম্ব্রিজের একটি রিসার্চ জার্নালে সদ্য প্রকাশিত আমার লেখা একটা পেপারের রিপ্রিন্ট আমাকে দেখানো হয়েছিল।

দিন রাত এক করে আমার ছোড়দা (জয়ন্তদা) হাসপাতালে আমার কাছে থাকতেন। পাশের বেডের পেশেন্ট আমাকে বললেন যে জয়ন্তদার মধ্যে ভাইয়ের প্রতি দাদার এরকম ভালবাসা তিনি এর আগে কখন দেখেননি এবং তিনি এও বলে গেলেন যে আমি যেন সারা জীবন জয়ন্তদার

কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। এই বলে তিনি কিছু দিন পর হাসপাতাল থেকে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। জয়ন্তদা, দাদা আর শম্ভু ছাড়া ছোড়দির (মঞ্জুদির) এল আই সি আই-এর সহকর্মীরা পালা করে বিশেষ করে অরবিন্দ মিশ্রজী সারা রাত আমাকে অ্যাটেন্ড করতেন। আমার জামাইবাবুর ভাই বাবলুদাও আমাকে অ্যাটেন্ড করতেন। আরেকজন অ্যাটেন্ড করতেন যার নাম পিটার অ্যাথেট যার সাথে আমাদের হাসপাতালেই পরিচয় হয়েছিল যখন পিটার হাসপাতালে তাঁর অসুস্থ শ্বশুর মশাইকে অ্যাটেন্ড করতে এসেছিলেন। শ্বশুর মশাই সুস্থ হয়ে বাড়ী চলে যাওয়ার পরও পিটার আমাকে অ্যাটেন্ড করতে আসতেন।

তখন সবে অ্যান্টিবায়োটিক গ্যারামাইসিন ইন্ডিয়াতে এসেছে। ডাক্তার ত্রিপাঠীর নির্দেশে আমার উপর সেই ওষুধের প্রয়োগ মিরাকেলের মতন কাজ করল। হাসপাতাল থেকে আমি বাড়ী ফিরলাম। 'আমার বাবা জিতে গেছে; আমরা জিতে গেছি ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে তিন বছরের বিল্কু আমাকে ওয়েলকাম করল। বাড়ীতে ফিরে জয়ন্তদা আমার খাওয়া দাওয়ার প্রতি যত্ন নিয়ে দু'দিনেই চাঙ্গা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমাকে নতুন করে হাঁটতে শেখালেন। সেই সময়ে আমার বড়দা ও পলির ছেলে শুভনীলের জন্ম হল। আমাদের বাড়ী আবার আনন্দে মেতে উঠল।

ভানু টিস্কোতে আর শম্ভু টেল্কোতে কাজ করত। কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে প্রায় ভানুদের বাড়ীর সামনের মাঠে বিকেলে শম্ভু, ভানু আর আমি মিলিত হয়ে গল্প গুজব করতাম। বিল্কু (আমার ছেলে), ঝুম (শম্ভুর মেয়ে) আর পাপলু (ভানুর ছেলে) আমাদের সাথে থাকত, যারা নিজেদের মধ্যে খেলাধুলায় মত্ত থাকত। একবার শম্ভুর মেয়ে ঝুম আমাদের ছড়া শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিল। মণিকুন্তলা বিল্কুকে অনেক ছড়া ও কবিতা শোনাত। ধীরেন বলের বিখ্যাত আঁকা আর লেখা বই 'তুতু-ভুতু' পড়ে শোনাত। কিন্তু ঝুমের মতন বিল্কু কোনও ছড়া ও কবিতা বলতে পারত না বলে জয়ন্তদা খুব দুঃখ পেতেন। কিন্তু একদিনের ঘটনা বিল্কুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পালটিয়ে দিল। বিল্কু একদিন ছড়া বলতে না পারাতে জয়ন্তদা জোরে বলে উঠলেন 'ডাকব বগা পুলিশকে?' 'তুতু-ভুতু' বইএর একটা চরিত্র 'বগা পুলিশ'কে বিল্কু ভয় পেত। তখন এক নাগাড়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'তুতু-ভুতু' মুখস্ত বলে আমাদের বিস্মিত করে দিল। আরও বিস্ময় বাকি ছিল। মণিকুন্তলা যে সব বই বিল্কুকে পড়াত সে সব বই বিল্কুর সামনে রাখা হল। যখন প্রত্যেকটা

বই বিল্কু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত বলতে থাকল, আমার মা ভয় পেয়ে সবাইকে থামিয়ে দিল।

বিল্কুর সর্দিতে নাক বন্ধ হলে পর ওর নাকে 'অট্রিভিন' ড্রপ দেয়া হ'ত। রাস্তায় একদিন একটা গাড়ীর সামনের বনেট খুলে জল ঢালা থেকে দেখে বিল্কু জানতে চাইল গাড়ীটার সর্দি হওয়াতে ওর নাকে অট্রিভিন দেয়া হচ্ছে কি না। আমার স্কুলের ক্লাসমেট সলিল (চৌধুরী) বিখ্যাত অনঙ্গ উকিলের মোটর গাড়ীর ড্রাইভার ছিল। সুযোগ বুঝে সলিল আমাকে সেই গাড়ীতে আমাকে একটু আধটু ড্রাইভিং শিখিয়েছিল। জয়ন্তদা জামশেদপুরের এন্গলিন্গ (মাছ ধরার) ক্লাবের মেম্বার ছিল। জয়ন্তদার সাথে ছুটির দিনে মাঝে মাঝে আমিও মাছ ধরতে বাঘাকুদা লেকে যেতাম। এত মাছ ধরা পড়ত যে পাড়ায় বিলিয়ে শেষ করা যেত না।

সাকচীর ঠাকুরবাড়ী রোডে থাকতে আমার জানাশোনা দিলীপ বোসকে জামশেদপুরের পশ্চিমে সোনারি অঞ্চলে অবস্থিত তার দোকান থেকে একটা খাট (পালঙ্ক) তৈরি করার জন্য আমি এডভান্স টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে ঠকিয়ে দিল—না আমার পালঙ্ক তৈরি করল, না আমার এডভান্স ফেরত দিল। দিলীপের অনুপস্থিতিতে ওদের দোকানের এক কাঠের মিস্ত্রী আমাকে বলল যে ওরা ওদের মজুরিও পাচ্ছেনা। সে আমাকে বলল যে আমি ওকে সাহায্য করলে ও আমার পালঙ্ক তৈরি করে দেবে। অতঃপর আমরা একটা দোকান ভাড়া করে ওর সাথে কাঠের টাল থেকে কাঠ কিনে আসবাবপত্রের ব্যবসা শুরু করে দিলাম। গ্রাহকের অবস্থানে আমি দোকানে আমার পি এইচ ডি-র রিসার্চ সংক্রান্ত পড়াশুনা করতাম। জয়ন্তদা তখন গ্রীভস কটন প্রতিষ্ঠানে কাজ করত এবং কর্মসুত্রে জামশেদপুরের বাইরে ট্যুরে যেত। একবার ট্যুর থেকে এসে গ্রীভস কটনের কাজ ছেড়ে দিয়ে জয়ন্তদা আমাদের দোকানের ভার নিয়ে নিল। আমাদের পূর্ববঙ্গের 'ফেলে আসা' ফরিদপুরের গ্রাম আলগী-র নাম অনুসারে জয়ন্তদা আমাদের দোকানের নাম রাখল 'আলগী ফার্নিচার'। বাড়ীর আসবাবপত্র ছাড়াও টিস্কো এবং টেল্কো-র আসবাবপত্র ও ইন্টারনাল ডেকরেশনের কাজে আমাদের প্রভুত উন্নতি হল। আমাকে দিলীপের ঠকানো শাপে বর হল। আলগী ফার্নিচারের সৌজন্যে অনেক লোকের অন্নসংস্থান হল। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আর আই টি-তে শিক্ষকতা করতে করতে আমি

ব্যবসা করতে পারি কিনা। এই প্রসঙ্গে পড়ল আমার সহকর্মী আর আই টি-র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক সর্দার বলদেব সিং সদেরা আর আই টি যাওয়ার পথে আমাকে কয়েকবার লিফ্ট দিয়েছিলেন। পথে ওনাদের ফাউন্ড্রীতে প্রতিবার আমাকে নিয়ে যেতেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন ওনাদের ফাউন্ড্রীর কথা আর আই টি-তে কারুর সাথে আলোচনা না করি। কারণ আর আই টি-র কর্মচারী থাকাকালীন অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য কাজ করা নিয়ম-বিরুদ্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আমার অভিজ্ঞতার কথা। সেখানে সাইন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কোন শিক্ষকের ইন্ডাস্ট্রি থাকা বা ইন্ডাস্ট্রির কনসাল্টেন্ট হওয়াকে প্রশংসনীয় যোগ্যতা বলে মনে করা হ'ত। শিক্ষকের এই যোগ্যতা ইউনিভার্সিটির পঠন-পাঠনের বিষয়বস্তু থেকে দেশের শিল্পায়নের আসল প্রয়োজনীতার ব্যবধানকে কমাতে সাহায্য করে বলে মনে করা হ'ত। অন্যান্য উন্নতিশীল দেশেও এই রকমটাই ভাবা হ'ত। এখন অবশ্য আমাদের দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও, যেমন আই আই টি-তে, এই রকমই ভাবা হয়।

আমবাগান রোডের বাড়ীর কাছে ধলভুম রোডে কোঅপারেটিভ কলেজের শিক্ষক স্মরজিৎ মিত্র এবং অধীর ব্যানার্জী থাকতেন। স্মরজিৎ মিত্র স্যার কলেজে ইংরাজি পড়াতেন। কোঅপারেটিভ কলেজ জয়েন করার আগে তিনি আমাদের বিবেকানন্দ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। অধীর ব্যানার্জী স্যার কোঅপারেটিভ কলেজে আমাদের ফিজিক্স পড়াতেন। ছুটির দিনে তাঁদের কাছে মনিকুন্তলা আর আমি স্নেহ-ভরা আপ্যায়ন পেতাম। স্মরজিৎ মিত্র স্যারের কাছে আমার ইংরাজি ব্যাকরণের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেতাম। অধীর ব্যানার্জী স্যারের কাছে পড়তে আসা পড়ুয়াদের সাথে আমিও বসে যেতাম। তিনিও আমার সাথে ফিজিক্সের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ আমাদের আমবাগান রোডের বাড়ীতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন; তিনি জামশেদপুরে কোন অনুষ্ঠানে এসে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হয়ে ছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর আই টি-র ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার অশোক কুমার সেনগুপ্তও ছিলেন।

আর আই টি-তে থাকাকালীন আমার পলিটিকাল ইলেকশন (নির্বাচন) ড্যুটি করার অভিজ্ঞতা হল। একবার ছিলাম প্রিসাইডিং অফিসার আর আরেকবার ছিলাম পেট্রোলিং ম্যাজিস্ট্রেট। নির্বাচনের দু'দিন আগে আর আই টি-র শিক্ষকদের ব্যালট বক্স ইত্যাদি সহ পোলিং মেটেরিয়াল নিতে হত তদানীন্তন বিহারের সরাইকেলা থেকে। নির্বাচনের একদিন আগে পোলিং বুথে পৌঁছে যেতে হ'ত। ছৌ-নাচের জন্য বিখ্যাত সরাইকেলার নিবাসীরা ওড়িশিভাষী ছিলেন। তবে আমাদের ইলেকশন ড্যুটি করতে হ'ত সরাইকেলা জেলার খরসায়াঁ সাব-ডিভিসনের দুর্গম আদিবাসী মুণ্ডাভাষী গ্রামগুলিতে। আমাদের পোলিং অফিসারের মধ্যে অন্তত একজন দোভাষী থাকতেন। একটু-আধটু মুণ্ডা ভাষা শিখে নিয়ে ছিলাম, যেমন, 'অমাঃ চীনাঃ নুতুম? অমাঃ হাতু কোতা'? যার মানে 'তোমার নাম কি? তোমার গ্রাম কোথায়'?

সরাইকেলাতে আর আই টি-র সহকর্মী মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের শ্রী মনোরঞ্জন দুবের বাড়ী ছিল। মনে আছে, সরাইকেলা থেকে পোলিং মেটেরিয়াল নিয়ে আমবাগান রোডের বাড়ীতে ফেরার পথে সরাইকেলায় শ্রী মনোরঞ্জন দুবের বাড়ীতে দুবেজীর মায়ের যত্নে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। দুবেজীর দাদা, যিনি হাই কোর্টের জজ ছিলেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে মার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। 'অন ড্যুটি' থাকার জন্য তিনি বাড়ীতে অন্নস্পর্শ করলেন না। আর আই টি-তে আমরা একে অপরের সাথে হিন্দিতে কথাবার্তা বলতাম। তবে দুবেজীর স্ত্রী বা অত্যন্ত মেধাবী জুব্বুর (জুবিলির) মা ওড়িশি ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। বাংলাভাষী আমাদের ওনার বুঝতে কোন অসুবিধা হ'ত না। ব্যালট বক্স ইত্যাদি সহ পোলিং মেটেরিয়াল নিয়ে সরাইকেলার নির্বাচন অফিস থেকে দেওয়া ট্রাকে করে অনেক রাতে আমবাগান রোডের বাড়ীতে ফিরে বাড়ীর সবাইকে বিব্রত করেছিলাম।

আমার প্রিসাইডিং অফিসার হওয়াকালীন খরসায়াঁ সাব-ডিভিসনের দুর্গম গ্রামের পোলিং বুথে (একটি প্রাইমারী স্কুলে) যাত্রা পথে গ্রামের একজনের কুঁড়েঘরের ছাদ থেকে নির্গত বাঁশের একটি টুকরো আমাদের ট্রাকের যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। দোভাষীর সাহায্যে ঐ কুঁড়েঘরটির মালিকের অনুমতি নিয়ে বাঁশের টুকরোটি কেটে ট্রাকের যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে আমাদের আমরা নির্দিষ্ট পোলিং বুথে পৌঁছে গেলাম। চাল,

ডাল, তরি-তরকারি, ডিম, জ্বালানি ইত্যাদি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা খিচুড়ি আর ওমলেট বানিয়ে পিকনিকের বাতাবরণে পরম তৃপ্তিতে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমুবার তোড়জোড় করছি এমন সময়ে শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হল বাইরে একটা গন্ডগোলের আওয়াজে। দোভাষীর সাহায্যে জানতে পারলাম যে গ্রামের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে কুঁড়েঘরের ছাদ থেকে নির্গত বাঁশের টুকরোটি কাটার ক্ষতিপূরণ দাবী করছে। ওদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। এক মজাদার অভিজ্ঞতা হল যখন ভোট দেওয়ার পর কোন কোন ভোটদাতা আমাদের কাছে ভোট দেওয়ার জন্য পয়সা চাইল।

প্রিসাইডিং অফিসার এবং পেট্রোলিং ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে পোলিং সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পুস্তিকা থাকত। একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। একটা ব্যালট বক্স ভরে যাওয়ার আগে আরেকটি ব্যালট বক্সকে সীল লাগিয়ে রেডি করতে হ'ত। ভোটের পরে প্রিসাইডিং অফিসারকে সীল করা ভরা ব্যালট বক্স পেট্রোলিং ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে দিতে হত। অব্যবহৃত ব্যালট বক্স, সীল ইত্যাদি পরে নির্বাচন অফিসে জমা দিতে হত। আমার ক্ষেত্রে একবার সীল লাগানো ব্যালট বক্সে একটাও ভোট পড়লনা। কেন যেন আমার মনে হল যে ভোটের কাউন্টিং-এর সময় এই 'খালি' ব্যালট বক্সের জন্য সমস্যা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত তা পোলিং সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পুস্তিকায় খুঁজে পেলাম না। সমস্যার সমাধানে কয়েকটি খালি ব্যালট পেপারের প্রত্যেকটিতে দু তিন জন প্রার্থীর নামের উপর মোহর লাগিয়ে ব্যালট পেপারগুলিকে 'অবৈধ' করে সংশ্লিষ্ট ব্যালট বক্সে ভরে দিয়ে ব্যালট বাক্সটিকে আর খালি রাখলাম না।

এবার আসছি আমার পেট্রোলিং ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কাজ করার একটা অভিজ্ঞতার কথা। আমার পেট্রোলিং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করার সময় আমার সাথে এক পুলিস অফিসারকে দেওয়া হল। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী আমাকে জানাল যে পুলিশ অফিসারটি একজন বদমেজাজি বিতর্ক সৃষ্টিকারী দারোগা। যখন তখন গুলি চালানোর ওর রেকর্ড আছে। নানা রকম হম্বি-তম্বি করে দারোগাজী আমাকে বললেন যে যতক্ষণ ওনার কাছে পিস্তল আছে কেউ আমার ক্ষতি পারবেনা। ওনার ভাষায়, কোঈ ভী আপকা বাল বাঁকা নহী কর সকেগা। আমি ওনাকে জানিয়ে দিলাম যে যেহেতু আমি পেট্রোলিং

ম্যাজিস্ট্রেট আমি ওনার চেয়ে সিনিয়ার এবং ওনাকে আমার অর্ডার মেনে চলতে হবে। উনি আমার কথা শুনে থতমত হয়ে গেলেন। আমি ওনাকে ওনার পিস্তল রেখে আসার এবং শুধু লোক দেখানোর জন্য পিস্তলের খাপটি কোমরে ঝুলিয়ে রাখার অর্ডার দিলাম। আমার শক্ত ঠাঁই ওনাকে পিস্তল-ছাড়া করে স্বাভাবিক পুলিশ অফিসার করে দিল। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড় হয়েও আমাকে ওনার 'গুরু' মেনে নিলেন।

অরূপদা (ডাক্তার মৈত্র)—যিনি আমার ছেলের নাম 'ইন্দ্রনীল' রেখেছিলেন এবং যিনি আমাকে আমার যমে-ডাক্তারের-টানাটানি অসুখের সময় টিস্কোর মেইন হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন, এবং যিনি ও যার স্ত্রী লালীদি থিয়েটারে অভিনয় করতেন—ছুটির দিন এক রবিবার আমাদের আমবাগান রোডের বাড়ীতে এসে আমাকে বললেন, 'চলুন, আমার সাথে আপনাকে একটু অভিনয় করতে যেতে হবে। আপনাকে আমার সহ-অভিনেতা হয়ে এক রোগীর বাড়ী যেতে হবে। সেখানে সবাই একটু নার্ভাস প্রকৃতির। রোগী দেখার সাথে সাথে, চলুন, ওদের সবাইকে একটু 'চাঙ্গা' করে আসি।'

অরূপদার গাড়ী থেকে নেমে দেখলাম রোগীর বাড়ীর সামনে অনেকে অরূপদার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। অরূপদা অপেক্ষমাণ ভিড়কে উদ্দেশে করে বললেন, 'আমি কি পরে আসব? আপনারা নিশ্চয় কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন।' সবাই বলে উঠল, 'ডাক্তারবাবু, আমরা আপনারই জন্য অপেক্ষা করছি।' অরূপদা সবার সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তারপর আমার সাথে আমাদের কোন এক পুরনো কথার জের টেনে কথা বলতে বলতে রোগীকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। রোগীকে পরীক্ষার পর, সাগ্রহে ডাক্তারবাবুর মতামতের জন্য অপেক্ষারত বাড়ীর সবাইকে রোগীর অবস্থার কথা না বলে সবার কাছে আমার গুণপনা ব্যক্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রোগীর ব্যাপারে সবাইকে এই টুকুই বললেন যে কয়েকটা মেডিক্যাল টেস্ট করার জন্য রোগীকে টিস্কো মেইন হাসপাতালে কয়েকদিনের জন্য থাকতে হতে পারে। তারপর অরূপদা সুযোগ বুঝে আলাদা করে রোগীর বড় ছেলেকে ডেকে রোগীর যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তা জানিয়ে দিয়ে ঐ মুহূর্তে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিলেন। বাড়ীতে সবাইকে হার্ট অ্যাটাকের বদলে মেডিক্যাল টেস্টের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অজুহাত দেওয়ার পরামর্শও দিলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ মেজাজে সবার

উদ্দেশে আমাকে দেখিয়ে অরূপদা বললেন যে অরূপদা ওনাদের বাড়ীতে নতুন অতিথি কে নিয়ে এসেছে। অরূপদা তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম অতিথির চা জলখাবারের কি ব্যবস্থা হয়েছে জানতে চাইলেন। নিমেষে সমস্ত বাড়ীর থমথমে মাহৌল বা পরিবেশ পাল্টে গেল যখন অরূপদা আমাকে দেখিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—অতিথিকে আপ্যায়ন করবেন না?

# মৈঁ নহীঁ বোল রহা হূঁ,
# ইয়হ তো অ্যাস্ট্রোলজী বোল রহী হৈ

জামশেদপুরে সাকচীর আমবাগান রোডের আমাদের বাড়ী থেকে আমার কর্মক্ষেত্র আদিত্যপুরের আর আই টি-তে যাতায়াত করতে অনেক ঝক্কি পোহাতে হ'ত। অনেক সময়ও লাগত। সাকচী থেকে বিষ্টুপুরে এসে স্টেট বাস ধরতে হ'ত। অনিয়মিত ভাবে স্টেট বাস চলত। আমার আর আই টি থেকে ফিরতে অনেক দেরী হ'ত। সেই সময়ে স্টেট বাস পাওয়া যেত না। আর আই টি-র কোন বাউন্ডারি ওয়াল ছিল না। আর আই টি থেকে বাড়ী ফেরার দুটি রাস্তা ছিল। (১) প্রথম রাস্তাটি ছিল আর আই টি-র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথে প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারকে ডানদিকে এবং প্রফেসার কলোনিকে বাঁদিকে রেখে, রেলওয়ে কলোনির ভিতর দিয়ে আদিত্যপুর রেল স্টেশনকে বাঁ দিকে রেখে একটা রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে, বিষ্টুপুর থেকে গামারিয়া ও কান্দ্রা যাওয়ার আদিত্যপুর মেইন রোডে শের-এ-পাঞ্জাব রেস্টুরেন্টের কাছে পৌঁছানো, যেখান থেকে বাসে বা শেয়ার ট্যাক্সিতে বিষ্টুপুর মেইন রোডে এসে সেখান থেকে সাকচী পৌঁছানো। (২) দ্বিতীয় রাস্তাটি ছিল আর আই টি-র পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে লেকচারার কলোনিকে পেছনে ফেলে আদিত্যপুর মেইন রোডে—যদিও শের-এ-পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট থেকে অনেক দূরে—পৌঁছানো, যেখান থেকে বিষ্টুপুর মেইন রোডে যাওয়ার বাস বা শেয়ার ট্যাক্সি সব সময় পাওয়া যেত না, যা শের-এ-পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট থেকে পাওয়া যেত। দ্বিতীয় রাস্তাটিতে কোন রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পড়ত না। যাতায়াতের এই কষ্টের জন্য আমার শরীর ভেঙে যাচ্ছিল আর আমার রিসার্চের কাজও ব্যাহত হচ্ছিল। যাতায়াতের এই কষ্ট কমানোর জন্য আমি আমবাগান রোডের বাড়ী থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হলাম। আমবাগান রোড থেকে আর আই টি-র অনতিদূরে আদিত্যপুর পান দোকান বাস স্ট্যান্ডের কাছে গড়ে ওঠা বিহার সরকারের কলোনিতে আর আই টি-র জন্য নির্ধারিত ছোট একটি কোয়ার্টারে

মনিকুন্তলা আর ছেলে বিল্কুকে নিয়ে আমি চলে এলাম। আমবাগান রোড থেকে একই সঙ্গে টেল্কোতে কর্মরত দাদা (বড়দা) বৌদি, মা, ও ছেলে শুভকে নিয়ে টেল্কোর কোয়ার্টারে নিজের কর্মক্ষেত্রের কাছে চলে গেল। আমবাগান রোড থেকে জয়ন্তদাও নিজের কর্মক্ষেত্র জামশেদপুরের সোনারি অঞ্চলে আমার প্রতিষ্ঠিত 'আলগী ফার্নিচার' দোকানের কাছে একটি ভাড়া বাড়ীতে চলে গেল।

আমবাগান রোডের বাড়ী থেকে আদিত্যপুরের কোয়ার্টারে জয়ন্তদা ও আমার স্কুলের বন্ধু—শম্ভু আর ভানু—আমাদের নিয়ে এল। ছত্তিসগড়িয়া (ছত্তিসগড় থেকে আগতা) ঝুঁটিবাঁধা শক্তিশালী তেজমতি মাসিক বেতনের বিনিময়ে আমাদের অভিভাবিকা হয়ে গেল। বাসন মাজা ও কাপড় কাচার দায়িত্ব তেজমতি নিয়ে নিল। তেজমতি বাড়ীর চারিদিক বেড়া দিয়ে ঘিরে দিল। আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টোরকিপার শ্রী নন্দ কিশোর রাম—যিনি অসুস্থ অবস্থায় আমার টিস্কোর মেইন হাসপাতালে থাকার সময় আর আই টি থেকে আমার মেডিক্যাল এডভান্স এনে দিয়েছিলেন—আমাদের কোয়ার্টারের কাছেই তাঁর নিজের কোয়ার্টারে থাকতেন। নানা প্রয়োজনে আমরা একে অপরের সাহায্য করতাম। আমাদের আশেপাশের সব কোয়ার্টারে আর আই টি-র টিচিং ও নন-টিচিং বিভাগের সহকর্মীরা থাকতেন। পান দোকান বাস স্ট্যান্ডের কাছে গড়ে ওঠা বিহার সরকারের আর আই টি-র জন্য নির্ধারিত এই কলোনিকে সেই সময় আর আই টি-র 'ওল্ড ক্যাম্পাস' বলা হ'ত। প্রথমে আমরা কলোনির সাত নম্বর রোডে ও পরে দু'নম্বর রোডে থাকতাম। সাত নম্বর রোডে থাকার সময় দু'নম্বর রোডে আর আই টি-র অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার জনক প্রসাদ সিং-এর কোয়ার্টারে ওনার স্নেহশীলা স্ত্রীর প্লে-স্কুলে বিল্কু পড়তে যেত।

আমরা দল বেঁধে ওল্ড ক্যাম্পাস থেকে হাঁটাপথে আমাদের কর্মক্ষেত্র আর আই টি-তে যেতাম। আমাদের যাওয়ার পথে একটা রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং আমরা সাবধানে পার হতাম। খনি অঞ্চল থেকে আসা টিস্কোর জন্য আকরিক বহন করার মালগাড়ী অত্যন্ত আস্তে চলত। এই মালগাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'লাটসাহেব'। একবার লাটসাহেব লেভেল ক্রসিং-এ চলে এলে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ত। কারুর ক্লাস থাকলে সময়

হাতে নিয়ে আমাদের লেভেল ক্রসিং-এর কথা মনে রেখে বাড়ী থেকে বেরুতে হ'ত। তাড়াহুড়ো করে লেভেল ক্রসিং পার হতে গিয়ে আর আই টি-র দুজন শিক্ষক অকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে শনিবার আর রবিবারে হাট (বাজার) বসতো। সস্তায় তরকারি ও মাছ-মাংস পাওয়া যেত। অনেক শনিবার বিকেলে আদিত্যপুর থেকে বিকেলে আমরা টেল্কোর প্লাজা মার্কেটের কাছে দাদার কোয়ার্টারে চলে যেতাম। দাদাদের ওপর তলার ফ্ল্যাট থেকে নীচের তলার মাঠে হোলিকা দহন দেখার কথা মনে পড়ে যায়। মাঝে মাঝে মাকে টেল্কোর দাদার বাড়ী থেকে আদিত্যপুরে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসতাম। টেল্কো থেকে বাসে করে প্রথমে সাকচী এবং তারপর সাকচী থেকে বাস পালটিয়ে আদিত্যপুরে আসতে হ'ত। দাদার ছেলে শুভ আর আমার ছেলে বিল্কুর গলায় গলায় ভাব ছিল। তবে টেল্কোর বাড়ী থেকে মাকে আনার সময় শুভ আর বিল্কুর মধ্যে তাদের ঠাম্মাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত। মনে আছে একবার মাকে টেল্কোর দাদার বাড়ী থেকে নিয়ে আসার সময় শুভ খুব কান্নাকাটি করছিল। সেই কথা মনে পড়ে আমি আর থাকতে পারলাম না। টেল্কো থেকে সাকচীতে এসে মনিকুন্তলা আর বিল্কুকে আদিত্যপুরের বাসে তুলে দিয়ে মাকে নিয়ে টেল্কো ফিরে এসে মাকে শুভর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে টেল্কো থেকে সাকচী হয়ে অনেক রাতে আদিত্যপুরে ফিরে এলাম।

মা টেল্কোর দাদার বাড়ী থেকে আমাদের আদিত্যপুরের বাড়ীতে এলে ভোরবেলায় আমাদের সাথে রেল লাইনের ধারে একটি খাটালে দুধ আনতে যেত। মাকে নিয়ে প্রতিবেশী একটি কোয়ার্টারে সর্ষে থেকে কলুর বদলের ঘানী টানা দেখতে যেতাম এবং সেখান থেকে নিজেদের সামনেই সর্ষে পেষা খাঁটি তেল নিয়ে আসতাম। বিল্কু আদিত্যপুর থেকে একটু দূরে কদমা-সোনারী লিঙ্ক রোডের কাছে দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা সমাজ (ডি বি এম এস) পরিচালিত স্কুলে পড়ত। আদিত্যপুরের মাখনুর উপর দায়িত্ব ছিল ওর রিক্সাতে করে বিল্কুকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং স্কুলের ছুটির পর ওকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার। সপ্তাহান্তে আমরা মাঝে মাঝে বিল্কুকে আদিত্যপুর থেকে মাখনুর রিক্সায় স্কুলে পাঠিয়ে সোনারীতে জয়ন্তদার বাড়ী চলে যেতাম। তখন মাখনু ওকে স্কুলের ছুটির পর ওর রিক্সাতে সোনারীর জয়ন্তদার বাড়ী

পৌঁছে দিত। একবার শহরে স্কুল কলেজ চলাকালীন একদিন হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ায় স্কুল কলেজে ছুটি হয়ে গেল। পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েরা স্কুল-বাসে বাড়ী ফিরে এল। অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা মাখনুর রিক্সায় বিল্কুর ফেরার অপেক্ষা করতে থাকলাম। চিন্তার কারণ, দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে মাখনুর রিক্সার আসার কথা। অবশেষে মাখনু অনেকক্ষণ পরে রিক্সা নিয়ে ফিরে এল। সহজেই অনুমেয়, ওর রিক্সায় বিল্কুকে না দেখে আমাদের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। তবে মাখনু আমাদের নিশ্চিন্ত করল। মাখনু ওর উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বিল্কুকে দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকার ভিতর দিয়ে আদিত্যপুরে না এনে সোনারীতে জয়ন্তদার বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল।

আমাদের কোয়ার্টারের কাছেই আর আই টি-র ম্যাথেমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এন কে সিন্হা থাকতেন। তাঁর কাছে আমার রিসার্চের ম্যাথেমেটিক্যাল অ্যানালিসিস সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর পেতাম। কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এন এন রে তাঁর ইউ এস এ ইউনিভার্সিটির পি এইচ ডি থিসিস আমাকে দেখিয়েছিলেন। (ইউনিভার্সিটির নাম মনে পড়ছে না।) প্রফেসার রে-র মাত্র একটি পেপারের উপর নির্ভয় করা পয়তাল্লিশ পৃষ্টার এত ছোট পি এইচ ডি থিসিস আগে কখন দেখিনি। আমার রিসার্চ পেপারের ম্যানুস্ক্রিপ্টের ইংরাজির 'কারেকশন' আর আই টি-র নিউ ক্যাম্পাসের আর আই টি-র ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার অশোক সেনগুপ্ত করে দিতেন। প্রফেসার অশোক সেনগুপ্তের নিউ ক্যাম্পাসের কোয়ার্টারে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিকরা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রী গৌরকিশোর ঘোষ। আমরা ছুটির দিনে ওল্ড ক্যাম্পাস থেকে নিউ ক্যাম্পাসে প্রফেসার অশোক সেনগুপ্তের কোয়ার্টারে বেড়াতে যেতাম। প্রফেসার সেনগুপ্ত বিল্কুর জন্য একটা ছড়ার বই লিখে বিল্কুকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বইটি যে কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছিনা। মণিকুন্তলার ওনার লেখা এই ছড়াটা মনে আছে—

'সিংহের ছা বাঘের ছানা
নাম রেখেছে বাংহ।
আলীপুরের চিড়িয়াখানায়

দেখতে গেলাম রঙ্গ।
বদ্যির ছা মণির ছানা
চোখ জুড়ানো অঙ্গ।
বিল্কু নামে আছেন জানা
বিহার থেকে বঙ্গ।'

সেই সময়ে আর আই টি-র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আই আই টি, দিল্লী থেকে পি এইচ ডি করে পুরন্দর ভট্যাচার্য্য জয়েন করল। ওল্ড ক্যাম্পাস লাগোয়া এম টাইপ ফ্ল্যাট পরিসরে ভাড়া বাড়ীতে থাকত। ওর কাছে জানতে পারলাম আই আই টি, দিল্লী-র প্রফেসার এম এস সোধা আমার পি এইচ ডি থিসিসের ভারতীয় এক্সটারনাল এক্সামিনার এবং তিনি অপেক্ষা করছেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমার থিসিসের ভাইভা-ভোসি বা মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাক পাওয়ার। কিন্তু যদিও প্রফেসার সোধা আমার পি এইচ ডি থিসিসের ভারতীয় এক্সটারনাল এক্সামিনার ছিলেন, আমার পি এইচ ডি ভাইভা-ভোসির পরীক্ষা নিয়েছিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং (বি ই) কলেজ, শিবপুরের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকম্যুনিকেশন ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার এস. এস. বড়াল।

পুরন্দর (সে দুষ্টু ছিল তো বটেই) আমাকে শেখাল কি করে পি এইচ ডি-র গাইডকে তুষ্ট—সোজা বাংলায়—'অয়েল' করতে হয়। পুরন্দর আমাকে বলল, 'ধর, তোমার গাইড তাঁর রুমে বসে আছেন আর তুমি সেই সময়ে তাঁর সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর টেবিলের উল্টো দিকে বসে ইচ্ছে করে তাঁর টেবিল থেকে তাঁর অলক্ষ্যে একটা দরকারি পেপার রুমের মেঝেতে ফেলে দিলে। এবার বল তোমার গাইডকে 'অয়েল' করতে তুমি কি করবে'? আমি উত্তর দিলাম, 'কেন, এত বড়ই সোজা। আমি সঙ্গে সঙ্গে মেঝে থেকে পেপারটি তুলে গাইডের হাতে তুলে দেব। গাইড খুশী হয়ে যাবেন।' দুষ্টু পুরন্দর আমার উত্তর শুনে হাসতে থাকল। পুরন্দর আমাকে বলল, 'তুমি ডাহা ফেল। এই কারণেই তোমার গাইডকে তুমি প্লিজ করতে পারনি আর তোমার থিসিস সাবমিট করার অনুমতি তিনি দেরী করে দিয়েছিলেন'। আমার তা হলে কি করা উচিত ছিল তা পুরন্দরের কাছে জানতে চাইলাম। পুরন্দর হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার উচিত ছিল চুপচাপ

বসে থাকা। তখন দেখতে তোমার গাইড বাধ্য হয়ে ঝুঁকে মেজে থেকে নিজেই পেপারটি তুলে নিচ্ছেন আর ঠিক সেই সময়ে তাঁকে তোমার ওনাকে বলা উচিত ছিল, স্যার, আমি ভাবতে পারছিনা কি করে আপনি চেয়ারে বসে বসেই মেজে থেকে পেপারটি তুলে নিলেন। আপনার বডি এতটা ফিট? আপনি কি বডি বিল্ডিং করেন? দেখতে, এবার তোমার গাইড তোমাকে বলতেন এত দেরী হচ্ছে কেন তোমার থিসিস জমা দিতে এবং থিসিসের ড্রাফট জলদি করে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যও বলতেন।' গাইডকে প্লিজ করার এমন দুষ্টু বুদ্ধি কি ভোলা যায়?

একবার আমি বিষ্টুপুরে এল আই সি আই-তে লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম জমা করার জন্য যাওয়ার সময় ওল্ড ক্যাম্পাসের দু'নম্বর রোডের সামনে একটা খোলা ম্যানহোলকে ঘিরে জটলা দেখতে পেলাম। জানতে পারলাম স্কুল ফেরতা একটি ছোট মেয়ে খোলা ম্যানহোলের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। পাশের সাইকেল রিপেয়ারের দোকানের একজন সহৃদয় মিস্ত্রি মেয়েটিকে তুলে আনার জন্য ম্যানহোলের মধ্যে নেমে মেয়েটিকে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে এল। আমার পকেটে আমার ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়ার জন্য টাকার ভরসা করে একজন সহৃদয় পথচারীকে সঙ্গে নিয়ে আমি একটা অটোরিকশা ভাড়া করে টিস্কোর মেইন হাসপাতালে অচৈতন্য মেয়েটিকে নিয়ে পৌঁছে গেলাম। আমার আর আই টি-র পরিচয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করলাম। (চুপি চুপি বলে রাখি, আমার পরিচয় এবং আর আই টি-র দাঙ্গাবাজ ছেলেদের দাপটের কথা মাথায় রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আমার হাসপাতালে আনা মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি না করার কোন উপায় ছিল না)। ওর পেট থেকে ড্রেনের নোংরা বের করা হল; ওর জ্ঞান ফিরে এল। সৌভাগ্যক্রমে মেয়েটির বাবা শ্রী দ্বারিকা প্রসাদ কোনও ভাবে খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন। ওনার মেয়েকে ওনাদের হাতে সমর্পণ করে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। অবশ্যই আমার লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম সেদিন আর জমা পড়ল না।

ছুটির দিনে আমরা সারা দিনের জন্য আর আই টি-র নিউ ক্যাম্পাসে প্রফেসার সেনগুপ্ত এবং প্রফেসার মহান্তির কোয়ার্টারে চলে যেতাম। ওল্ড ক্যাম্পাসের পান দোকান বাস স্ট্যান্ড থেকে বিষ্টুপুর থেকে আর আই টি

যাওয়ার স্টেট বাস পাওয়া যেত। আমাদের লাঞ্চ আর ডিনার প্রফেসার সেনগুপ্ত বা প্রফেসার মহান্তির বাড়ীতে হ'ত। সেনগুপ্ত স্যারের দুই মেয়ে সীমা আর নীপা আমরা গেলে খুব আনন্দ পেত। ডিনারের শেষে নিউ ক্যাম্পাসের বাস স্ট্যান্ডে প্রফেসার সেনগুপ্ত, তাঁর মেয়েরা এবং তাদের সাথে রাত আলো করা এক ঝাঁক জোনাকি পোকা ওল্ড ক্যাম্পাসে ফেরার জন্য আমাদের সি অফ করত। প্রফেসার সেনগুপ্ত তাঁর জীবনের নানা মজার গল্প বলতেন। নাগপুরে একটি কলেজে শিক্ষকতা করার সময় তাঁর এক বাঙালি সহকর্মী বন্ধুর গল্প তিনি করেছিলেন। সেই সময়ে রেল যাত্রায় নিজের বিছানাপত্র হোল্ডঅলে বিছিয়ে সিলিন্ড্রিকাল আকারে হোল্ডঅলটিকে মুড়ে নেওয়া হ'ত এবং রেলগাড়ীতে হোল্ডঅলটি খুলে হোল্ডঅলের উপরে বিছানো বিছানায় শুয়ে পড়তে হ'ত। বলা বাহুল্য, যাত্রা শেষে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে হোল্ডঅল খুলে হোল্ডঅল থেকে বিছানাপত্র বের করে নেওয়া হ'ত। গ্রীষ্মের অবকাশের পর কলকাতা থেকে রেলগাড়ীতে নাগপুরে ফিরে এসে বন্ধুটি বিছানাপত্র হোল্ডঅল থেকে আর বের করলেন না। ওনার খাটের উপর বিছানা সহ হোল্ডঅলটি পেতে রাখলেন এই অজুহাতে যে সামনের দুর্গা পূজা দেওয়ালির অবকাশে তো আবার তাঁকে নাগপুর থেকে কলকাতায় যেতে হবে। নানা কারণ দেখিয়ে তিনি বলতেন—এখানে আর থাকন যাইব না। যেমন একটা কারণ তিনি দেখালেন যে নাগপুরের লোকেরা জল খায়না, ওরা জল পান করে। তিনি একবার সেনগুপ্ত স্যারকে এসে বললেন—আমার চাদরটা যে আমার চাকরিটারে খাইল। ব্যাপারটা হল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ওনাকে বকেছেন কারণ তিনি নাকি অন্য সকলের মতন কলেজ পরিদর্শনে আসা কোন বিশিষ্ট ভিজিটারকে হাত জোড় করে নমস্কার করেননি। উনি কেন নমস্কার করেননি সেনগুপ্ত স্যার জানতে চাইলে তিনি বললেন যে তিনিও সকলের মতন নমস্কার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর হাত জোড়া চাদরের ভিতরে থাকাতে কেউ তাঁর নমস্কার দেখতে পান নি।

আমি একটা 'ভিকি' নামের ঝরঝরে সেকেন্ড হ্যান্ড মোপেড আর আই টি-র এক কর্মচারীর কাছ থেকে কিনলাম। এই মোপেডে করে আর আই টি-র ওল্ড ক্যাম্পাস থেকে নিউ ক্যাম্পাসে যাতায়াত শুরু করলাম। চলন্ত ভিকির পেছনের সীটে গার্ড না থাকাতে সেখান থেকে গড়িয়ে মনিকুন্তলা

আর বিল্কু একবার পড়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝেই আমার ভিকি মোপেডটি বিগড়ে যেত। তখন তাকে হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হ'ত। আমার এই কষ্ট দেখে আমার মাষ্টার মশাই প্রফেসার মহান্তির দুই ছেলে, রবি (রবীন্দ্রনাথ মহান্তি) এবং ওর চেয়ে দু'বছরের বয়সের ছোট ভাই রুনু (রঞ্জিত মহান্তি), খুব দুঃখ পেয়েছিল। মহান্তি বৌদির কাছে শুনলাম একদিন রাতে রবি ভাই রুনুকে বলছে—তোকে আমি 'বড় হয়ে' একশ খানা সুভেগা কিনে দেব। সেই সময়ে 'সুভেগা' নামের মোপেড বা অটো-সাইকেল বাজারে খুব চলত। এতগুলি সুভেগা কেন জানতে চাইলে রবি রুনুকে বলল—সুভেগা খারাপ হয়ে গেলে আর আই টি থেকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আদিত্যপুরে রিপেয়ার করা কষ্টকর। তাই একটা খারাপ হয়ে গেলে সেটা ফেলে দিয়ে আরেকটা নিয়ে নিবি। 'বড় হয়ে' সংযোগবশত দুই ভাই সুবিখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল ইঙ্গিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সুবিখ্যাত প্রফেসার এবং হেড অফ ডিপার্টমেন্টও হয়েছে—রবি এন আই টি, জামশেদপুরে যার আগের নাম ছিল আর আই টি, জামশেদপুর; এবং রুনু আই আই টি, বি এইচ ইউ, বেনারসে। সংযোগবশত এই দুটি প্রতিষ্ঠানে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

প্রফেসার মহান্তির মেয়ে খুকু (নীলিমা) পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল। খুকু জামশেদপুরের সেক্রেড হার্ট কনভেন্টের ফার্স্ট গার্ল ছিল। এক রবিবার ছুটির দিনে পুরুলিয়া থেকে সেখানকার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও খনির মালিক শ্রী শশাঙ্ক শেখর সিন্হা তাঁর ইউ এস এ-র ওহিয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটি-তে পোষ্টডক্টরাল পদে কর্মরত ব্রিলিয়েন্ট ছেলে ডঃ অমরেন্দ্র সিন্হার সাথে খুকুর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, প্রায় বিনা নোটিসে, খুকুর বয়সী তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, স্যারের কোয়ার্টারে চলে এলেন। এসেই তিনি বললেন যে ওনারা স্যারের পরিবারের সাথেই লাঞ্চ করবেন স্যারের বাড়ীতেই এবং তিনি তাঁদের আপ্যায়নের কোন রকম আতিশয্য না করার অনুরোধ করে বাড়ীর সবার জন্য যা রান্না হবে তাই সবাই ভাগ করে খাবার কথা বললেন। বৌদির নির্দেশে সবার আড়ালে আমি এক ডজন ডিম কিনে আনলাম। ডাল, ভাত, তরকারি আর ডিমের ঝোল রান্না হল। স্যারের দেশের বাড়ী পুরুলিয়ার কাছেই এবং মেধাবী অমরেন্দ্রর নাম স্যারের অজানা ছিল না। অমরেন্দ্রর বাবা আলাদা করে খুকুর 'মেয়ে-দেখা' করলেন না। ছেলে কি

মেয়েকে দেখবে না স্যারের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে তাঁর ছেলে স্যারের মেয়েকে বিয়ের পিড়িতে দেখবে। তবে খুকুর বিয়ের দিন এক সাসপেন্স—রাত পেরিয়ে ভোর হতে চলল, বর ও বরযাত্রীদের দেখা নেই। অনেক নিমন্ত্রিতরা খাওয়া দাওয়া করে বিয়ে না দেখেই চলে গেলেন। স্যার উৎকণ্ঠায় শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টোরকীপার নন্দ কিশোর বাবু পুরুলিয়ায় চলে গেলেন খবর আনতে। অবশেষে সব উৎকণ্ঠার শেষ হল—ইউ এস এ-র ওহিয়ো থেকে পুরুলিয়ায় গিয়ে বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে জামশেদপুরে বিয়ের আসরে আসতে যদিও অমরেন্দ্রর দেরী হয়ে গেল, বিয়ের রিচুয়াল অমরেন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। রূপকথার গল্পের মতন খুকুর বিয়ের প্রত্যেকটা মুহূর্ত মনে পড়ে যায়।

সেই সময় রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর আর আই টি নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু আমাদের স্যালারি বা বেতন আমরা অনিয়মিত ভাবে পেতাম। আমাদের মতন আর আই টি-র টিচিং এবং নন-টিচিং কর্মচারীরা যারা শুধু বেতনের উপর নির্ভরশীল তাদের ধার দেনা করতে হ'ত। আমি আদিত্যপুরে আমাদের বাড়ীর কাছে বড়-সড় একটা মুদির দোকান থেকে মাসকাবারি জিনিষপত্র কিনতাম। দোকানদার শ্রী আগরওয়াল হিন্দিভাষী ছিলেন কিন্তু খুব ভাল বাংলা বলতে পারতেন। আমার সাথে বেশ ভাব করে নিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল যে আমি আর আই টি-র প্রফেসার বলে তিনি আমাকে খুব সম্মান করেন। আমি ঐ দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করার পর লজ্জার মাথা খেয়ে দোকানে ঢুকে দোকানদারকে ধারে জিনিষপত্র দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। দোকানদার শ্রী আগরওয়াল আমাকে দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে তাঁর পক্ষে আমাকে ধারে জিনিষপত্র দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ আর আই টি-র কর্মচারীরা কবে বেতন পাবে তার কোন ভরসা নেই।

আমাদের অধীনে কর্মরত আর আই টি-র নন-টিচিং কর্মচারী শ্রী ভরত ওল্ড ক্যাম্পাসে ওর নিজের কোয়ার্টারে একটা মুদির দোকান দিয়েছিল। শ্রী ভরত আমাকে ওর দোকান থেকে মাসকাবারি জিনিষপত্র কেনার জন্য আগে অনেক অনুরোধ করেছিল। কিন্তু আমি শ্রী ভরতের দোকান থেকে শ্রী আগরওয়ালের দোকানকে প্রেফারেন্স দিয়েছিলাম। এবার ঠিক করলাম

ভরতের দোকানে গিয়ে ওকে অনুরোধ করব যদি ও আমাকে ধারে মাসকাবারি জিনিষপত্র দেয়। শ্রী ভরতের দোকানে যাওয়ায় শ্রী ভরত এবং ওর স্ত্রী আমাকে কোথায় বসাবে, কি ভাবে আপ্যায়ন করবে এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ইতস্তত করে শ্রী ভরতকে ওর দোকান থেকে ধারে মাসকাবারি জিনিষপত্রের কথা তুলতেই শ্রী ভরত বলল যে ওরাও অর্থাৎ নন-টিচিং কর্মচারীরাও আমাদের অর্থাৎ টিচিং কর্মচারীদের মতন বেতন অনিয়মিত ভাবে পাচ্ছে। সেই মুহূর্ত কি ভোলা যায় যখন শ্রী ভরত বলল— স্যার, ক্যা সৌভাগ্য হৈ কি আপ হমারে ঘর পধারে হৈঁ। ইয়হ আপ হী কী দুকান সমঝেঁ। আপকো জো ভী সামান চাহিয়ে মৈঁ আপকে ঘর পহুঁচা দুঁগা। পৈসে তনখ্বাহ মিলনে পর দীজিয়েগা।

আর আই টি-তে একবার সুযোগ এসে গেল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লেকচারারদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদে উন্নীত হওয়ার। সেই সময়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমার আর প্রফেসার ললিত কিশোরের ছাড়া কারুর ডক্টরেট ডিগ্রী ছিল না। ললিত কিশোর স্যার তো ইতিমধ্যেই প্রফেসার ছিলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদের জন্য ন্যূনতম শৈক্ষিক যোগ্যতা ছিল ডক্টরেট ডিগ্রী। আমাদের ডিপার্টমেন্টে সহকর্মী শিক্ষকরা আমার চেয়ে সীনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ডক্টরেট ডিগ্রী না থাকার দরুন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদের জন্য আবেদন করতে পারলনা। আমি আবেদন পত্র জমা দিলাম। ইন্টার্ভিউ হয়ে গেল। যারা যারা কৃতকার্য হলেন কানাঘুসায় তাদের নাম শোনা গেল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক শ্রী শিব প্রসাদ সিংহ-এর দাদা, যিনি বিহার সরকারের পুলিস বিভাগ থেকে রিটায়ার করে মাঝে মাঝে এসে ওল্ড ক্যাম্পাসে ভাইয়ের বাড়ীতে এসে থাকতেন এবং যার জ্যোতিষ শাস্ত্র (অ্যাস্ট্রোলজী) হবি ছিল, জন্মক্ষণ দেখে বলে যেতে থাকলেন কারা কারা ইন্টার্ভিউ–তে কৃতকার্য হয়েছেন। আমি যে অ্যাস্ট্রোলজী অনুযায়ী ইন্টার্ভিউ–তে কৃতকার্য হয়েছি তা তিনি নিশ্চিত ভাবে বলে দিলেন। এদিকে ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফল বের হতে দেরী হতে লাগল এবং শুনতে পেলাম কারু একজনের রিপ্রেসেন্টেশনের ফলে আদালতের স্টে-অর্ডার আদেশে নাকি ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফল বাতিল হয়ে গেছে। সবাই শ্রী শিব প্রসাদ সিং-এর দাদার ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করলেন। কিন্তু দাদা সবাইকে

বললেন ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ছিল না, ছিল অ্যাস্ট্রোলজীর।

ঠিক এই সময়ে সি এস আই আর-এর সি রি, পিলানীতে (সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিট্যুট) ভ্যাকেন্সি বের হল। আমি সাইন্টিস্ট 'বি' পদের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম। আমার পি এইচ ডি-র গাইড এন বি সি স্যার আমাকে সি রি, পিলানীতে তদানীন্তন সি রি-র ডাইরেক্টর পদ্মভূষণ ডঃ অমরজিৎ সিং-এর সাথে কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। (শ্রদ্ধেয় অমরজিৎ সিং-এর উপর আমার লেখা একটি প্রবন্ধ জানুয়ারি ২০২১ সালের সি রি-র নিউজ লেটারে প্রকাশিত হয়েছে)।

সি রি, পিলানী-তে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাবার পর শ্রী শিব প্রসাদ সিং-এর দাদার কাছে জানতে চাইলাম অ্যাস্ট্রোলজী অনুযায়ী আমি সি রি, পিলানী জয়েন করব কিনা। দাদা অ্যাস্ট্রোলজীর গণনার জন্য আমার কাছে কিছু সময় চাইলেন। এর পর দাদা আমাকে খুঁজে পেলেন পান দোকান বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটা সেলুনে যেখানে আমার চুল কাটা হচ্ছিল। সেলুনের বাইরে থেকে দাদা আমাকে চিৎকার করে বললেন—বাসু সাহাব, আপ সি রি, পিলানী জয়েন কর রহে হৈঁ। আমি ওনাকে বললাম—আপনি তো বলেছিলেন আমি আর টি, জামশেদপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদে জয়েন করব যা হল না ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফল বাতিল হওয়ার জন্য, আর এখন বলছেন যে আমি সি রি, পিলানী জয়েন করব। এই সংক্রান্ত ঘটনা এরপর যা কিছু ঘটেছিল তা পরবর্তী অধ্যায় পর্যন্ত সাসপেন্সে রেখে এই অধ্যায় সমাপন করছি শ্রী শিব প্রসাদ সিং-এর দাদার নিজের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তাঁরই নিজের কথা দিয়ে—মৈঁ নহীঁ বোল রহা হূঁ, ইয়হ তো অ্যাস্ট্রলজী বোল রহী হৈ।

# চরৈবেতি-চরৈবেতি

মাকে নিয়ে দিল্লী হয়ে পিলানীর পথে রওনা হলাম সি এস আই আর-এর সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সটিট্যুট (সি রি), পিলানীতে সাইন্টিস্ট 'বি' পদের জন্য ইন্টার্ভিউ দিতে। দিল্লীতে মা আর আমি দিল্লী কালীবাড়ীর যাত্রী ও ভ্রমনার্থীর বিনামুল্যে বা স্বল্প মুল্যে থাকার ডর্মিটারিতে উঠেছিলাম। মাকে নিয়ে কালীবাড়ীর কাছে বিড়লা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দর্শন করেছিলাম। এরপর মাকে কালীবাড়ীর ডর্মিটারিতে রেখে ওল্ড দিল্লী রেল স্টেশনের কাছে কাশ্মীরীগেটের অন্তর্দেশীয় বাস আড্ডা থেকে হরিয়ানা রাজ্যের বাসে করে হরিয়ানার বর্ডার পেরিয়ে রাজস্থানের সি রি, পিলানী ইন্টার্ভিউ দিতে পৌঁছুলাম। আমার পি এইচ ডি বিষয়ে তাঁর নিজের বিশেষ ইন্টারেস্ট থাকাতে ইন্টার্ভিউ বোর্ডে বেশীরভাগ প্রশ্ন ইন্সটিট্যুটের ডাইরেক্টর অমরজিৎ সিং নিজেই করলেন। পিলানী থেকে ইন্টার্ভিউ দিয়ে দিল্লীতে ফিরে এসে মাকে নিয়ে আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন ঘুরে এলাম। আগ্রার তাজমহল—একবার দিনের বেলায় আর একবার রাতের বেলায় (তখন ছিল পূর্ণিমার রাত)—দেখে এবং মথুরা ও বৃন্দাবন তীর্থ করে মা প্রভূত আনন্দ পেল। আর সেই আনন্দের প্রসাদ আমিও পেলাম।

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। আমি সি রি, পিলানীতে সাইন্টিস্ট 'বি' পদে সিলেক্টেড হলাম। আর আই টি থেকে লিয়েন (চাকরী বজায় রেখে ছুটি) না পাওয়ায় রেজিগনেশন (ইস্তফা) দিয়ে মণিকুন্তলা আর ছেলে বিল্কুকে নিয়ে জামশেদপুরের টাটানগর রেল স্টেশন থেকে অমৃতসর এক্সপ্রেসে দিল্লী হয়ে রাজস্থানের পিলানীর পথে অনেক মালপত্র, লাগেজ নিয়ে রওয়ানা হলাম। আর আই টি-র সহকর্মী ভাতৃসম প্রফেসার আর কে চৌধুরী আমাদের আশীর্বাদ করে আমার পকেটে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন। দিল্লী রেল স্টেশনে আমার স্কুলের ক্লাসমেট ভানুর স্ত্রী নীলার দাদা আমাদের রিসিভ করে ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। সেখানে রাত্রিবাস করে পরের দিন কাশ্মীরী-গেটের অন্তর্দেশীয় বাস আড্ডা থেকে সকাল বেলায়

বাসে করে আমরা পিলানীর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। বিকেলের মধ্যে প্রায় দু'শ কিলোমিটার দূরত্বে পিলানী পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু পনেরো-ষোলো কিলোমিটার যাওয়ার পর আমাদের বাস খারাপ হয়ে গেল। বাস গ্যারেজে নিয়ে ঠিক করার চেষ্টা হল। কিন্তু বাস মেরামত করা গেল না। অনেকেই ফিরতি বাসে দিল্লী ফিরে গেল। বাসে পিলানীর বিড়লা ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজি অ্যান্ড সায়েন্স (বি আই টি এস)-এর ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরিচয় হল। আমি যে হেতু আর আই টি-র শিক্ষক ছিলাম আমাকে ছেড়ে তারা দিল্লী ফিরে গেল না। আমাদের পিলানী নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তারা নিয়ে নিল। তাদের মধ্যে দু'জন দিল্লী গিয়ে আমাদের জন্য কাশ্মীরীগেটের অন্তর্দেশীয় বাস আড্ডা থেকে বাস নিয়ে এল। আমাদের মালপত্র এক বাসের ছাদ থেকে অন্য বাসে স্থানান্তরিত করা হল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বাসটিও কিছু দূর গিয়ে খারাপ হয়ে গেল। আমাদের পিলানী পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত পোহাল ও প্রায় ভোর হয়ে এল। ইনব্যাফেলের প্রাক্তন ছাত্র সি রি, পিলানীর সিনিয়ার সায়েনন্টিস্ট ডঃ জি এস সিধু-র কোয়ার্টারে প্রথমে আমাদের ওঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আমার ইনব্যাফেলের ক্লাসমেট সি রি, পিলানীর সায়েনন্টিস্ট দিলীপ পাইনের দু-রুমের ওল্ড হস্টেল একোমোডেশনে উঠেছিলাম। দিলীপ অবিবাহিত ছিল এবং ও পিলানীতে একাই থাকত। আমাদের সুবিধার্থে দিলীপ ওর অত্যন্ত কাছের বন্ধু সি রি, পিলানীর ওয়ার্কশপের শ্রী এ কে মুখার্জীর কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিল। দিলীপ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ ও ভেবেছিল যে আমাকে বরাদ্দ নিউ হস্টেলের এক রুমের একোমোডেশনে প্রথম প্রথম আমাদের অসুবিধা হবে। অবশ্য এর কিছু দিন পরে আমি আমার এক রুমের একোমোডেশনে শিফ্ট করেছিলাম। ক'দিন আগে আমি যখন সি রি, পিলানীতে লেকচার দিতে গিয়েছিলাম, মণিকুন্তলা আর আমি আমাদের স্মৃতিভরা সেই এক রুমের একোমোডেশন আবার দেখে এলাম।

দিল্লী থেকে পিলানীর স্মরণীয় সেই বাস জার্নির শেষে পিলানীর বাস স্ট্যান্ড থেকে আমাদের সহযাত্রী বি আই টি এস-এর ছাত্রছাত্রীরা একটা সাইকেল রিক্সায় আমাদের তিনজনকে মণিকুন্তলার 'মূল্যবান' জিনিষে ভরা স্যুটকেস সহ সি রি, পিলানীর ওল্ড হস্টেলের দিকে রওয়ানা করে দিল।

তাদের নির্দেশে বাকী জিনিষপত্র নিয়ে সাত-আট টা সাইকেল রিক্সা আমাদের পিছু-পিছু এল। আমাদের রিসিভ করার জন্য দিলীপ সেই রাতে ওল্ড হস্টেলেই ছিল। আমাদের বই-পত্র, জামা কাপড় সহ সমস্ত জিনিষপত্র—এমন কি আমাদের ব্যবহৃত ইলেকট্রিক বাল্বগুলি পর্যন্ত—ঠিকঠাক 'সহী সলামত' পৌঁছে গিয়েছিল। দিল্লী থেকে বাসে করে রাজস্থানের পিলানী যাওয়ার পথে হরিয়ানাতে ঢুকতেই সত্তর দশকের সেই সময়ে চারিদিকে ধূধূ মরুভূমি দেখতে পাওয়া যেত। সে কথা এখন দিল্লী থেকে পিলানী যাওয়ার পথে চারিদিকে সবুজ আর শস্য শ্যামলা দেখে বিশ্বাসই করা যাবে না। সেই সময়ে অবশ্য বি আই টি এস এবং সি রি লাগোয়া সবুজ ক্যাম্পাস দুটি যেন মরুভূমিতে মরূদ্যান ছিল। এও শুনেছি যে সেই সময়ে বর্ষাকালে আকাশ থেকে কি ভাবে বৃষ্টির নেমে আসে তা দেখতে রাজস্থান থেকে ছোটো ছেলেমেয়েদের দিল্লীতে নিয়ে আসা হত। কিন্তু এখনতো জলবায়ুর পরিবর্তনে বর্ষাকালে রাজস্থান বন্যায় ভেসে যায়।

অবশেষে আর আই টি-র সহকর্মী শ্রী শিব প্রসাদ সিং-এর দাদার অ্যাস্ট্রোলজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমানিত করে আমি সি রি, পিলানী জয়েন করলাম। যদিও তখন পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যে আমি আর টি, জামশেদপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদে জয়েন করব তার সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষায় রইল। ছয়-সাত মাস হয়ে গেল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফল বের হল না। শুনে তো এসেছিলাম যে আইনগত প্রক্রিয়ায় (বৈধ উপস্থাপনায়) (একজনের রিপ্রেসেন্টেশনের ফলে কোর্টের স্টে-অর্ডার আদেশে) না কি ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফল বাতিল হয়ে গেছে।

আমি সি রি-তে আমার কাজ শুরু করলাম ভ্যাকুয়াম ট্যুব ডিভিশনে। আর আই টি থেকে এক অন্য জগতে চলে এলাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমি এ রকম এক ঝাঁ-চকচকে ল্যাবে কাজ করছি। আমি ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুব (একটি ভ্যাকুয়াম ইলেকট্রন ডিভাইস—এক ধরণের মাইক্রোওয়েভ অ্যামপ্লিফায়ার) ডেভেলপ করার প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হলাম। ডিভাইসটির প্রয়োগ হয় ইলেকট্রিক্যাল কম্যুনিকেশন, রাডার, এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমে। আমাদের প্রজেক্ট লীডার শ্রী শ্রীনিবাস জোশী আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে উঠলেন। সি রি-তে আমার সাথে সলিড ষ্টেট

ডিভিশনে ডঃ চন্দ্র শেখর জয়েন করেছিলেন। তিনি এবং ভ্যাকুয়াম ট্যুব ডিভিশনের শ্রী এইচ এন বন্দ্যোপাধ্যায় সি রি-তে কম্প্যুটার-এইডেড ডিজাইন সম্বন্ধে চিন্তাধারা শুরু করেন। মাইক্রোওয়েভ ট্যুবের থিয়োরি সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি এবং ডঃ জি এস সিধু আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ক্লাইস্ট্রন এবং কারসিনোট্রন প্রস্তুত করেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সুপারভিশনে বি এইচ ইউ-তে পি এইচ ডি-র জন্য রেজিস্টার্ড ছিলেন। আমি তাঁকে পি এইচ ডি থিসিস জমা করতে বলেছিলাম। নানা কাজের চাপে তিনি তা করতে পারেন নি। ডঃ চন্দ্র শেখর সি রি, পিলানীর ডাইরেক্টার হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সি এস আই আর-এর অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইনভেটিভ রিসার্চের চ্যান্সেলার। তিনি এবং জোশীজী আমাদের দেশে মাইক্রোওয়েভ ট্যুবের প্রয়োজনের রূপরেখা প্রস্তুত করেন। তার হাত ধরেই সি রি, পিলানী-তে ডঃ এ কে সিন্হা এবং জোশীজী জাইরোট্রন ল্যাব স্থাপনা করতে পেরেছিলেন। আমার ডঃ অমরজিৎ সিং-এর উপর লেখা রচনাটি লিখতে আমি ডঃ চন্দ্র শেখর এবং জোশীজীর অনেক সাহায্য নিয়েছিলাম। ডঃ চন্দ্র শেখর এবং জোশীজীর বদান্যতায় আমি বি এইচ ইউ থেকে সেবানির্বৃত্তির পর, শুধু বি এইচ ইউ নয়, সি এস আই আর - সি রি, পিলানী থেকেও 'ফেয়ারওয়েল' দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলাম ।

পরে আমার এবং ডঃ এ কে সিন্হার প্রচেষ্টায় জোশীজী (শ্রীনিবাস জোশী) ডক্টরেট ডিগ্রী পান। আমরা ভ্যাকুয়াম টিউব ডিভিশনের সাথে যুক্ত ছিলাম এবং ডঃ এস এস এস আগরওয়ালা (যিনি 'ট্রিরপ্ল-এস' নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন) আমাদের ডিভিশনের হেড ছিলেন। (উল্লেক্ষ্য, আমার লেখা একটি বই ট্রিরপ্ল-এস-কে উৎসর্গিত)। ট্রিরপ্ল-এস লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অফ মেম্বারশিপ অফ দি ইম্পিরিয়াল কলেজ (ডি আই সি) এবং লন্ডন ইউনিভার্সিটির পি এইচ ডি (মাইক্রোওয়েভ) ডিগ্রী পান। সি রি-তে ডিসিপ্লিন এবং নিয়মানুবর্তিতার আরেক নাম ছিল ট্রিরপ্ল-এস। সবাই তাঁকে সমীহ করে চলতেন। ভ্যাকুয়াম ইলেকট্রন ডিভাইসের উপযোগী ম্যাটেরিয়াল ও ইক্যুইপমেন্ট কোথায় এবং কি ভাবে পাওয়া যেতে পারে তা তিনি নিমেষে বলে দিতে পারতেন। আর পারচেসের নিয়ম কানুন ছিল তাঁর নখদর্পণে।

ট্রিরপ্ল-এস আমাকে ট্রাভেলিং-ওয়েভ ট্যুবের একটি কম্পোনেন্টের ডাইমেনশন জানতে চাইলেন এবং তার জন্য একটা ফর্মুলা দিলেন যেখানে মডিফাইড বেসেল ফাংশানের ভ্যালু ব্যবহার করতে হয়। তিনি আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিলেন। কিন্তু আমি ওনাকে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কম্পোনেন্টটির ডাইমেনশন জানালাম। তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং ওই ফর্মুলাটির বিশদ জানার জন্য, আমার অনুরোধে, তিনি আমাকে জার্নালে প্রকাশিত একটি রিসার্চ পেপারের কপি দিলেন যার লেখক ছিলেন ডঃ ডি টি সুইফফ্ট-হুক। এই পেপারটি আমার সামনে রিসার্চের দিগন্ত বিস্তৃত করে দিল।

ডঃ সুইফফ্ট-হুক ছিলেন লন্ডনের সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেটিং বোর্ডের হেড এবং কিংগস কলেজের ভিজিটিং প্রফেসার। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে আমার ল্যাঙ্কাস্টারে থাকাকালীন ডঃ ডি টি সুইফফ্ট-হুক (ডোনাল্ড সাহেব) আমার সম্মানে লন্ডনের এক রেস্টুরেন্টে ডিনারের আয়োজন করেছিলেন। আমি সেই সময় আমার পিসতুতো বোন, রেণু পিসীর মেয়ে রুমির (চিত্রা ভৌমিক দত্ত) ইস্ট লন্ডনের ফারক্রফ্ট রোডের বাড়ীতে ছিলাম। রুমিদের পাড়ায় বেশীরভাগ বাসিন্দা ইংল্যান্ডের বাইরে থেকে এসে বাসা বেঁধেছিলেন। নতুন আগন্তুক কোন 'খাঁটি' ইংরেজকে (সাহেবকে) পাড়ার লোকেরা বিরক্ত করবে ভেবে, রুমির স্বামী—ওখানকার বাঙালী মহলের জনপ্রিয় অম্বিকাদা (অম্বিকা প্রসাদ দত্ত)—টেলিফোনে ডোনাল্ড সাহেবকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে অম্বিকাদাই আমাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সাহেব ঐ প্রস্তাবে রাজী হলেন না এবং রুমিদের বাড়ীতে তাঁর সাত ফুট লম্বা শক্তিশালী এক নিগ্রো বডিগার্ডের সঙ্গে নিজেই তাঁর 'বিশেষ অতিথি'কে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। আমি ইংরাজি আদব কায়দায় অভ্যস্থ নই বলে সাহেবকে রুমি পরামর্শ দিল যে তিনি যেন আমাকে কোন একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান। আমি যে 'কোল্ড-ড্রিংক' ছাড়া অন্য কোন ড্রিংক নিই না সে কথাও রুমি সাহেবকে জানিয়ে দিল। ডোনাল্ড সাহেব রুমির ছেলে রিন্টুর কাছ থেকে জেনে নিলেন লন্ডনের সব চেয়ে নামী ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের ঠিকানা। সেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে তাঁর আবদার রেস্টুরেন্টের মালিক যেন তাঁর বিশেষ অতিথির সম্মানে উপস্থিত

থাকেন। রেস্টুরেন্টের মালিককে খবর দেওয়াতে উনি হন্তদন্ত হয়ে চলে এলেন। ডোনাল্ড স্যার চাইলেন আমি খাবারের সব আইটেম টেস্ট করে আমার পছন্দ মতন খাবার খাই। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের মালিক বাঙ্গালী ছিলেন। আমরা স্যারকে সব আইটেম অর্ডার করা থেকে বিরত করলাম। ডঃ সুইফট্-হুক সাহেবের ঐ রেস্টুরেন্টে আগমনকে কভার করার জন্য একটি নিউজ পেপারের প্রতিনিধিরা এলেন। তখন জানতে পারলাম যে ডঃ সুইফট্-হুক সাহেবের আমাকে সম্মান দেওয়ার কারণ আমি নাকি আমার রিসার্চ পাবলিকেশনে ডঃ সুইফট্-হুক সাহেবের পেপার পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী রেফার করেছি। পরবর্তী কালে ডঃ ডি টি সুইফট্-হুকের পরামর্শে আমি অনেক রিসার্চের কাজ করেছি। এখনও তিনি আমার সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছেন। তাঁর স্ত্রী মার্গট ক্রিশ্চান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সারে, লন্ডনে একটি সিদ্ধ যোগ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সি রি, পিলানীতে আমার সাইন্টিস্ট 'বি' পদে কাজ করার সময়কার কথা লিখতে গিয়ে ডঃ ডি টি সুইফট্-হুকের আরো অনেক কিছু কথা লেখা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ার আগেই আবার সি রি, পিলানী প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। একবার ইসরো, ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসে আমাদের ল্যাব ডাইরেক্টর ডঃ অমরজিৎ সিং আমাদের জানালেন যে আমাদের বানানো ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুবের পারফর্মেন্স রেজাল্টের ভিত্তিতে ইসরো আমাদের একটা প্রজেক্ট দিতে উৎসুক। তার আগে আমাদের ট্যুবের একটি পারফর্মেন্স প্যারামিটার যথা এ-এম-টু-পি-এম কনভার্সন কোএফিসিয়েন্টের এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু তাদের জানাতে হবে। আমাদের প্রজেক্ট লীডার জোশীজী বা আমি এর আগে এই প্যারামিটারের নাম শুনিনি। আমাকে দেখিয়ে ডঃ অমরজিৎ সিং আমাদের ডিভিশনের হেড ট্রিরপ্ল-এসকে বললেন ডঃ বসু এই প্যারামিটারের এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু জানাবেন। এরপর এই প্যারামিটার মাপার নিয়ম সংক্রান্ত কিছু পেপার ট্রিরপ্ল-এস আমাকে দিলেন। প্রায় দিন দশেকের প্রচেষ্টায় জোশীজী আর আমি মাইক্রওয়েভ বেঞ্চ সেট আপ তৈরি করে আমাদের বানানো ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুবের উদ্দিষ্ট প্যারামিটের এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু বের করে ফেললাম। ট্রিরপ্ল-এস আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল মেজারমেন্ট দেখে খুব খুশী হয়ে ডাইরেক্টর ডঃ

অমরজিৎ সিংকে আমাদের সাফল্যের কথা জানালেন। ঠিক হল ডঃ সিং ল্যাব ভিজিটে নিজে এসে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট দেখবেন। ইতিমধ্যে আমাদের মেজারমেন্টকে আরও পারফেক্ট করার আরেকটা পদ্ধতি আমি চেষ্টা করতে চাইলাম। কিন্তু জোশীজী ইতস্তত করল এবং ট্রিরপ্ল-এস-এর অনুমতি ছাড়া নতুন কোন পরীক্ষা করতে রাজী হল না। কিন্তু এক উইক-এন্ডে শনি আর রবিবারের ছুটির দিন দু'টিতে, জোশীজী বা ট্রিরপ্ল-এস-কে না জানিয়ে, আমি নতুন পদ্ধতিতে মেজারমেন্টকে আরও পারফেক্ট করতে পারলাম। কিন্তু জোশীজী ঘাবড়ে গেল কারণ আমি বিনা অনুমতিতে নতুন এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ বানিয়ে ল্যাবের ডিসিপ্লিন ভেঙেছি। পরবর্তী সোমবার সকালে ট্রিরপ্ল-এস ভুরু কুঁচকিয়ে ল্যাবে গিয়ে নতুন পদ্ধতিতে আমার মেজারমেন্ট দেখলেন। তারপর তিনি আমাকে তাঁর চেম্বারে ডাকলেন। জোশীজী বুঝে গেল ডিসিপ্লিন ভাঙার জন্য ট্রিরপ্ল-এস আমাকে এক চোট নেবেন। জোশীজী আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার পিছু পিছু ট্রিরপ্ল-এস-এর চেম্বারে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ট্রিরপ্ল-এস জোশীজীকে চলে যেতে বললেন। তারপর শুরু হল ল্যাবের ডিসিপ্লিন ভাঙার জন্য বকা-ঝকা। উনি আমাকে জানিয়ে দিলেন ওখানে নাকি ইউনিভার্সিটির নিয়মে আমি চলতে পারিনা। কিন্তু এর পর আমার জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। তিনি নিজের সিট থেকে উঠে আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে আমাকে নতুন পদ্ধতিতে এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ বানানোর জন্য অভিনন্দন জানালেন। ডঃ সিং ল্যাব ভিজিটে এসে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে ট্রিরপ্ল-এস-কে বললেন— বলেছিলাম না ট্যুবের এ-এম-টু-পি-এম কনভার্সন কোএফিসিয়েন্টের এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু ডঃ বসু আমাদের বের করে দেবেন।

ট্রিরপ্ল-এস শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন না, তিনি ল্যাব এডমিনিসট্রেশনের (পারচেজ সহ) নিয়ম-কানুনে এক্সপার্ট ছিলেন। এডমিনিসট্রেশনের কোনও সমস্যায় ডাইরেক্টর, এডমিনিসট্রেটিভ অফিসার থেকে আরম্ভ করে ইন্সটিট্যুটের সবাই ট্রিরপ্ল এস-এর শরণাপন্ন হতেন। চেম্বারে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হত তাঁর সেক্রেটারির মাধ্যমে। কিন্তু বিশেষ দরকারে আমি অবাধে তাঁর চেম্বারে চলে যেতাম। একদিন আশে পাশের সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে তিনি আমাকে

ইন্সটিট্যুটে ঢোকার কাচের দরজা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখালেন। দিনের বেলায় বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ট্রিরপ্ল-এস বললেন—এটা হল মরুভূমির ঝড়। এ দৃশ্য সব সময় দেখা যায় না।

ট্রিরপ্ল-এস-এর আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন এমন অনেকের ধারণা ছিল। ল্যাবের ফটোগ্রাফার শ্রী ডি জে রায় এই নিয়ে একটা গল্প সবাইকে শোনাতেন। গল্পটা সি রি-তে ফিল্মস ডিভিশন অফ ইন্ডিয়ার টীমের সি রি-র উপর একটা ডক্যুমেন্টারি ফিল্ম বানানোকে কেন্দ্র করে। শ্রী ডি জে রায় এবং ওনার 'হ্যাডলি-চেস-তুত' দাদা ট্রিরপ্ল-এস—যারা নিজেদের মধ্যে হ্যাডলি চেসের বই আদান-প্রদান করতেন—সি রি-র তরফ থেকে ভ্যাকুয়াম টিউব ডিভিশনে ফিল্মস ডিভিশন অফ ইন্ডিয়ার টীমের সাথে ছিলেন। যদিও আমি মাফ্ল ফারনেস নিয়ে কাজ করি না, ট্রিরপ্ল-এস ফারনেসের সামনে আমার ফিল্ম তোলাচ্ছিলেন। মেঝেতে রাখা এক্সটেনশন বোর্ডের প্লাগ লুস হওয়াতে মাঝে মাঝে ফিল্ম তোলায় বাধা পড়ছিল। আমার ফিল্ম তোলার সময় শ্রী ডি জে রায় ট্রিরপ্ল-এস-কে প্রথমে দেখতে পেলেন না। কিন্তু পরে দেখতে পেলেন ট্রিরপ্ল-এস মেঝেতে শুয়ে এক্সটেনশন বোর্ডের প্লাগটা চেপে আছেন যাতে আমার ফিল্ম তোলায় কোন বাধা না পড়ে। গল্পটিতে কিছুটা সত্যি ছিল আর বাকিটা শ্রী ডি জে রায়-এর অতিরঞ্জন ছিল।

আমার যে অ্যানালিসিসের ভিত্তিতে ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুবের হেলিক্যাল স্ট্রাকচার ডিজাইন করা যায় তার উপর ইন্টারনাল রিপোর্ট লেখার জন্য ট্রিরপ্ল-এস আমাকে আহ্বান জানালেন। আমার ম্যানুস্ক্রিপ্টে ট্রিরপ্ল-এস-এর নাম আমার কো-অথর হিসেবে রাখাতে ট্রিরপ্ল-এস আমাকে বকুনি দিলেন। তিনি শেখালেন যে ডিপার্টমেন্টের হেডের কোন অবদান না থাকলেও তাঁর নাম দেওয়াটা এক ধরণের অ্যাকাডেমিক ডিসঅনেস্টি (অসততা বা অসাধুতা)। তিনি ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে নিজের নাম ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে কেটে দিলেন। আমি পরপর দুটি ইন্টারনাল রিপোর্ট লিখেছিলাম। দ্বিতীয় রিপোর্ট থেকে জোশীজীর নামও তিনি কেটে দিলেন।

পিলানীতে সে সময়ে দোকানপাট খুব কম ছিল। কেউ দিল্লী গেলে সে অনেকের জন্য কেনাকাটা করে আনত অথবা পিলানীতে হয় না এমন কাজ করে আসত। একবার বন্ধু দিলীপ পাইন আমাকে এসে বলল ওর জানাশোনা

একজন দিল্লী যাচ্ছে এবং জানতে চাইল আমার দিল্লীতে কোন কাজ আছে কিনা। আমি ওকে আমার ছেঁড়া স্যান্ডেলের একটা পাটি দিল্লীর কোন মুচিকে দিয়ে ঠিক করে আনতে বললাম কারণ আমি পিলানীতে ধারে কাছে কোন মুচির দেখা পাইনি। দিলীপ স্যান্ডেলটা না নিয়ে আমাকে এক বকুনি দিয়ে সাইকেলে করে ওর জানাশোনা সেই একজনকে দিল্লীর বাস ধরাতে পিলানীর বাস স্ট্যান্ডে চলে গেল। পরে বাস স্ট্যান্ড থেকে ফিরে এসে পেরেক আর হাতুড়ি দিয়ে আমার স্যান্ডেলটা সারিয়ে দিল। দিলীপের কথা থেকে রণেনদার (প্রফেসার রণেন্দ্রনাথ বিশ্বাস) কথা মনে পড়ে গেল। পরে রণেনদা যখন সি রি, পিলানী-র ডাইরেক্টর ছিলেন তখন আমি সি এস আই আর-এর ডিস্টিনগুইশড ভিজিটিং সায়েনন্টিস্ট বা বিভিন্ন কমিটির মেম্বার হিসেবে প্রায়ই আমার তখনকার কর্মস্থল বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে সি রি, পিলানী যেতাম। রণেনদা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইনব্যাফেলে আমার চেয়ে অনেক সিনিয়ার ছিলেন। রণেনদা আমাকে অনেক স্নেহ করতেন এবং রণেনদার সাথে আমার 'তুমি'র সম্পর্ক ছিল। দিলীপ আমার ক্লাসমেট হওয়া সত্ত্বেও আমার সামনে একবার রণেনদা দিলীপের সাথে 'আপনি আপনি' করে কথা বলছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে জানতে পারলাম দিলীপের একটা নিয়ম-বহির্ভূত কাজের কথা জানতে পেরে রণেনদা রাগ করে দিলীপকে 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে নামিয়ে দিয়েছেন।

সি রি, পিলানী ক্যাম্পাসে আমাদের বাসস্থান পেলাম—সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডান দিকে আমাদের এক রুমের ফ্ল্যাট—ডান দিকে আমাদের আর বাঁ দিকে শ্রী পুনিতা ভেলুদের ফ্ল্যাট—আর সোজা আমাদের দুই ফ্ল্যাটের জন্য একটা কমন ছাদ ছিল। ফ্ল্যাটের পেছনের দিকে একটা খোলা বারান্দা ছিল। সেই বারান্দায় আমাদের রান্না হ'ত। সেই বারান্দা যখন একটা জানালা সহ কাঁচ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল তখন আমাদের কি আনন্দই না হয়েছিল! পুনিতা ভেলুর মার নির্দেশ ছিল আমাদের ল্যাব থেকে আসার আগে দুই ফ্ল্যাটের দুই বৌমা যেন ফিটফাট হয়ে থাকে। মণিকুন্তলার লম্বা চুল (কুন্তলার কুন্তল) অবিন্যস্ত দেখলে পুনিতা ভেলুর মা গজ-গজ করতে করতে চুলের মুঠি ধরে মণিকুন্তলার খোঁপা বেঁধে দিতেন। আমাদের ছাদে বিকেল চারটা নাগাদ একটি ময়ূর এসে মণিকুন্তলাকে কঁক করে ডাকত। মণিকুন্তলা ছাদে

গম ছড়িয়ে দিত। ময়ূরের ঠোঁটের আঘাতে ছাদ ফুটো-ফুটো হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য সেই গম মণিকুন্তলার হাত থেকে খাওয়ার সময় মণিকুন্তলার হাতের পাতায় একটুও চোট লাগত না। আশে পাশের ছাদ থেকে প্রতিবেশীদের বারণ মণিকুন্তলা শুনত না। ময়ূরটি মিষ্টি বুন্দিয়া খেতে খুব ভালবাসত। ডালের সাথে মাখা ভাতের দলা ছুড়ে দিলে ময়ূরটি খপ করে গিলে ফেলত।

পিলানীতে একবার শারীরিক সমস্যাগত কারণে বিড়লা হাসপাতালের ডাক্তারের নির্দেশে মণিকুন্তলাকে এক মাস বেড-রেস্ট নিতে হল। সেই সময়ে বিল্কু আর আমি পালা করে জোশীজী এবং সহকর্মী রাম নরেশ সিংহজীর বাড়ীতে লাঞ্চ ও ডিনার করতাম। জোশী বৌদি (বীনা) আর সিংহ বৌদি (কাঞ্চন) আমাদের ফ্ল্যাটে এসে মণিকুন্তলাকে খাইয়ে যেতেন। একেই কি বলে মণিকাঞ্চন যোগাযোগ—মণি আর কাঞ্চনের যোগাযোগ? মণিকুন্তলা সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরও ওনারা এই নিয়ম চালিয়ে যেতে চাইলেন। আমরা অনেক অনুরোধ করে ওনাদের নিরস্ত করলাম।

এক সময় আমার মাকে জামশেদপুরের দাদার বাড়ী থেকে পিলানীতে নিয়ে এসেছিলাম। মা মুগ্ধ হলেন পিলানী দেখে। তিনি দেখলেন পিলানীর বি আই টি এস ক্যাম্পাসে ছোটোদের সায়েন্স মিউজিয়াম, সরস্বতী মন্দির, আর মন্দিরের পেছনে শিব-গঙ্গা পরিসর যেখানে আছে শ্রী জি ডি বিড়লার হাবেলী, যার সামনে শিবের মূর্তি এবং হাবেলীকে ঘিরে ক্যানেল বা খাল। ভোর বেলায় সরস্বতী মন্দিরে পাব্লিক-অ্যাড্রেস সিস্টেমে শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন রুংটাজীর গাওয়া ভজন আকাশে বাতাসে মন্দ্রিত হ'ত যা দূর থেকে এখনও যেন আমার কানে ভেসে আসে। আমার মার সাথে পুনিতা ভেলুর মার খুব ভাব ছিল। দুজনে অনেক গল্প-গুজব করতেন, একজন তামিলে এবং আরেকজন বাংলায়। একজন অন্য জনের ভাষা না জানা সত্ত্বেও এটা কি করে সম্ভব হ'ত তা ভেবে অবাক হতে হয়। আমরা সমুদ্রের মাছ না খেয়ে নদীর মাছ খাই বলে পুনিতা ভেলুর মা আমাদের বকাবকি করতেন। সি রি-র একজন কর্মচারী জয়পুর ও দিল্লী থেকে মাছ এনে বিক্রি করতেন। শর্ত ছিল একজনকে একসাথে অনেক পরিমাণে মাছ কিনতে হবে। আমাদের কেনা মাছ সহকর্মী শ্রী এইচ এন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে ফ্রিজে রাখা হ'ত। দে বৌদি উল বোনায় এক্সপার্ট ছিলেন। সেই সময় সি রি ক্যাম্পাসে

বাড়ীতে তালা দিয়ে বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। একবার কাজের শেষে ল্যাব থেকে এসে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে কাউকে দেখলাম না। পুনিতা ভেলুর স্ত্রী শুধু তামিল জানতেন। তার দুই আঙুলে উলবোনার ইশারা দেখে বুঝলাম মণিকুন্তলা দেবৌদিদের কোয়ার্টারে গিয়েছে।

সেই সময়ে পিলানীর বাজারে মুরগীর বদলে বাজারে তিতিরের মাংস পাওয়া যেত। পাঠার মাংস বাজারে খোলাখুলি বিক্রি হ'তনা। সি রি ক্যাম্পাসের কাছে গ্রামের একটি বাড়ীতে পাঠার মাংস বিক্রি হ'ত। বাড়ীর বাইরের ঘরে ক্রেতাদের আপ্যায়ন করা হ'ত। বাড়ীর ভেতর থেকে আমাদের অর্ডার অনুযায়ী মাংস চলে আসত। পিলানীতে গ্রীষ্মকালে কুমড়ো ছাড়া অন্য কোন তরি-তরকারি পাওয়া দুষ্কর ছিল। সেই সময়ে দিনের বেলায় ৫০ সেলসিয়াসের উপর পারা উঠে যেত। তবে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরমের পর রাতে পিলানী ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু শীতকালে পারা নেমে যেত শুন্য সেলসিয়াসের নীচে। তখন পিলানীতে তরি-তরকারির বন্যা বয়ে যেত—এক টাকায় সাত কিলো, আট কিলো দরে। শীতকালে ছুটির দিন দল বেঁধে গল্প-গুজব করতে-করতে আমাদের হাঁটাপথে পিলানীর বাজারে তরি-তরকারি কিনতে যাওয়ার সেই আনন্দের কথা কি ভোলা যায়?

ডঃ জি এস সিধুর কোয়ার্টারে আমরা বেড়াতে যেতাম। (ডঃ সিধু আমার মতন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইনব্যাফেলে পড়াশুনা করেছিলেন)। তিনি বাংলা বলতে পারতেন। তাঁর কোয়ার্টারের একটি রুমে গুরু গ্রন্থ-সাহেব রাখা ছিল। পিলানীর গুরুদ্বারা বলতে সবাই তাঁর কোয়ার্টারকেই জানত। ডঃ সিধু এবং সিধু বৌদি আমাদের ফ্ল্যাটে আসতেন। মাইনাস ২ সেলসিয়াসের ঠাণ্ডায় সবাই রুম-হিটার ব্যবহার করত। তখনকার দিনের বাজার থেকে কেনা রুম-হিটার ব্যবহার করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করে ডঃ সিধু আমাদের রুম-হিটার ব্যবহার করতে বারণ করলেন। ডঃ সিধুর নির্দেশ আমরা পালন করলাম। তবে মণিকুন্তলা রাতের রান্না বারান্দায় না করে রুমেই করে আমাদের রুমটিকে একটু উষ্ণ করে তুলত। বিল্কু ছুটির দিন সকাল বেলায় খেলতে চলে যেত, আর ফিরত রাতে। ও ফিরে এলে ওর কাছে জানতে পেতাম ও কার বাড়ীতে ব্রেকফাস্ট, কার বাড়ীতে লাঞ্চ আর কারই বা বাড়ীতে ডিনার করে এল। বিল্কু এবং সি রি ক্যাম্পাসের সব

বাচ্চারা ক্যাম্পাসে তাদের বন্ধুদের বাড়ীকে নিজেদের বাড়ী বলেই মনে করত। বিল্কু এবং রাম নরেশজীর ছেলে রাহুল ওদের স্কুল সি রি বাল মন্দিরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনা করে সবার মন জয় করে নিয়েছিল। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সি রি-তে আমার সহকর্মী সুবোধ জহুরির পরিচালনায় সংগীত পরিবেশনা করে মণিকুন্তলাও সুনাম অর্জন করেছিল। অনেক রাতে পিলানী থেকে পাকিস্থানের রেডিও মিডিয়াম ওয়েভে ধরা যেত। নাহিদ আখতারের গান ঐ ভাবে পিলানীতে শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

খুশী হয়ে উঠলাম যখন ল্যাব ডাইরেক্টর ডঃ সিং তাঁর বিশেষ অধিকারে আমাকে 'আউট-অফ-টার্ন' একটি কোয়ার্টার এলট করলেন। কিন্তু এস্টেট সেকশন থেকে কোয়ার্টারের চাবি আনতে গিয়ে জানতে পারলাম যে সি রি, পিলানীর ভ্যাকুয়াম ট্যুব ডিভিশনে সাইন্টিস্ট 'বি' পদের জন্য আমার সাথে সি রি-র যে কয়েকজন ইন্টারনাল ক্যান্ডিডেট (সাইন্টিস্ট 'এ') ইন্টার্ভিউ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে দু'জনের (যাদের নাম উহ্য থাক) রিপ্রেসেন্টেশনের কারণে আমার জন্য কোয়ার্টারের এলটমেন্ট সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়ে গিয়েছে। এদেরই মধ্যে একজন আমাদের একবার ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। ডিনারের শেষে আমার জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। সেই একজনটি তার মার নির্দেশে আমার পা ধরে ক্ষমা চাইলেন। কারণ সি রি-তে সাইন্টিস্ট 'বি' পদের সিলেকশনের লিস্টে তার নাম ওয়েট-লিস্টের প্রথমে ছিল আর তিনি নাকি প্রার্থনা করেছিলেন যাতে আমার এমন বিপদ হয় যে যার ফলে আমি সি রি-তে জয়েন করতে না পারি এবং তিনি আমার বদলে জয়েন করতে পারেন।

কিন্তু এরপর আমার জন্য অনেক ওলটপালট অপেক্ষা করেছিল। সি রি জয়েন করার আগে আমাকে সরকারী হাসপাতাল থেকে আমার মেডিক্যাল রিপোর্ট আনতে বলা হয়নি। জয়েন করার পর আমাকে জয়পুরের সরকারী হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল রিপোর্ট আনতে বলা হল। আমি বিল্কু আর মণিকুন্তলাকে নিয়ে জয়পুরে গেলাম এবং ওখানে অনেক বেড়ালাম। জয়পুরের সরকারী হাসপাতালে আমার মেডিক্যাল এক্সামিনেশন হল এবং হাসপাতাল কতৃপক্ষ মেডিক্যাল রিপোর্ট সি এস আই আর-কে পাঠিয়ে দিল।

এরপর আমি সি এস আই আর থেকে চিঠি পেলাম যে আমি নাকি মেডিক্যালি আনফিট, কারণ আমার নাকি মায়োপিয়া আছে এবং আমার চশমার পাওয়ার গ্রহণযোগ্য লিমিটের মধ্যে নেই। ল্যাব ডাইরেক্টর ডঃ সিং আমার পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়ে সি এস আই আর-এর ডাইরেক্টর জেনারেলকে চিঠি লিখলেন। আর আশ্চর্যজনক ভাবে ঠিক সেই সময়ে আমি আর আই টি, জামশেদপুরে থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদে জয়েন করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম। এতদিন জেনে এসেছিলাম যে সংশ্লিষ্ট ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফল নাকি আইনগত প্রক্রিয়ায় বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু জানতে পারলাম যে ইন্টার্ভিউ-এর ফলাফল বের করার উপর আদালতের স্টে-অর্ডার উঠে যাওয়ায় এতদিন পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করা সম্ভব হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদ তখনকার দিনে প্রফেসারের পদের চেয়ে এক ধাপ নিচুতে ছিল; তখন মাঝখানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসারের পদ ছিল না, যা এখন আছে। পে-স্কেলের নিরিখে অবশ্যই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদ সি রি-তে আমার সাইন্টিস্ট 'বি' পদের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিল। তবুও ল্যাব ডাইরেক্টর ডঃ সিং পরামর্শ দিলেন আমি যেন আবার সি রি, পিলানী ছেড়ে আর আই টি, জামশেদপুরে ফিরে না যাই। এদিকে ট্রিরপ্ল-এস আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যেন উঁচু পোস্টের সুযোগ ছেড়ে না দিই। জঁ-পল সাত্র সার্ত্র কোথায় যেন লিখেছিলেন যে কোনও কিছু কোন কিছু হওয়ার অজুহাত হতে পারেনা; আর আমরা অন্যের পরামর্শ নেই বটে, তবে আমরা যা চাই তাই করি। চলো এগোই জামশেপুরে। আমি পিলানী ছেড়ে জামশেপুরে চললাম। আইনস্টাইন বলে গেছেন—জীবন একটি বাই-সাইকেলের মতন। তোমার ভারসাম্য রাখতে তোমাকে আবশ্যই চলতে হবে। উপনিষদে আছে—মৌমাছি অনবরত ওড়ে এবং মধু বিতরণ করে। চলতে থাকো—চলতে থাকো। চরৈবেতি-চরৈবেতি।

# হারু দিব্যি খেলাধুলা করছে

আর আই টি-র সহকর্মী শ্রী শিব প্রসাদ সিং-এর দাদার অ্যাস্ট্রোলজীর প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমানিত করে আমি সি রি, পিলানী জয়েন করেছিলাম, যদিও তখনও পর্যন্ত তাঁর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী যে আমি আর টি, জামশেদপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদে জয়েন করব তার সত্যতা প্রমানিত হয়নি। আমি পিলানী থেকে জামশেদপুরে ফিরে এলাম এবং আর আই টি-র ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদে জয়েন করলাম, এবং এই ভাবে তাঁর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাও প্রমানিত হল। আগেই লিখেছি আমি কি পরিস্থিতিতে পিলানী ছেড়ে জামশেপুরে চলে এসেছিলাম। পিলানী থেকে চলে আসার সময় সবার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সুগায়ক রুংটাজী, যার সরস্বতী মন্দিরে ভজন পরিবেশনার কথা আমি আগে লিখেছি, আমার অনুরোধে পিলানীতে আমাদের বাড়ীতে এসে একটার পর একটা গান শুনিয়ে আমাদের শুভেছা এবং আশীর্বাদ জানালেন।

এর অনেক দিন পরের কথা, সরস্বতী মন্দিরে ভজন পরিবেশনার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল একটা মজার ঘটনার কথা যা না লিখে থাকতে পারছিনা। একবার সুহাসদার অধ্যক্ষতায় সি রি-তে সায়েন্টিস্ট পদের নিযুক্তির জন্য আমি সি রি, পিলানী গিয়েছিলাম। সুহাসদা (প্রফেসার সুহাস দত্ত রায়) দিল্লী আই আই টি-র প্রফেসার ছিলেন। আমি তখন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসার ছিলাম। আমরা দুজনেই ইনব্যাফেল, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তনী। আমরা সি রি-র 'সিধু' গেস্টহাউসে উঠেছিলাম। আমরা মর্নিং-ওয়াকে বেরিয়ে সরস্বতী মন্দিরে 'রেকর্ডেড' ভজন শুনলাম। সবার খুব পরিচিত গানের গলা। কিন্তু সেই মুহূর্তে তখন আমার গায়কের নাম মনে করতে না পারায় সুহাসদাকে জিজ্ঞেস করলাম। নাম-মনে-না-করতে-পারা মনে হয় একটা ছোঁয়াচে ব্যাধি। সংগীত রসিক সুহাসদাও গায়কের নামটি মনে করতে পারলেন না। এর পর সেদিন যখনই দেখা হল গায়কের নামটা মনে পড়েছে কিনা জানতে আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। এমনকি

সায়েন্টিস্ট পদের নিযুক্তির বোর্ডে দুই প্রার্থীর ইন্টার্ভিউ-এর মধ্যবর্তী সময়েও সুহাসদা আমাকে গায়কের নামটি আমি মনে করতে পেরেছি কিনা জানতে চাইলেন। অবশেষে আমার গায়কের নামটি মনে পড়ে গেল। সে কথা সুহাসদাকে বললাম তবে নামটা তখন-তখনই বললাম না। সুহাসদাকে নামটি মনে করার জন্য আরও চেষ্টা করতে বললাম। সুহাসদা নামটি মনে না করতে পারায় সেদিন গেস্ট-হাউসের ডিনারের টেবিলে অবশেষে সুহাসদাকে গায়কের নামটি মনে করিয়ে দিলাম—অনুপ জালোটা!

আর আই টি, জামশেদপুরে ফিরে এসে আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার ললিত কিশোর এবং আমার কলেজ জীবনের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসার মদন মোহন মহান্তিকে ফিরে পেলাম। আর পেলাম প্রফেসার কিশোরের কাছে পি এইচ ডি-র জন্য রাঁচি ইউনিভার্সিটিতে রেজিস্টার্ড রিসার্চ স্কলার অশোক কুমার সিন্হাকে। রিসার্চের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে অশোকের কাজের অগ্রগতি আদৌ হচ্ছিল না। অতএব অশোক ঠিক করে ফেলেছিল যে ও আর আই টি-র রিসার্চের কাজ ছেড়ে ম্যাথেমেটিক্সে এম এস সি পড়তে যাবে যদিও ওর ফিজিক্সে এম এস সি ডিগ্রী ছিল। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক শ্রী রমা কান্ত চৌধুরী অশোককে, রিসার্চের কাজ ছেড়ে যাওয়ার আগে, আমার আর আই টি ফেরা অবধি অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন। প্রফেসার ললিত কিশোরের সাথে পরামর্শ করে আমি যে বিষয়ে সি রি, পিলানীতে রিসার্চ করতাম সেই বিষয়ে অশোকের সাথে কাজ শুরু করলাম। আর আই টি, জামশেদপুরে ফিরে গিয়ে এই বিষয়েই রিসার্চ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ সি রি, পিলানী ছাড়ার সময় সি রি-র ডাইরেক্টর অমরজিৎ সিং এবং আমাদের ডিভিশন-হেড ট্রিরপ্ল-এস আমাকে দিয়েছিলেন। আমার তত্ত্বাবধনে আমার দেওয়া বিষয়ে অশোকের রিসার্চের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হল। আমাদের বেশ কয়েকটা পেপার রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত হল। অশোক রাঁচি ইউনিভার্সিটিতে আমার সাথে ওর নতুন বিষয়ে রিসার্চর ভিত্তিতে ওর পি এইচ ডি রেজিস্ট্রেশনের বিষয় পালটানোর জন্য আবেদন করল। অশোকের পি এইচ ডি গাইড অর্থাৎ প্রফেসার ললিত কিশোরের রিসার্চ ক্ষেত্র সম্বন্ধে রাঁচি ইউনিভার্সিটির সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীন অবহিত ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অশোকের নতুন রিসার্চের

বিষয় প্রফেসার কিশোরের রিসার্চ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তিনি অশোকের আবেদন প্রথমে অনুমোদন করলেন না। অতঃপর জামশেদপুর থেকে রাঁচি গিয়ে আমি ওনাকে নানা যুক্তি দিয়ে এবং অশোকের ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে অশোকের পি এইচ ডি রেজিস্ট্রেশনের বিষয় পালটাতে রাজী করালাম।

এবার আমার জন্য আর আই টি-র নিউ বা ওল্ড ক্যাম্পাসের কোথাও কোয়ার্টার খালি ছিল না। আদিত্যপুরে অশোকের বাড়ীর কাছে একটা বাড়ী কিছু দিনের জন্য ভাড়া পাওয়া গেল। এল আই সি আই-এর ডেভেলপমেন্ট অফিসার শ্রী দ্বারিকা প্রসাদজী এল আই সি আই-তে কর্মরত আমার ছোড়দি, মঞ্জুদির কাছে খবর পেলেন যে আমি আদিত্যপুরে বাড়ী ভাড়া পাচ্ছিনা। এনারই মেয়ে খোলা ম্যানহোলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল যাকে সেখান থেকে অচৈতন্য অবস্থায় তুলে আনার পর আমি টিস্কোর মেইন হাসপাতালে ভর্ত্তি করেছিলাম, যে দুর্ঘটনার কথা আমি আগে লিখেছি। খবর পেয়ে দ্বারিকাজী আদিত্যপুর পান দোকান বাস স্ট্যান্ড এবং আর আই টি-র ওল্ড ক্যাম্পাসের কাছে নিজের দোতলা বাড়ীর দোতলাটি আমাদের জন্য ছেড়ে দিলেন। সেখানে থাকাকালীন বিষ্টুপুরের নারভেরামের দোকান থেকে আমি 'লুনা' মোপেড কিনলাম এবং বাড়ীর পাশেই একটা মাঠে মোপেড চালানো শিখলাম। মণিকুন্তলা আর বিল্ককে নিয়ে এই মোপেডে চড়ে জামশেদপুরের বারোদুয়ারী, টেল্কো, কদমা এবং সোনারি-তে যথাক্রমে দিদিমণি (বড়দি), দাদা (বড়দা), মঞ্জুদি (ছোড়দি), এবং জয়ন্তদার (ছোড়দা) বাড়ীতে যেতাম। দ্বারিকাজীর বাড়ী সব দিক দিয়ে ভাল ছিল কিন্তু দোতলায় কলে জল না আসাতে আমাদের খুব অসুবিধা হ'ত। তাই কিছু দিন পর আমরা আদিত্যপুর থেকে জয়ন্তদার সোনারির ভাড়া বাড়ীতে শিফ্ট করলাম। সেখান থেকে বিল্কুর স্কুল (ডি বি এম এস, দক্ষিণ ভারত মহিলা সমাজ) অনেক কাছে হয়ে গেল। অশোক ওর রিসার্চের থিওরেটিক্যাল কাজের নির্দেশ নিতে আমাদের সোনারির বাড়ীতে চলে আসত। ওখানে ও নির্বিঘ্নে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রিসার্চের কাজ করত। অনেক সময় অশোককে কাজ দিয়ে আমি ক্লাস নিতে আর আই টি-তে চলে যেতাম। আর আই টি থেকে ফিরে এসে অশোকের কাজ আমি দেখতাম। শেষ বাস ধরে অশোক সোনারি থেকে বিষ্টুপুর এবং সেখান থেকে বাস ধরে ওদের বাড়ী আদিত্যপুর চলে যেত। এক নাগাড়ে

কাজ করার জন্য আমি আর অশোক জয়ন্তদার বকুনি খেতাম। সোনারির লাস্ট বাস মিস হয়ে গেলে অশোককে স্কুটারে করে জয়ন্তদা বিষ্টুপুরে পৌঁছে দিতেন। এর পর অশোককে আমার কোনও সাহায্য এবং আমাকে কো-অথর রূপে না নিয়ে একটা রিসার্চ পেপার প্রকাশিত করার নির্দেশ দিলাম। উদ্দেশ্য অশোককে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। অশোক আর আই টি-র ম্যাথেমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ স্কলার খগেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে একটা একটা রিসার্চ পেপার প্রকাশিত করে ওর যোগ্যতা প্রমাণ করে দেখাল। মিতভাষী অশোক ছিল স্থিরপ্রতিজ্ঞ। মনে পড়ে গেল তখন অশোক ছিল জামশেদপুরে একটা কলেজে অনানুষ্ঠানিক (এড হক) লেকচারার। সেই সময় বিহারে এড হক লেকচারারদের পার্মানেন্ট করার দাবীতে আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল অশোক। অশোক রাজধানী পাটনাতে অনশন ধর্মঘট করে। এক মাসের উপর অনশনে থাকার পর বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পর ও অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন করার আগেই অনাস্থা প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রীকে সরে যেতে হয়। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালে প্রতিশ্রুতি পালিত না হওয়ায় অশোক দ্বিতীয়বার অনশন ধর্মঘট করে। অশোকের আবার এক মাসের উপর অনশন ধর্মঘটের পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী অশোকের দাবী মেনে নেয় এবং অবশেষে বিহারের এড হক লেকচারাররা পার্মানেন্ট হয়ে যান। পরে অশোক আমার আগ্রহে সি এস আই আর - সি রি, পিলানী জয়েন করে যেমনটি আমি সেখানে জয়েন করেছিলাম আমার পি এইচ ডি গাইডের আগ্রহে। অশোক পিলানীতে জাইরোট্রোন ল্যাব তৈরি করে বিখ্যাত হয়। অশোককে দেশের মাইক্রোওয়েভ ট্যুবের একজন অথরিটি রূপে মান্য করা হয়।

এরপর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বি এইচ ইউ)-র ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার নাগেশ চন্দ্র বৈদ্য-র পোস্টকার্ডে লেখা একটা চিঠি জীবনে চলার পথের একটি মোড়ে আমাকে দাঁড়া করিয়ে দিল। চিঠিতে তিনি আর আই টি-তে আমার ল্যাবে গিয়ে আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে তিনি জামশেদপুরে সি এস আই আর—ন্যাশনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরটারির সার্কিট হাউস অঞ্চলে অবস্থিত গেস্টহাউসে উঠবেন। নির্দিষ্ট দিনে গেস্টহাউসে আমি ওনার

বেনারস থেকে রেলগাড়ী করে আসার অপেক্ষা করলাম। আসলে আমিই তাঁকে গেস্টহাউসে রিসিভ করলাম। জানতে পারলাম যে তিনি কথিত ল্যাবরটারিতে একটা মীটিং অ্যাটেন্ড করতে এসেছেন। তিনি ফ্রেশ হয়ে গেস্টহাউসের লাউঞ্জে আমার সাথে আলাপ-পরিচয় করলেন। এর আগে আমাদের পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ওনার এক প্রশ্নের উত্তরে জানালাম যে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বি টেক এবং এম টেক করেছি। তিনি চাইলেন যে আমি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে রীডারের পোষ্টে জয়েন করি। রীডারের পোষ্ট আমার আর আই টি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পোস্টের সমতুল্য ছিল। এছাড়া প্রফেসার বৈদ্য আমাকে বেনারসে তাঁর পরিচালিত ডিপার্টমেন্টের একটি প্রজেক্টে আমি যে রিসার্চের বিষয়ে নিয়ে কাজ করি সেই বিষয়ে আমার কাজ করার পরিধি বিস্তৃত করার আশ্বাসও দিলেন।

পরের দিন প্রফেসার বৈদ্য-র নির্দেশ অনুযায়ী আমার বায়ো-ডাটার একটি কপি নিয়ে ওনার সাথে গেস্টহাউসে দেখা করি। বায়ো-ডাটা পড়ে আমি যে বি টেক এবং এম টেক ছাড়া ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পি এইচ ডি-ও তা জানতে পেরে প্রফেসার বৈদ্য লাফিয়ে বলে উঠলেন—এ যে আমার কাজ অনেক সোজা হয়ে গেল। আমার সাথে জয়ন্তদাও ছিল। চয়ন সাপেক্ষে আমি জামশেদপুরের রিজিওনাল কলেজ ছেড়ে বেনারসের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (বি এইচ ইউ) জয়েন করতে ইচ্ছুক ছিলাম। এ ব্যাপারে জয়ন্তদার আমার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল। মণিকুন্তলার সাথে দেখা করতে এবং ওর মতামত জানতে প্রফেসার বৈদ্য জয়ন্তদার স্কুটারে করে গেস্টহাউস থেকে অনতিদূরে আমাদের বাড়ীতে গেলেন। প্রথাগত ভাবে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন না করা সত্ত্বেও এই 'অফার' অভূতপূর্ব ছিল। সময় মতন বি এইচ ইউ থেকে ইন্টার্ভিউ লেটার পেলাম। প্রফেসার বৈদ্য-র কথা মতন ইন্টার্ভিউ-এর একদিন আগে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পৌঁছে গেলাম। প্রফেসার বৈদ্য অনুগ্রহ করে ঘুরে-ঘুরে ডিপার্টমেন্টের সব এক্সপেরিমেন্টাল ফেসিলিটি দেখালেন এবং সবার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইন্টার্ভিউ আর আমার সিলেক্শনের আগেই একটা বন্ধ রুমে আমার নেমপ্লেট লাগানো দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এও কি সম্ভব?

১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মণিকুন্তলা আর বিল্কুকে জামশেদপুরে রেখে আমি বেনারসে গেলাম এবং আর আই টি থেকে লিয়েনে ছুটি নিয়ে বি এইচ ইউ-র ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের একটি প্রজেক্টে জয়েন করলাম। ডিপার্টমেন্টের সেন্টার অফ রিসার্চ ইন মাইক্রোওয়েভ ট্যুব্স (সি আর এম টি)-এ এই প্রজেক্ট পরিচালিত হত। প্রফেসার বৈদ্য নিজেই এই সেন্টারের কোঅর্ডিনেটার ছিলেন। ঐ প্রজেক্টে জয়েন করেছিলেন ব্যাঙ্গালোরের পাব্লিক সেক্টর কোম্পানি ভারত ইলেক্ট্রনিক্স থেকে ডঃ ডি এস ভেঙ্কেটেশরুলু এবং সাহিবাবাদের সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড থেকে ডঃ অনিল কুমার পাণ্ডে। ঐ একই প্রজেক্টে আমার মতন লিয়েন নিয়ে জয়েন করেছিলেন জয়পুরের রাজস্থান ইউনিভার্সিটি থেকে বিখ্যাত প্রফেসার এম এল সিসোদিয়া। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমি প্রজেক্টের কাজ শুরু করলাম। প্রফেসার সিসোদিয়া সারে পাঁচ স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত সবুজ-সুন্দর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের 'হায়দ্রাবাদ' কলোনীর একটি কোয়ার্টারে থাকতেন। কোয়ার্টারের একটি ঘর তিনি আমার জন্য ছেড়ে দিলেন। প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এম পি সিন্হা এবং লেকচারার পি কে জৈন (প্রদীপ) আমার তত্ত্বাবধানে তাদের পি এইচ ডি-র কাজ শুরু করল। মাঝে মাঝে অশোক জামশেদপুর থেকে ওর পি এইচ ডি থিসিসের ড্রাফট এডিট করার জন্য আমার কাছে আসত। এর পর লিয়েনের সময়কাল পূর্ণ হওয়াতে প্রফেসার সিসোদিয়া রাজস্থান ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গেলেন। আমিও প্রফেসার সিসোদিয়ার কোয়ার্টার ছেড়ে বি এইচ ইউ মেইন গেটের অনতিদূরে ভেলুপুর এলাকার বিজয়া সিনেমা হলের কাছে জহর নগর কলোনির একটা ভাড়াবাড়ীতে চলে গেলাম। সি আর এম টি-র সেক্শন অফিসার শ্রী কৃপা শঙ্কর সিং (কে এস এস) এই বাড়ী ভাড়া ঠিক করে দিয়েছিলেন। এই বাড়ীর কাছেই কে এস এস থাকতেন। কে এস এস-এর স্কুটারে ডবল-রাইডে আমরা বাড়ী থেকে সি আর এম টি-তে যাতায়াত করতাম। প্রদীপ সেই সময় জহর নগর কলোনিতে আমাদের বাড়ীর খুব কাছে ওর দাদার সাথে মিলে একটা বাড়ী বানাল এবং ওদের যৌথ পরিবার সহ বেনারসের ঠঠেরি বাজারের সরু গলির আদি বাড়ী থেকে নতুন বাড়ীতে চলে এল। এরপর থেকে কে এস এস নয়, পি কে জে-এর স্কুটারে ডবল-রাইডে আমরা বাড়ী থেকে সি আর এম টি-তে যাতায়াত করতাম।

জহর নগর কলোনির বাড়ীতে একদিন সকালে যখন বি এইচ ইউ-র লাইব্রেরী থেকে আনা একটি জার্নালের অনেকগুলি সংখ্যার একটি বাঁধানো ব্যাক-ভল্যুম পড়ছিলাম, তখন সহ-ভাড়াটে বেনারসের নগর নিগমের এক অফিসারের স্ত্রীর বাড়ী থেকে 'বাঁচাও-বাঁচাও' শুনে আমি জার্নালের ব্যাক-ভল্যুম হাতে নিয়েই অকুস্থলে পৌঁছে গেলাম। মুখ-কাপড়-দিয়ে-ঢাকা, ছুরি-হাতে হানাদারটি আমার হাতে কিম্ভুতকিমাকার জার্নালের ব্যাক-ভল্যুম অস্ত্রটি—যেটা কোন দিন সে চোখে দেখেনি—দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বাড়ীর পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেল। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আমার কাছে জানতে চাইলেন কি ভাবে আমি হানাদারটিকে ভাগালাম। বাতাবরণকে হাল্কা করার জন্য আমি ওনাকে জানালাম—হানাদারটি কোন ছাড়, এই জার্নালের ব্যাক-ভল্যুমের ভিতর স্কলাররা এক বার ডুবে গেলে বেরিয়ে আসার কুল কিনারা পায় না। অফিসারকে হানাদারটিকে তাড়ানোর জার্নালের ব্যাক-ভল্যুমরুপী অস্ত্রটি দেখালাম। এই ঘটনাটি ঘটার সময় নগর নিগমের অফিসার ভদ্রলোক অফিসে ছিলেন। তাঁকে খবর দেওয়াতে তিনি বাড়ী চলে এলেন। পুলিশ অফিসার তাঁর কাছে জানতে চাইলেন সম্প্রতি তিনি কোন কর্মচারীকে সাসপেন্ড বা বরখাস্ত করেছেন কি না। সত্যিই তিনি সম্প্রতি একজন কর্মচারীকে সাসপেন্ড করেছিলেন। শুনেছিলাম সেই সূত্র ধরে পুলিশ অফিসার হানাদারটিকে ধরতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে জামশেদপুর থেকে মণিকুন্তলা বিল্কু (ইন্দ্রনীল) আর সদ্যজাত বিল্কুর ভাই আপ্পু (প্রিয়নীল)-কে নিয়ে বেনারসে জহর নগর কলোনির বাড়ী চলে এল। ১৯৮২ এশিয়াড গেমের মাসকট ছিল হস্তিশাবক 'আপ্পু' আর প্রিয়নীল জন্মেছিল ১৯৮২ সালে। তাই প্রিয়নীলের ডাকনাম 'আপ্পু' রাখা হয়েছিল। জামশেদপুরের আই সি এস সি স্কুল ডি বি এম এস থেকে বেনারসের ডি এল ডবল্যু (ডিজেল লোকোমেটিভ ওয়ার্কশপস) এলাকার আই সি এস সি অনুমোদিত সেন্ট জন্স স্কুলে বিল্কু ক্লাস এইটে ভর্তি হল। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইউ এস এ-র অ্যামেরিকান লোকোমেটিভ কোম্পানি (অ্যাল্কো)-র সহযোগিতায় বেনারসে ১৯৬১ সালে ডি এল ডবল্যু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)। সেন্ট জন্স, ডি এল ডবল্যু স্কুলে বিল্কু ক্লাসের পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করত। তবে বটানি ও জুওলজি বিষয়ে ওর

বিশেষ ইন্টারেস্ট ছিল। বিল্কু হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত শিখতে বেনারসের এক পণ্ডিতজী-র বাড়ীতে যেত। পণ্ডিতজী চেয়েছিলেন নাড়া বেঁধে বিল্কু তাঁর শিষ্য হয়ে যায়। তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে ঘর ভরা বিল্কুর স্কুলে পাওয়া পড়াশুনায় ভাল করার প্রাইজ—মেডেল আর কাপ—দেখে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলালেন। তিনি চাইলেন সঙ্গীতের চেয়ে বিল্কু স্কুলের পড়াশুনাতেই বেশী মনঃসংযোগ করুক। তিনি বললেন তিনি বোধ হয় তাঁর ছেলেকে সঙ্গীত জগতে নিয়ে এসে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মণিকুন্তলার সাথে বেনারসে ওর বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল 'কাজের মেয়ে' কমলাপিসী। কমলাপিসী বড়ই সরল আর সিধে-সাধা ছিল। কাশী দেখার উৎসাহে কমলাপিসী বেনারসে আসতে রাজী হয়েছিলেন। ছুটির দিনে কমলাপিসীকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম। আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল নাটোরের রাণী ভবানীর অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত দুর্গাকুণ্ড ও সংলগ্ন দুর্গা মন্দির এবং তার কাছেই তুলসী মানস মন্দির এবং সঙ্কট মোচন মন্দির আর এ ছাড়া বি এইচ ইউ পরিসরে আমাদের ডিপার্টমেন্টের নিকটস্থ বিশ্বনাথ মন্দির। বি এইচ ইউ পরিসরে সাইকেল রিক্সা করে বিশ্বনাথ মন্দির যাওয়ার পথে দূর থেকে কমলাপিসীকে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট দেখালাম এবং পিসীকে বললাম—ঐ দেখ 'মেটালার্জি মাতার' মন্দির। মন্দিরের উদ্দেশে কমলাপিসী হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন। এই ভাবে পিসীকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট দেখালাম এবং পিসী 'মাইনিং বাবার' মন্দিরের উদ্দেশে তার প্রণাম নিবেদন করলেন।

এই বাড়ীতে আমাদের প্রথম টেলিভিশন—ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট—আনার থ্রিল এলাকার ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে ভাগ করে নিলাম। কিছুদিন পর ভেলুপুর এলাকার জহর নগর কলোনির বাড়ী থেকে সেই এলাকারই রবীন্দ্রপুরী কলোনির আরেকটা বাড়ীতে ভাড়া নিয়ে আমরা চলে এলাম। মনে আছে একবার ট্রিপ্ল-এস পিলানী থেকে বেনারসে এসে রবীন্দ্রপুরী কলোনিতে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমার নাম দিয়ে আমাদের বাড়ী খুঁজে না পাওয়ায় তিনি আমাদের তিন বছরের ছেলে আপ্পুর নাম নিয়ে আমাদের বাড়ীর হদিশ পেয়েছিলেন। কমলাপিসী, যতদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখতেন। তবে মাঝে-মাঝে পিসীর দেশের

বাড়ীর জন্য মন খারাপ করত। পিসী একদিন স্বপ্ন দেখলেন পিসীর নাতি হারুর প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। এই স্বপ্ন দেখার পর পিসীর কান্নাকাটি থামানো যাচ্ছিল না। ভারী-সরল কমলা পিসীর মন ভাল করার জন্য তখন আমাকেও পরের দিন একটা পাল্টা স্বপ্ন দেখতে হল। পিসীর মন খুশিতে ভরে উঠল যখন পিসীকে বললাম—আমিও একটা স্বপ্ন দেখলাম যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হারু দিব্যি খেলাধুলা করছে।

# অভিনন্দনের সেই মুহূর্ত আজও ভুলতে পারি না

বি এইচ ইউ-র ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সি আর এম টি-তে আমাদের প্রজেক্টের কাজ সেন্টার কোঅর্ডিনেটার প্রফেসার এন সি বৈদ্য-র তত্ত্বাবধানে ভাল ভাবে এগুচ্ছিল। প্রফেসার ডি এস ভেঙ্কেটেশরুলু তাঁর টিম নিয়ে ক্লাইস্ট্রন (এক ধরনের মাইক্রোওয়েভ ট্যুব) ডেভেলপ করার কাজ পরিচালনা করছিলেন। প্রফেসার এম এল সিসোদিয়া রাজস্থান ইউনিভার্সিটি ফিরে যাওয়ার পর ট্র্যাভেলিং-ওয়েভ ট্যুব ডেভেলপ করার দায়িত্ব আমি আর প্রদীপ (জৈন) নিয়েছিলাম। সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত—একটি নিদারুণ দুর্ঘটনা—প্রফেসার বৈদ্যর মাসিভ হার্ট অ্যাটাকে তিরোধান—সি আর এম টি-কে চূর্ণ করে দিল। এই অভাবনীয় ঘটনায় সি আর এম টি পরিবার বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই দুর্যোগে প্রফেসার বৈদ্যর পর প্রফেসার আর কে ঝা সি আর এম টি-র কোঅর্ডিনেটার হিসেবে হাল ধরলেন। দু'বার তিনি আমার লিয়েন এক্সটেন্ড করে আমাকে আর আই টি-জামশেদপুরে ফিরে যাওয়া থেকে নিরস্ত করলেন।

কোঅর্ডিনেটার প্রফেসার আর কে ঝা, সি আর এম টি-র কার্যক্রম পরিচালনায়, আমার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতেন। ইতিমধ্যে প্রফেসার ঝা-র উদ্যোগে প্রফেসার সিসোদিয়ার রাজস্থান ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাওয়াতে প্রজেক্টের শূন্য প্রফেসারের স্থান আমি পূর্ণ করলাম। তবে যদিও প্রফেসার ঝা দু'বার আমার লিয়েন এক্সটেন্ড করতে পেরেছিলেন, তৃতীয় বার তাঁর আমার লিয়েন এক্সটেন্ড করার প্রচেষ্টা সাংবিধানিক বাধার কারণে সফল হল না। আমার বি এইচ ইউ থেকে আর আই টি ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন এসে গেল। কিন্তু এবার তদানীন্তন ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসার এস কে শ্রীবাস্তব আমাকে আর আই টি-র লিয়েন ছেড়ে দিয়ে সি আর এম টি-র প্রফেসারের পদে (পোস্টে) থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এক দিকে আর আই টি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের পদ, আর অন্য দিকে সি আর এম টি-র এক পদ উঁচু প্রফেসারের পদ; আবার এক দিকে আর আই টি-র স্থায়ী

(পার্মানেন্ট) পদ আর অন্য দিকে সি আর এম টি-র অস্থায়ী (টেম্পোরারি) পদ। আমি দোটানায় পড়ে গেলাম। অবশ্যই রিসার্চের স্কোপ আর আই টি থেকে সি আর এম টি-তে অনেক বেশী। এছাড়া সামনেই ডিপার্টমেন্টের আমার বিশেষীকরণে (স্পেসালাইজেশনে) স্থায়ী প্রফেসার পদের জন্য ইন্টারভ্যু হওয়ার সম্ভাবনা। অবশেষে আমি আর আই টি-তে ফিরে না গিয়ে কথিত ইন্টারভ্যু দিলাম এবং কৃতকার্য হয়ে বি এইচ ইউ-র ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সি আর এম টি-তে স্থায়ী প্রফেসারের পদ গ্রহণ করলাম।

বি এইচ ইউ-র চারজন ভাইস-চ্যান্সেলারের সাথে কোন না কোন ভাবে আমার নিম্নরূপ যোগাযোগ হয়েছিল।

(১) প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হলেন স্বনামধন্য রসায়নবিদ প্রফেসার আর পি রাস্তোগি যিনি সি এস আই আর-এর ডিস্টিনগুইশ্ড ভিজিটিং সাইন্টিস্ট হওয়ার জন্য আমাকে ফেলিসিটেট বা অভিনন্দিত করেন। আমার এই ভিজিটিং পদে থাকাকালীন আমি সি এস আই আর, পিলানীর সাথে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিন্গ স্থাপিত করি এবং কোলাবোরেটিভ বা সহযোগিতামূলক রিসার্চ শুরু করি।

(২) দ্বিতীয় জন হলেন ভাইস-চ্যান্সেলার সি এস ঝা। তিনি আই আই টি, দিল্লীর ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ছুটি নিয়ে প্রথমে আই আই টি, খড়গপুরের ডাইরেক্টর এবং পরে বি এইচ ইউ-র ভাইস-চ্যান্সেলার হন। প্রফেসার সি এস ঝা ভাইস-চ্যান্সেলার থাকার সময় আমি ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলাম এবং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকের রিক্তপদ ভর্তির ইন্টার্ভিউ করার জন্য প্রফেসার ঝাকে ক্রমাগত অনুরোধ জানাতাম যার ফলস্বরূপ আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলি রিক্ত পদ পূর্ণ করতে পেরেছিলাম। প্রফেসার সি এস ঝা মারফৎ আমার কাছে আর আই টি-র প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব এসেছিল। ইউনিভার্সিটিতে আমার রিসার্চের কাজের এবং রিসার্চ স্টুডেন্টদের ক্ষতি হওয়ার কথা ভেবে আমি বি এইচ ইউ ছাড়তে রাজী না হয়ে প্রফেসার ঝাকে ক্ষুণ্ণ করেছিলাম কিন্তু তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই নি।

(৩) তৃতীয় জন হলেন ভাইস-চ্যান্সেলার রামচন্দ্র রাও যিনি ছিলেন

স্বনামধন্য মেটালার্জিস্ট। ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়ার আগে তিনি জামশেদপুরে সি এস আই আর-এর ন্যাশনাল মেটালার্জিক্যাল ল্যাবরাটরির (এন এম এল-এর) ডায়রেক্টার এবং তারও আগে বি এইচ ইউ-র মেটালার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার ছিলেন। বি এইচ ইউ-তে তিনি নারিয়া গেটের সম্মুখীন ক্যাম্পাস নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে থাকতেন। তাঁর কোয়ার্টারের সংলগ্ন কোয়ার্টারে আমরা আমাদের হায়দ্রাবাদ কলোনির কোয়ার্টার থেকে শিফ্ট করেছিলাম। সেই সময় বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসের কোয়ার্টার থেকে খুব চুরি হ'ত। আমাদের শিফ্ট করার কয়েকদিন দেরী হওয়ার সুযোগ নিয়ে আমাদের কোয়ার্টার থেকে ইলেকট্রিক্যাল এবং প্লাম্বিং ফিটিংস চুরি হয়ে গেল। একদিন মাঝরাতে আমাদের খালি কোয়ার্টার থেকে দুটো ওয়াশ-বেসিন চুরি করার সময় অপহরণকারী পাশের কোয়ার্টার থেকে প্রফেসার রামচন্দ্র রাও-এর তাড়া খেয়ে ওয়াশ-বেসিন দু'টি আমাদের বাগানে ফেলে দিয়ে পালিয়েছিল।

আমরা যখন নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভে থাকতাম, প্রফেসার রাও-এর মেয়ে সুপর্ণা তখন বি এইচ ইউ-র আই এম এস-এ এম বি বি এস-এর ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী ছিল এবং আমার বড় ছেলে বিল্কুও তখন সেখানে ওর জুনিয়ার ক্লাসের ছাত্র ছিল। সেই সময় সুপর্ণা একটি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, যার নাম ইউনাইটেড স্টেট্স মেডিক্যাল লাইসেন্সিং এক্সামিনেশন (USMILE)। যেহেতু ইউ এস এ-তে ভারতের এম বি বি এস-এর মান্যতা ছিল না, ইউ এস এ-তে উচ্চশিক্ষার্থ-প্রত্যাশীদের এই পরীক্ষায় পাশ করা আবশ্যকীয় ছিল। মাঝরাতে সুপর্ণা আই এম এস-এর স্যার সুন্দরলাল হসপিটাল থেকে ফিরে এসে নিজেদের কোয়ার্টারে ঢোকার আগে আমাদের কোয়ার্টারে এই পরীক্ষা সংক্রান্ত মেডিক্যাল সায়েন্সের বেসিক্স ঝালাই করার জন্য বিল্কুর কাছে আসত।

নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে প্রফেসার রাও নিজেদের লিভিং রুমে মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে তার উপর শুয়ে-বোসে পড়াশুনা করতেন। অতিথি এলে শতরঞ্চি গুটিয়ে তাঁকে নিয়ে সোফায় বসতেন। তিনি আমার সাথে আমার হোমটাউন জামশেদপুর এবং সেখানকার এন এম এল-এর সাথে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি এন এম এল-এর

ডায়রেক্টার পদ জয়েন করবেন কিনা স্থির করার আগে আমার পরামর্শ চাইলেন। আমি হাঁ বলাতে তিনি হোমওয়ার্ক শুরু করলেন। তিনি আমার ছোট ছেলে আপ্পুর কাছে বাংলা শেখা আরম্ভ করলেন, কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এন এম এল-এর অধিকাংশ কর্মী বাংলাভাষী।

প্রফেসার রাও-এর কথা লিখতে গিয়ে আমাদের ইন্সটিট্যুটের একটি ডিপার্টমেন্টের দুই শিক্ষককের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের একজন প্রফেসার বিমল কুমার মজুমদার (কল্পিত নাম) এবং আরেকজন লেকচারার প্রফুল্ল সান্যাল (কল্পিত নাম) যিনি প্রফেসার মজুমদারের সুপারভিসশনে ওর পি এইচ ডি-র জন্য আমাদের ইউনিভারসিটিতে রেজিস্টার্ড ছিল। প্রফুল্ল ছিল ব্রিলিয়েন্ট টিচার এবং রিসার্চার। মজুমদার প্রফেশেনাল জেলাসির বশবর্তী হয়ে সুপারভাইসার হওয়া সত্ত্বেও প্রফুল্লকে পি এইচ ডি থিসিস জমা দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকলেন। এর জন্য প্রফুল্লর নৈরাশ্য স্পষ্টতই ওর পরিবারে সঞ্চারিত হতে লাগলো। প্রতিদিন বাড়ীতে মজুমদারের নতুন নতুন কুকীর্তির কাহিনী শুনে শুনে প্রফুল্লর দুবছরের মেয়ে তিতলি 'মজুমদার' শব্দটির অর্থ নিজের মতন করে ওর শব্দকোষে তুলে রাখল। তখন প্রফুল্লরা বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসের টিচার্স ফ্ল্যাটে থাকত। ওদের ফ্ল্যাটের উপরতলার ফ্ল্যাটের আন্টি তিতলিকে খুব ভালবাসতেন। একদিন ঐ আন্টির কোন ব্যবহার 'খারাপ' লাগাতে তিতলি নিজের শব্দকোষ থেকে 'মজুমদার' শব্দটি ব্যবহার করল। তিতলির সাথে বচসায় তিতলি রেগেমেগে ওর আন্টিকে বলল—তুম এক নম্বর কা মজুমদার হো। তিতলির মুখে এই নতুন গালি 'মজুমদার' শুনে সবাই থ হয়ে গেল।

প্রফুল্লর থিসিস জমা করার ব্যাপারটার সুরাহা করার উদ্দেশে আমাদের ডিপার্টমেন্টের তদানীন্তন হেডকে নিয়ে আমি প্রফুল্লর ডিপার্টমেন্টের হেডের সাথে দেখা করলাম। সবার মধ্যস্থতায় অবশেষে প্রফুল্ল ওর পি এইচ ডি থিসিস জমা দিল। দেশের এক্সটারনাল থিসিস এক্সামিনার এবং বিদেশের এক্সটারনাল থিসিস এক্সামিনার দু'জনেই প্রফুল্লর থিসিসের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কিন্তু বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ইন্টারনাল এক্সামিনার হিসেবে প্রতিকূল রিপোর্ট দিয়ে মজুমদার শয়তানীর ইতিহাস রচনা করলেন। এই ব্যাপারে আমি ভাইস-চ্যান্সেলার প্রফেসার রামচন্দ্র রাও-এর সাথে দেখা

করলাম। অবশেষে ইউনিভারসিটির রিসার্চ কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ঘুরে নতুন নিয়ম চালু হল যে এবার থেকে পি এইচ ডি থিসিস পরীক্ষা ইন্টারনাল সুপারভাইসার (প্রফুল্লর ক্ষেত্রে, মজুমদার) এক্সামিনারের আওতার বাইরে থাকবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী নতুন কলেবরে প্রফুল্ল ওর থিসিস জমা করল এবং অচিরেই পি এইচ ডি ডিগ্রী পেল।

(৪) চতুর্থজন ভাইস-চ্যান্সেলারের ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত থাকার সময় আমি বিদেশের একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটি থেকে ছয় মাসের জন্য সিনিয়ার ভিজিটিং পদের অফার পাই। কিন্তু ইনি আমার ছুটি গ্র্যাট করলেন না। তিনি তাঁর যুক্তি দিয়েছিলেন। আমি নাকি একজন দক্ষ টিচার এবং রিসার্চার। আমাকে ছুটি দিলে নাকি বি এইচ ইউ-র প্রভূত ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখ-ভরা মজার কথা যে এর কিছুদিন পরেই যে দেশ থেকে আমি ভিজিটিং পদের অফার পেয়েছিলেন সেই দেশেই তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে অশোক (আর আই টি-র রিসার্চ স্কলার অশোক কুমার সিন্হা) পি এইচ ডি করার পর প্রথমে জামশেদপুরে ওয়ার্কার্স কলেজে লেকচারার এবং পরে সি রি, পিলানীতে সাইন্টিস্ট 'বি' হয়। সি রি, পিলানীতে কর্মরত অশোকের সাথে আমার রিসার্চের কাজ অব্যাহত থাকে। অশোক ছাড়াও সি রি, পিলানীর অন্যান্য সাইন্টিস্টদের সাথে আমার রিসার্চ করার পরিধি আরও বিস্তৃত হল, আমার সি এস আই আর-এর মর্য্যাদাপূর্ণ ডিস্টিংগুয়িশড ভিজিটিং সাইন্টিস্ট হওয়ার পর। তদানীন্তন বি এইচ ইউ-র ভাইস-চ্যান্সেলার প্রফেসার আর পি রাস্তোগী আমাকে ডি ভি এস হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করেন। ডি ভি এস স্কিমে, বি এইচ ইউ থেকে স্বল্পকালীন ছুটি নিয়ে, আমার সি রি, পিলানীর সাইন্টিস্টদের সাথে রিসার্চ করার সুযোগ এসে গেল। এছাড়া ব্রিটিশ কাউন্সিলের অ্যাকাডেমিক লিঙ্ক ইন্টারচেঞ্জ স্কিম (এ এল আই এস—অ্যালিস)-এর একটা প্রোগ্রামে ব্রিটিশ কাউন্সিল তৃতীয় পার্টনার (অংশীদার) রূপে সি রি, পিলানী এবং ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির সাথে আমাকে এডপ্ট (গ্রহণ) করল। ব্রিটিশ কাউন্সিলের এই অ্যালিস প্রোগ্রামে ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মাবকাশে আমি ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটি গেলাম।

আমার প্রথম বিদেশ যাত্রায় আমি দিল্লী থেকে লন্ডনের হিথরো এয়ার পোর্টে নামলাম। সেখান থেকে লন্ডন রেল ষ্টেশনে এলাম এবং ট্রেনে চড়ে সেখান থেকে আমি ল্যাঙ্কাস্টার রেল ষ্টেশনে এলাম। রেল ষ্টেশনে আমাকে রিসিভ করতে ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির প্রফেসার আর জি কার্টার এলেন এবং সাথে এসেছিলেন সি রি, পিলানীর সাইন্টিস্ট এল এম জোশী, যিনি সেই সময়ে তিন মাসের জন্য প্রফেসার কার্টারের ল্যাবে কাজ করতে এসেছিলেন। (এল এম জোশী পরে আমার কাছে রিসার্চের কাজ করেন এবং বি এইচ ইউ-র পি এইচ ডি ডিগ্রী পান)। রেল ষ্টেশনে আমার হাত থেকে প্রফেসার কার্টার আমার স্যুটকেসটি নিয়ে নিলেন; তিনি এল এম জোশীকেও স্যুটকেসটি বহন করতে দিলেন না। এই সৌজন্য, তিনি বললেন, ইন্ডিয়া থেকেই শিখেছেন। প্রফেসার কার্টার একবার সি রি, পিলানীতে এবং বেনারসে বি এইচ ইউ-র আমাদের ডিপার্টমেন্টে এসেছিলেন। তাঁর এবং স্ত্রী অ্যাওনা ও তাঁর দুই ছেলের থাকার ব্যবস্থা ভেলুপুর এলাকায় আমাদের রবীন্দ্রপুরী কলোনির বাড়ীর কাছে ডায়মণ্ড হোটেলে করা হয়েছিল।

ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটিতে আমি ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুবের হেলিক্যাল স্ট্রাকচারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সস (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) এক্সপেরিমেন্ট করে বের করার পদ্ধতি বের করায় আত্মনিয়োগ করলাম। ইউনিভার্সিটি পরিসরে থ্রী বি এইচ কে ফ্ল্যাটে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। আমি ছাড়া সেই ফ্ল্যাটে একজন ইংরেজ প্রফেসার এবং ইতালিয়ান পোষ্ট ডক্টরাল ছাত্রী, সেলেনা, থাকতেন। আমরা 'কমোন' কিচেন শেয়ার করতাম। প্রায়ই এল এম জোশী ওর হস্টেল থেকে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে ডিনারের জন্য রান্না করতেন। পাহাড়ী ব্রাহ্মণ এল এম জোশী অবশ্যই নিরামিষাশী ছিল। ডিনারের সময় সেলেনা অপেক্ষা করত কখন এল এম জোশী এসে খিচুরী বানাবেন। আমাদের খিচুরী সেলেনার কাছে অমৃতের মতন লাগত। তবে আমাদের ডিনারে ক্যালোরির ঘাটতি দেখে সেলেনা শঙ্কিত হত। সেলেনার আনা ফল আমরা খেতাম। ওর রান্না করা মাংস আমি খেতাম; অবশ্যই নিরামিষাশী হওয়ার দরুন এল এম জোশী খেতেন না। অথচ অ্যানিম্যাল প্রোডাক্ট হওয়া সত্ত্বেও এল এম জোশী দুধ খেতেন দেখে সেলেনা অবাক হয়েছিল। ইন্ডিয়া সম্বন্ধে অনেক তথ্য সেলেনার জানা ছিল। সেলেনা অবহিত ছিল যে ইন্ডিয়ার

প্রাক্তন প্রাইম মিনিস্টার রাজীব গান্ধীর স্ত্রী ইতালিয়ান ছিলেন। উইক-এনন্ডে সেলেনার বয়ফ্রেন্ড সেলেনার কাছে আসত। আমাদের ফ্ল্যাটের কমোন ফোনে লন্ডন থেকে প্রায় প্রতিদিন পিসতুতো বোন রুমির ফোন সেলেনা ধরলে ও আমাকে ফোনটা দিয়ে বলত—এই নাও তোমার গার্লফ্রেন্ড রুমির ফোন। অনেক কষ্টে সেলেনাকে বুঝিয়েছিলাম যে রুমি আমার পিসতুত বোন, ও আমার গার্লফ্রেন্ড নয়।

ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসার কার্টারের পোষ্ট-ডক্টরাল ছাত্রী পিং ওয়াং আমার ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুবের হেলিক্যাল স্লো-ওয়েভ স্ট্রাকচারের একটা থিওরেটিক্যাল মডেলকে ওর ল্যাবে এক্সপেরিমেন্টাল মেজারমেন্ট দিয়ে প্রমাণ করতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। ওর পাবলিকেশনে আমার এই মডেলকে 'বসু মডেল' অভিহিত করে পিং ওয়াং আমাদের রিসার্চ মহলের বিশ্বের দরবারে আমাকে সম্মানিত করেছিল। তবে আমি যখন ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, পিং ওয়াং লন্ডনে ম্যাটার্নিটি লিভে ছিল। ল্যাঙ্কাস্টার থেকে দেশে ফেরার সময় আমি লন্ডনে রুমিদের বাড়ীতে বেশ কয়েকদিন ছিলাম। সেখান থেকে পিং ওয়াং-এর বাড়ী যাওয়ার সময় ওর সদ্যজাত মেয়েকে গিফ্ট হিসেবে প্রেজেন্ট করার জন্য একটা ফ্রক রুমি আমার হাতে দিতে ভুলল না। ভারতীয় নিরামিষ রান্নার রন্ধন প্রণালীর বই পড়ে পিং ওয়াং-এর মা তাঁর ছেলের সাথে মিলে আমার জন্য রান্না করার চেষ্টা করছিলেন। আমি আমিষাশী এবং চাইনিজ খাবারের ভক্ত জেনে ওদের আনন্দের সীমা থাকল না।

রুমিদের বাড়ীতে থাকাকালীন ইংলিশ ইলেকট্রিক্যাল ভাল্ব কোম্পানির আমন্ত্রণে সেই কোম্পানিতে আমার একটা দেড় ঘণ্টার লেকচারের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কোম্পানিতে মূলত ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুবের উৎপাদন হ'ত। প্রোডাকশনের কাজে অংশ গ্রহণ না করে আমার লেকচার শোনার জন্য জনা তিরিশেক ইঞ্জিনিয়ারের ম্যান-আওয়ার হিসেবে আর্থিক ব্যয়ভার এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই লেকচারের উপযোগিতার কথা মাথায় রেখেই কোম্পানি আমাকে এই আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। তাই প্রফেসার কার্টার এই আমন্ত্রণকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখলেন এবং গুরুত্ব দিয়ে ইউনিভার্সিটির নিউজে ফলাও করে আমার এই সম্মানকে সবার দৃষ্টিগোচর

করলেন। ইংলিশ ইলেকট্রিক্যাল ভাল্ব কোম্পানির বিভিন্ন ইউনিট ভিজিট করার সময় লক্ষ্য করলাম যে একটা এক্সপেরিমেন্টাল মেজারমেন্ট সেট-আপে কোন কাজ হচ্ছে না। একটি পার্ট যথা স্লো-ওয়েভ স্ট্রাকচারকে ট্রাভেলিন্গ-ওয়েভ ট্যুবের সাথে সমন্বিত করার আগে তার গুণাবলী এই মেজারমেন্ট সেট-আপে পরীক্ষা করে দেখার কথা। আমাকে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার জানালেন যে বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত আমাদের অ্যানালিসিসকে ভিত্তি করে তারা ঐ পার্টটিকে সঠিক ভাবে ডিজাইন করতে পারেন এবং তাই তাদের আর এই মেজারমেন্ট সেট-আপটির দরকার হছে না। যার ফলে কোম্পানি না কি তাদের অনেক ম্যান-আওয়ার সংরক্ষণ করতে পেরেছেন এবং এর জন্য তাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। রুমিদের বাড়ীতে থাকাকালীন এরপর একদিন ইম্পিরিয়াল কলেজের প্রাক্তনী রুমির ছেলে রিন্টু তার প্রাক্তন কলেজে আমাকে নিয়ে গেল। সেখানে ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের হেড আমাকে পরের দিন একটা লেকচার দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পরের দিন আমার সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেটিং বোর্ডের হেড এবং কিংগস কলেজের ভিজিটিং প্রফেসার ডঃ সুইফফ্ট-হুকের সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এবং তার একদিন পর আমার দেশে ফিরে যাওয়ার কথা। সেই কারণে ইম্পিরিয়াল কলেজে আমার লেকচার দেওয়া সম্ভব হল না। ডঃ সুইফফ্ট-হুকের সাথে আমার কিছু মুহূর্ত কাটানোর অনেক কথা আমি নবম অধ্যায়ে বিস্তারে লিখেছি।

যাই হোক, আবার আমার ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে থাকার সময়কার কথায় ফেরা যাক। আমাদের ফ্লাটের আশেপাশে ময়ূর ঘুরে বেড়াত। মর্নিং ওয়াকে কিছুটা দূরে একটা জলাশয়ের ধারে গেলে জল থেকে উঠে হাঁসের দল আমাকে ঘিরে খাবারের জন্য আবদার করত। ওরা জানত যে আমি ওদের জন্য খাবার এনেছি। ক্যাম্পাসে লাঞ্চের সময় একজন মহিলা তাঁর ছোট্ট একটি দোকানে খাবার বিক্রি করতেন। একটা বড় আলু সেদ্ধর মাঝে ফুটো করে তার ভিতর রান্না করা মাংসের কিমা, তাঁর দোকানের এই খাবারটি আমার প্রিয় ছিল। বাংলা দেশের দুই পোষ্ট-ডক্টরাল ছাত্রের রেষারেষির ফলে ওদের সাথে আমার একটা সম্পর্ক হল-এ বলে

আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে দ্যাখ'। তাদের বাড়ী থেকে আমার ঘন-ঘন ডিনারের নেমন্তন্ন হ'ত যেখানে মাছ-মাংসের এলাহি ব্যাপার থাকত। ওদের একজন স্ত্রী ও তাদের দুই ছোট্ট কন্যা সন্তানকে নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকত। অন্য জন ছিল অবিবাহিত, ক্যাম্পাসের একটি ফ্ল্যাটে সে একাই থাকত। ওর ঘরে একটি টেবিল জুড়ে খুচরো টাকা পয়সা ছড়ানো থাকত। ইউনিভার্সিটির রুম ক্লিনিং কর্মচারীরা ওর অবর্তমানে চাবি দিয়ে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকে ওর ফ্ল্যাট ক্লিন করে দিত। ওর টেবিল থেকে একটা পয়সাও খোয়া যেত না।

কয়েকদিনের জন্য ইউনিভার্সিটিতে এসে সদ্য পরিচিত একজনের খুব বমি আর পেট খারাপ হয়ে গেল। ফোন করে তিনি জানতে চাইলেন আমার কাছে কোন ওষুধ আছে কিনা। তিনি একটা প্যাকেট থেকে রান্না করা টুনা মাছ গরম করে খেয়েছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। প্যাকেটের উপর শুধু 'টুনা' লেখা ছিল, 'মাছ' লেখা ছিল না। তিনি যে ভুল করে নিরামিষাশী হওয়া সত্ত্বেও মাছ খেয়ে ফেলেছেন তা ওর এক আমিষাশী সহকর্মী তাঁকে জানিয়েছিলেন। এবং তার পরেই তাঁর বমি আর পেট খারাপ হয়েছিল। আমি ওখানকার একটা নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করলাম। আমার কাছে বেনারস থেকে আনা ওষুধ-পত্র ছিল। আমার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান থেকে আমি তাঁকে অ্যান্টি-অ্যালার্জি (অ্যাভিল) ওষুধ দিলাম; তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আমাদের ফ্ল্যাটে কোন টিভি ছিল না। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং-এর জায়গায়-জায়গায় টিভি-রুম ছিল। দশ-বারো জন বসতে পারে এমন একটা টিভি-রুমে একদিন আমি একাই ছিলাম এবং একটা প্রোগ্রাম দেখছিলাম। আগে থেকেই টিভিতে এই প্রোগ্রামটি চলছিল। সেই সময় একজন—দেখে মনে হল ইউনিভার্সিটির প্রফেসার—টিভি রুমে এলেন। আমাকে—এখুনি আসছি—বলে তিনি নিকটস্থ বার থেকে নিজের আর আমার জন্য গ্লাসে করে বিয়ার নিয়ে এলেন। আলাপচারিতায় জানা গেল তিনি ইউনিভার্সিটির প্রফেসার নন, তিনি একজন বাস-ড্রাইভার। তিনি একটি স্কুলের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এবং তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তাঁর বাসে ইউনিভার্সিটি ভিজিটে নিয়ে এসেছিলেন। ওনার সাথে আলাপ করে অনুভব করলাম ওই দেশ কতটা শ্রমের মর্য্যাদা বা 'ডিগনিটি অফ লেবার'-এ বিশ্বাসী। বাস-ড্রাইভার আর

প্রফেসারকে ওরা একই আসনে দেখেন।

আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের মধ্যে যারা বিদেশে থাকতেন তাদের 'উচ্চশ্রেণীর জীব' মনে করা হ'ত। খবরের কাগজে 'উচ্চ শিক্ষায় বিদেশ যাত্রা' আগ্রহ নিয়ে পড়া হ'ত। আমার এক পরিচিতা—এই রকম একটি উচ্চশ্রেণীর জীব—ল্যাঙ্কাস্টারের কাছেই থাকতেন। এই জীবটির রাজনৈতিক-আক্রমণ-থেকে-পালানো ভাইয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন জয়ন্তদা তাকে আশ্রয় দিয়ে এবং জয়ন্তদার ওয়ার্কশপে যথাযোগ্য বেতনে কাজ দিয়ে। একদিন ল্যাঙ্কাস্টার থেকে সেই 'জীব'টিকে ফোন করলাম। আমার ফোন পেয়ে এই জীবটি আমাকে বলল—আমাকে ফোন করলি কেন? তুই এখানে কি করতে এসেছিস? তোকে কোন টাকা পয়সা দিতে পারব না। আমার ভাইটিও আমার কাছে টাকা চায় কারণ তোর দাদা জয়ন্ত ওর ওয়ার্কশপে ওকে বিনা বেতনে কাজ করায়। যা-বাব্বা, যেমন জীব, তেমন তার ভাই, এই জীব আর তার ভাইকে আমার বাই-বাই।

ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন রিসার্চ সংক্রান্ত চিঠি-পত্রের মাধ্যমে পরিচিত প্রফেসার এ জে স্যাঙ্গস্টার একদিন আমাকে হ্যারিয়ট-ওয়াট ইউনিভার্সিটিতে তাঁর ল্যাব পরিদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ঠিক হল, ল্যাঙ্কাস্টার থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে এডিনবরা রেল স্টেশনে প্রফেসার স্যাঙ্গস্টার আমাকে রিসিভ করবেন। উনি আমাকে আগে কোন দিনও দেখেননি। স্যাঙ্গস্টার যাতে আমাকে সহজে চিনতে পারেন তার জন্য আমি ওনাকে টেলিফোনের মাধ্যমে ঠাট্টার ছলে আমার চেহারার একটা বিবরণ দিলাম হ্যান্ডসাম, ফর্সা এবং লম্বা। এর উলটোটাই যে আমি হব তা তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে গিয়ে এডিনবরা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রফেসার স্যাঙ্গস্টারের আসতে একটু দেরী হল। প্রায় জনশূন্য প্ল্যাটফর্মের একটি বেঞ্চে বসে থাকা আমাকে প্রফেসার স্যাঙ্গস্টারের চিনতে কোন অসুবিধা হল না। রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা দুটো আলাদা রাস্তা দিয়ে একই জায়গায় মিলিত হয়েছিলাম। (নিজেদের আলাদা-আলাদা অ্যানালিসিসের পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা জাইরোট্রনের একই ডিস্পারশন রিলেশনে উপনীত হয়েছিলাম)।

প্রফেসার কার্টার ইউনিভার্সিটি থেকে একটু দূরে ভারী সুন্দর গ্রামের

পরিবেশে তাঁর নিজেদের বাড়ীতে থাকতেন। সেখান থেকেই তিনি ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত করতেন। এল এম জোশী আর আমাকে তিনি একদিন তাঁর বাড়ীতে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। এলাহি খাবার-দাবারের মাঝে প্রফেসার কার্টারের স্ত্রী অ্যাওনার হাতে-গড়া রুটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শ্রীমতি অ্যাওনা প্রফেসার কার্টারের সাথে সি রি, পিলানী গিয়েছিলেন। সেখান থেকে শ্রীমতি অ্যাওনা রুটি বানানো শিখে এসেছিলেন। খাওয়ার সময় দু'হাত না লাগিয়ে এক হাতেই আঙ্গুল দিয়ে কি করে রুটি ছিঁড়ে খেতে হয় তা তিনি সবাইকে দেখাচ্ছিলেন। এল এম জোশী আর আমি ছাড়া প্রফেসার কার্টার আরও এমন কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করলেন যারা কোন না কোন সময়ে ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সেখানকার খবরের শিরোনামে ছিল আর্থিক অনুদানের অভাবে বন্ধ হওয়ার মুখে একটি বৃদ্ধাশ্রম। সেই নিয়ে নিমন্ত্রিত অতিথিরা আলোচনা করছিলেন। এল এম জোশি বললেন ইন্ডিয়াতে আমাদের বৃদ্ধাশ্রমের কোন প্রয়োজন হয়না। সেখানে বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছোটরা নিয়ে নেয়, আর সেই সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা গর্ব আর আনন্দ অনুভব করে। সত্যি তো আমার মাকে নিজের কাছে রাখার জন্য আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি চলতে থাকত। কিন্তু নিমন্ত্রিতদের একজন আমাদের বললেন যে দেশ উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাবে আর কর্মসূত্রে সবাইকে নিজেকে দেশের ভেতরে এবং বাইরে ছড়িয়ে থাকতে হবে এবং সেমতাবস্থায় বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে বাধ্য। এতদিন পরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশেও বৃদ্ধাশ্রম আছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। তবে অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে কি বলা যায় যে আমাদের দেশ উন্নতি করছে। সব মিলিয়ে প্রফেসার কার্টারের বাড়ী সেই রাতের মুহূর্তগুলো আমার মনের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

ল্যাঙ্কাস্টারের গির্জা দেখে আমার কলকাতার সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল চার্চের কথা মনে পড়ল। ল্যাঙ্কাস্টার লাগোয়া আইরিশ সি-র সাথে যুক্ত মোরক্যাম্ব বে এল এম জোশি এবং আমার খুব ভাল লাগল। সেখানে মেলায় একটা অ্যাম্যুসমেন্ট গেম খেলে প্রাইজ হিসেবে একটা দৈর্ঘ্য মাপার টেপ পেয়েছিলাম। তিরিশ বছর পরেও মণিকুন্তলা সেটা ব্যবহার করে চলেছে।

আমি আর ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির পোষ্ট-ডক্টরাল ছাত্র ধীমান চৌধুরী ল্যাঙ্কাস্টার থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে নয়নাভিরাম পাহাড় আর ঝিলে ঘেরা লেক-ডিসট্রিক্ট বেড়াতে গেলাম। এল এম জোশি আগেই লেক-ডিসট্রিক্ট বেড়িয়ে এসেছিলেন। এল এম জোশি বলেছিলেন লেক ডিসট্রিক্টের সাথে উত্তারাখণ্ডের পাহাড় আর ঝিলের সাদৃশ্যে ওর দেশের বাড়ী কুমায়ুনের জন্য মন কেমন-করে উঠেছিল। উইন্ডারম্যার লেকের উপর নৌযান-ভ্রমণে (ক্রুজে) আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। ল্যাঙ্কাস্টার থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে আমি এবং এল এম জোশী ম্যানচেস্টার বেড়াতে গিয়েছিলাম। কলকাতা ও লন্ডনের মতন ম্যানচেস্টারেও পরিবহনের জন্য ট্রাম দেখতে পেলাম। আমরা সেখানে হিস্ট্রি ম্যুজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারি দেখলাম। ম্যানচেস্টার থেকে আমরা দুজনেই রেডিও অ্যালার্ম কিনলাম। সেই সময় বিদেশী জিনিসের খুব কদর ছিল। ম্যানচেস্টার থেকে আমার পরিধানযোগ্য একটা 'বিদেশী' জ্যাকেট কিনলাম। পরে নজরে এল জ্যাকেটটি 'মেড ইন দিল্লী'।

এল এম জোশীর হস্টেলে একদিন সন্ধ্যের সময় গিয়ে ওদের বিশাল কমন রুম থেকে হৈ-চৈ আর ঘন-ঘন হাততালির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম এল এম যোশী কি করে লুচি বেলতে আর ভাজতে হয় তার প্র্যাক্টিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছেন। ভাজার সময় লুচি ফুলে ওঠার মুহূর্তে সমবেত দর্শকবৃন্দ করতালি দিয়ে এল এম জোশীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। অভিনন্দনের সেই মুহূর্ত আজও ভুলতে পারি না।

# রামচন্দ্র রাও-এর পাশের বাড়ী

ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটি থাকাকালীন হেলিক্যাল স্ট্রাকচারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সস এক্সপেরিমেন্ট করে বের করার পদ্ধতি বের করেছিলাম। আমার এই কাজের উপর নির্ভর করে একটা এক্সপেরিমেন্টাল সেট-আপ তৈরি করার ইচ্ছে নিয়ে আমি ল্যাঙ্কাস্টার থেকে বেনারসে ফিরে এলাম। এই কাজের দায়িত্ব আমি বি এইচ ইউ-তে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বি টেক ছাত্র জগদীশ্বর রাওকে দিলাম।

মনে পড়ল সেই দিনের কথা যে দিন সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র জগদীশ্বর রাও বি এইচ ইউ-র গ্রীষ্মাবকাশের প্রাক্কালে আমাকে অনুরোধ করল ওকে একটা রিসার্চ প্রবলেম দেওয়ার। ও গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে ওর বাড়ী রাউলকেল্লা না গিয়ে আমার দেওয়া রিসার্চ প্রবলেমের উপর কাজ করতে চাইল। সেই সময় ইউনিভার্সিটির দীর্ঘ অবকাশে ছাত্রছাত্রীদেরকে হস্টেল খালি করে দিতে হ'ত। তাই ওকে জিজ্ঞেস করলাম ও কোথায় থাকবে। উত্তরে বলল ও কোথাও থাকবে না, ও ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে। আমার সাথে কাজ করে কিছুদিনের মধ্যে আমার সাথে অনেকগুলি পেপার প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে পাবলিশ করে জগদীশ্বর সবাইকে অবাক করে দিল।

আমার ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির কাজের ভিত্তিতে, আমার নির্দেশে, জগদীশ্বর ডিপার্টমেন্টে হেলিক্যাল স্ট্রাকচারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সস বের করার একটি এক্সপেরিমেন্টাল সেট-আপ তৈরি করে ফেলল। আমি যখন একটা প্রজেক্ট রিভিউ করতে মাইক্রোওয়েভ ট্যুব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এম টি আর ডি সি), ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম, তখন সেখানকার তদানীন্তন ডিরেক্টার ডঃ এম ডি রাজ নারায়ণ এম টি আর ডি সি-তে ঐ একই রকম একটা এক্সপেরিমেন্টাল সেট-আপ তৈরি করার জন্য আমার সাহায্য চাইলেন। আমি ডঃ রাজ নারায়ণকে বললাম—আমি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে জগদীশ্বরকে 'সামার-ট্রেনী' হিসেবে এম টি আর ডি সি-তে পাঠাব, তবে ওকে 'গ্রুপ-লিডার' হিসেবে আপনাকে গ্রহণ করতে

হবে এবং ওকে ওর কথা মতন কাজের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এবং এ ছাড়া ওর আতিথেয়তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। এম টি আর ডি সি-তে জগদীশ্বরকে ওর দরকার মতন ইক্যুইপমেন্ট দেওয়া হল। ল্যাবে ওর আবশ্যকীয় স্টেপার-মোটর পাওয়া গেল না। ও জাঙ্কে পড়ে থাকা প্রিন্টার থেকে স্টেপার-মোটর জোগাড় করে নিল। ওর চাহিদা মতন একটা কম্প্যুটার পাওয়া গেল কিন্তু সেটা ডিফেক্টিভ ছিল এবং সেটাকে ঠিক করার জন্য শহর থেকে এক মেকানিক ডাকা হল। তার আসতে দেরী হচ্ছে দেখে জগদীশ্বর নিজেই কম্প্যুটারটা সারিয়ে নিল। ডঃ রাজ নারায়ণের অনুরোধ মতন জগদীশ্বরের প্রচেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই এম টি আর ডি সি-তে এক্সপেরিমেন্টাল সেট-আপটি তৈরি হয়ে গেল।

একদিন বি এইচ ইউ-তে আমাদের ডিপার্টমেন্টের 'বেস্ট টিচার' সকলের প্রিয় প্রদীপ (মুখার্জী) আমার কাছে জগদীশ্বরকে নিয়ে ওর শঙ্কা ব্যক্ত করলেন। তার কারণ মুখার্জী যে বিষয় পড়াতেন সেই বিষয়ে জগদীশ্বর 'বি' গ্রেড পেয়েছে। মুখার্জী আমাকে সাবধান করে দিলেন আমার সাথে রিসার্চে সময় দিতে গিয়ে জগদীশ্বর যেন বি টেক-এর রেজাল্ট খারাপ করে ওর ক্যারিয়ার নষ্ট না করে। এই প্রসঙ্গ ওর কাছে তুলতেই জগদীশ্বর আমাকে হিন্দিতে বলল—আপ ভী গ্রেড কী চক্কর মেঁ হৈ ক্যা? চলিয়ে, আপকো অভীসে বঢ়িয়া গ্রেড মিল জায়গা। পরে বি টেক-এ ফার্স্ট ব্যাঙ্ক পেয়ে জগদীশ্বর আমাকে নিশ্চিন্ত করেছিল। মনে পড়ে একটা মুহূর্তের কথা। একদিন জগদীশ্বর আমার পাশে বসে যখন কম্প্যুটারে কাজ করছিল, তখন মুখার্জী একটা কাগজে একটা প্রবলেম আর মুখার্জীর করা তার সল্যুশন জগদীশ্বরকে দেখিয়ে সল্যুশনটা ঠিক হয়েছে কিনা জগদীশ্বরের কাছে জানতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটি ক্লাসে, যেখানে জগদীশ্বরও থাকবে, মুখার্জীর এই প্রবলেমটা আলোচনা করার কথা। মুখার্জীর সল্যুশনটা দেখে জগদীশ্বর, আমি শুনলাম, মুখার্জীকে বলল—ঠিক তো হৈ, আপকা কনফিডেন্স কিউঁ নহী হৈ? সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেল যখন, আমি একটা থিওরি ক্লাস নিচ্ছিলাম, জগদীশ্বর আমার প্রথম লেখা ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত বইটি আমাকে এবং ক্লাসের সবাইকে দেখাল। কিছুক্ষণ আগেই আমার হয়ে জগদীশ্বর ডাক-পিওনের কাছ থেকে বইটি রিসিভ করেছিল।

জগদীশ্বরের বাবা আমাকে বলেছিলেন তাঁর স্বপ্ন যে তাঁর ছেলে ডি আর ডি ও জয়েন করে দেশের সেবা করুক। দিল্লীতে সেনা ভবনে তদানীন্তন ডি আর ডি ও-র হেড এবং ডিফেন্স মিনিস্ট্রারের সায়েন্টিফিক এডভাইসার পদ্মভূষণ ডঃ ভি কে আত্রেকে আমি জগদীশ্বরের বায়ো-ডাটা দিয়ে অনুরোধ জানালাম জগদীশ্বরকে ডি আর ডি ও-তে নিয়ে নিতে। একটা রিভিউ মীটিং থেকে ফেরার পথে পদ্মশ্রী ডঃ আর পি শেনয় আমাকে নিয়ে সেনা ভবনে গিয়েছিলেন ডঃ আত্রের সাথে দেখা করতে। আমরা একসাথে লাঞ্চ করলাম ডঃ আত্রের বাড়ী থেকে আনা লাঞ্চ-বক্সের ভাগ বসিয়ে আর তার সাথে সেনা ভবনের ক্যান্টিন থেকে আনা খাবার দিয়ে। ডঃ আত্রে জগদীশ্বরের বায়ো-ডাটা পড়ে ভবিষ্যৎবাণী করলেন—প্রফেসার বসু, জগদীশ্বরের বাবার স্বপ্ন পূর্ণ হবে না। ছেলে বাবাকে নিরাশ করে ইউ এস এ চলে যাবে। সত্যি তাই হল। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কিং-এ প্রথম মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি জগদীশ্বরের অ্যাপলিকেশনের ভিত্তিতে ওকে ওদের পি এই ডি প্রোগ্রামে নিতে রাজি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কিং-এ দ্বিতীয় ম্যাসাচুসেট ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজি (এম আই টি) থেকে প্রফেসার রিচার্ড টেমকিন আমাকে চিঠি লিখলেন যে যদি আমি জগদীশ্বরকে আমার পি এইচ ডি প্রোগ্রামে না নিয়ে থাকি তবে ও যেন এম আই টি-তে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে। জগদীশ্বর—এখন ইউ এস এ-র নাগরিক—এম আই টি থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী নিয়ে ওখানে একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে।

অনেক পড়াশুনা করে তৈরি হয়ে বি এইচ ইউ-তে ক্লাসে পড়াতে যেতাম। পড়ানোর সময় সাথে কোন ক্লাস-নোট নিয়ে যেতাম না। ম্যাথেমেটিকাল ডিডাক্শনের সময় দরকার হলে পড়ুয়াদের ব্ল্যাকবোর্ডে ডেকে নিতাম। ক্লাসের শেষে আমি যা পড়ালাম তা পড়ুয়াদের মধ্যে একজনকে সামারাইজ করতে বলতাম যেমনটি আমাদের ছাত্রাবস্থায় ক্লাসের শেষে আমাদের এন বি সি স্যার বলতেন। এছাড়া পড়ানোর বিষয় নিয়ে পড়ুয়াদের প্রশ্নপত্র বানাতে বলতাম। আমার ক্লাসে পিন-ড্রপ সাইলেন্স ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতাম না। মনে আছে জামশেদপুর আর আই টি-তে একবার ভূমিকম্পের সময় যখন অন্যান্য ক্লাসের সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আমার ক্লাসে আমরা কেউ ভূমিকম্প যে হচ্ছে তা টেরই পাইনি।

বি এইচ ইউ-তে একবার আমার ক্লাস থেকে একটি ছাত্রীকে আমার পড়ানোর সময় ক্লাস থেকে বের করে দিলাম যখন ও আমার বারণ করা সত্ত্বেও ওর পাশে বসা আরেকটি ছাত্রীর সাথে কথা বলে আমার মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। ছাত্রীটি এরপর থেকে খুব সিরিয়াস হয়ে গেল। ও ফার্স্ট র‍্যাঙ্ক নিয়ে ওর বি টেক ডিগ্রী পেয়েছিল। যে ছাত্রী-বন্ধুটির সাথে ও আমার ক্লাসে কথা বলে আমার শাস্তি পেয়েছিল, সেই বন্ধুটি আমাকে মজার ছলে বলেছিল যে আমি যদি ওকেও ক্লাস থেকে বের করে দিতাম, তা হলে হয়ত ফার্স্ট র‍্যাঙ্কটি ওরা দুজনায় ভাগাভাগি করে পেত। আমার এম টেক ক্লাসের ছাত্র সুধীর (ডঃ সুধীর কামাথ)—যে পরে ডি আর ডি ও-র ল্যাব এম টি আর ডি সি-র ডিরেক্টার এবং তার পরে ডি আর ডি ও-র একটি ক্লাস্টারের ডিরেক্টার জেনারেল হয়েছিল—আমার ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক থিওরি বিষয়টি পড়ানো সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছিল—প্রফেসার বসু, যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত-পিপাসু ছিলেন, ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ফরমুলেশন (সূত্রাকারের প্রকাশ)-কে সঙ্গীত-রচনার সাথে তুলনা করতেন। তিনি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন যে ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক থিওরি শুধু পাঠ্য-বিষয়ই নয়, এটা যেন একটা লিরিক বা গীতি-কবিতা রচনা করার ভাষা!

আমি যখন বি এইচ ইউ-তে আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলাম, পঙ্কজ কুমার দালেলা—যে এখন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেলিম্যাটিক্স (সি ডট)-এর ডিরেক্টার—আমাদের ডিপার্টমেন্টের এম টেক অ্যাডমিশন কমিটির কাছে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল। সেই সময়ে ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে আমি এম টেক অ্যাডমিশন কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলাম। জি এ টি ই (গেট)-স্কোর অনুযায়ী যখন পঙ্কজের টার্ন এল তখন শুধু মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিম-এ সীট খালি ছিল। কিন্তু পঙ্কজ শুধুই কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিম-এ ইন্টারেস্টেড ছিল। তাই অ্যাডমিশন না নিয়ে পঙ্কজ চলে যাচ্ছিল। আমি পঙ্কজকে আটকালাম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি জানো না যে মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভেতরে মাইক্রোওয়েভ কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিহিত আছে? আমি পঙ্কজকে এও বললাম যে ও যদি আমাদের

এম টেক-এর চারটে স্ট্রিম মিলিয়ে ফার্স্ট ব্যাঙ্ক পায়, তবে আমাদের সাথে সি ডট-এর একটা চুক্তি অনুযায়ী সি ডট-এ ওর প্লেসমেন্ট পাক্কা, যেখানে ও চুটিয়ে কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার করতে পারবে। আমার যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে পঙ্কজ আমাদের ডিপার্টমেন্টের এম টেক কোর্সে অ্যাডমিশন নিল এবং চুক্তি অনুযায়ী এম টেক-এ ফার্স্ট ব্যাঙ্ক নিয়ে সি ডট জয়েন করল। (আগেই বলেছি যে পঙ্কজ এখন সি ডট-এর ডিরেক্টার, যার জন্য আমি গর্বিত)।

বি এইচ ইউ-তে আমাদের ডিপার্টমেন্টে পঙ্কজ আমার কাছে ওর এম টেক-এর প্রজেক্টের কাজ করেছিল। এই প্রজেক্টে ওকে একটি মাইক্রোওয়েভ স্ট্রাকচারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সস বের করতে বলেছিলাম এক্সপেরিমেন্টাল মাইক্রোওয়েভ মেজারমেন্ট সেট-আপ তৈরি করে। মেকানিক্যাল স্ট্রাকচারটি তৈরি করতে দেওয়া হয়েছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টের সি আর এম টি-র ওয়ার্কশপে। সেই সময়ে আমাদের ওয়ার্কশপে সি আর এম টি-র একটি স্পন্সর্ড প্রজেক্টের কল্যাণে বিদেশ থেকে 'শবলিন' লেদ মেশিন এবং 'ডেকেল' মিলিং মেশিন দিয়ে সুক্ষ্ম কাজ হ'ত। আমি তখন ডিপার্টমেন্টের হেড ছাড়াও সি আর এম টি-র ওয়ার্কশপের ইনচার্জ ছিলাম। একদিন জনৈক ওয়ার্কশপ মেকানিক একটি জব ভাউচার হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললেন—একটি ছাত্র শ্রী পঙ্কজ দালেলা ওর এম টেক-এর প্রজেক্টের ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত কাজ নিজের হাতে করতে চায়। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীদের সি আর এম টি-র ওয়ার্কশপে কাজ করার অনুমতি নেই। আমি কি করব? উত্তরে আমি ওয়ার্কশপ মেকানিককে আশ্বাস দিলাম—ওয়ার্কশপের ইনচার্জ হিসেবে আমি শ্রী পঙ্কজ দালেলাকে ওয়ার্কশপে কাজ করার বিশেষ পারমিশন দিলাম। অবশ্যই পঙ্কজ আমাদের নিরাশ করেনি। ও নিজের হাতে ওয়ার্কশপে স্ট্রাকচারটি তৈরি করে এবং মাইক্রোওয়েভ মেজারমেন্ট সেট-আপে স্ট্রাকচারটির ক্যারেক্টারিস্টিক্সস বের করে।

ওর এম টেক-এর প্রজেক্টের কাজকে ভিত্তি করে প্রসিদ্ধ জার্নালে একটা রিসার্চ পেপার প্রকাশিত করতে সাহায্য করার জন্য পঙ্কজ আমাকে অনুরোধ জানাল। পঙ্কজ ওর পেপারের ম্যানুস্ক্রিপ্টের একটা ড্রাফট তৈরি করেছিল।

ওই ড্রাফটটা দেখার সুযোগ পেলাম যখন আমি পঙ্কজের সাথে চুনার রেল ষ্টেশনে যাচ্ছিলাম জামশেদপুরে যাওয়ার জন্য—অমৃতসর এক্সপ্রেস ধরার জন্য। চুনার রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমরা পেপারের ম্যানুস্ক্রিপ্ট জার্নালে পাঠাবার উপযোগী করে তুললাম। পরিশেষে পঙ্কজের প্রথম পেপার জার্নালে ছাপা হল।

কিন্তু কোন এক সময়ে ডিপার্টমেন্টে পঙ্কজকে খুব অমনোযোগী হতে দেখলাম। পঙ্কজের বাবা কানপুরের কাপড়-কলে কাজ করতেন। কিন্তু সেই সময় কানপুরে অনেক কাপড়-কল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তাঁর তখন কোন কর্মসংস্থান ছিল না। পঙ্কজের পরিবার পঙ্কজের বোন বাবলীর বিয়ে নিয়ে খুব উৎকণ্ঠিত ছিল। পঙ্কজ আমার কথা মতন ওর মা আর বাবলীকে নিয়ে আমাদের বি এইচ ইউ-র নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে চলে এল। সেখান থেকে বাবলীর বিয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু হল। বাবলীর এম ফিল ডিগ্রী ছিল। বাবলীর বিয়ে ডিফেন্সের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কর্মরত এক সাইন্টিস্টের সাথে হল। পঙ্কজ নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কাজে মন দিল। সেই সময় আমরা মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সুবিখ্যাত প্রফেসার রামচন্দ্র রাওয়ের কোয়ার্টারের পাশের কোয়ার্টারে থাকতাম। এই অধ্যায়ের সমাপন প্রফেসার রামচন্দ্র রাওকে নিয়ে একটা ছোট গল্প দিয়ে করার ইচ্ছে রইল। আমার প্রথম বইটির হাতে-লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট টাইপ করেছিল সহকর্মী প্রদীপ (জৈন), আমি যার পি এইচ ডি-র সুপারভাইসারও ছিলাম। পঙ্কজের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল হাতে-লেখা এবং টাইপ করা ম্যানুস্ক্রিপ্ট মিলিয়ে দেখা। (ওয়ার্ল্ড সাইন্টিফিক পাব্লিশার্স দ্বারা প্রকাশিত বইটির নাম 'ইলেকট্রোমেগনেটিক থিওরি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন্স ইন বিম-ওয়েভ ইলেক্ট্রনিক্স')। এই বইটির কথা লিখতে গিয়ে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। সম্প্রতি (৬-১২ সেপ্টেম্বর ২০২২) আমি পিলানী গিয়েছিলাম ওখানকার সি রি-তে লেকচার দিতে। সি রি-র লাগোয়া বিড়লা ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজি অ্যান্ড সায়েন্স (বি আই টি এস) ক্যাম্পাসে একটি বইএর দোকানে গেলাম দেখতে যে দোকানে আমার লেখা কোন বই আছে কিনা। আমার নাম বলাতে বিক্রেতা দোকানের মালিক নিজেই ওয়ার্ল্ড সাইন্টিফিক পাব্লিশার্স দ্বারা প্রকাশিত আমার বইটির নাম উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন বইটির অনেকগুলি কপি তিনি বি আই

টি এস এবং সি রি-র লাইব্রেরীতে বিক্রি করেছেন। (বইটির দাম বেশি হওয়াতে লাইব্রেরীর পক্ষেই বইটি কেনা সম্ভব। ১৯৯৬ সালে বইটির দাম যদ্দূর মনে পড়ে দশ হাজারের উপর ছিল)।

সি রি, পিলানী থেকে একবার রোড-ওয়েতে নিউদিল্লী রেল-স্টেশনে এসে কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেসে বেনারস ফিরছিলাম। স্টেশনের কাছেই ছিল পুসা রোডের উপর পঙ্কজের তদানীন্তন কর্মস্থল সি-ডট এবং রাজেন্দ্র নগরে ওর ভাড়া বাড়ী। পঙ্কজ আমাদের ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে টিফিন ক্যারিয়ারে করে ওর বাড়ী থেকে আমার জন্য লাঞ্চ নিয়ে এল। অত্যন্ত তৎপরতা ও যত্নের সাথে আমাকে লাঞ্চ করিয়ে আমাকে বিদায় জানিয়ে যখন পঙ্কজ ফিরে গেল, তখন আমাদের এক সহযাত্রী, যার গ্রামের বাড়ী কানপুর অঞ্চলে, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার হিন্দিতে বিহারী টান আছে, অথচ আপনার ছেলের হিন্দিতে কানপুরিয়া টান কি করে এল? আমি বললাম—পঙ্কজজী কানপুর কে রহনেওয়ালে হৈঁ। উনকে মাতা-পিতা কানপুর মে রহতে হৈঁ। মৈঁ বঙ্গালী হূঁ। পঙ্কজজী বি এইচ ইউ-মে মেরা ছাত্র হূআ করতে থে।

পঙ্কজ আর বৌমা ছায়া (সাক্সেনা (দালেলা)) ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ই সি ই) বিষয়ে কানপুরের হার্টকোর্ট বাটলার টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে বি টেক করেছিল। পরে এক্সটারনাল ক্যান্ডিডেট হিসেবে পঙ্কজ বি এইচ ইউ থেকে এবং ছায়া উত্তর প্রদেশ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি করে। এখন ছায়া জে এস এস অ্যাকাডেমি অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন-এর ই সি ই ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার। ভুলতে পারিনা সেই মুহূর্তটির কথা যখন পঙ্কজদের বাড়ীতে আমি চশমা পরে প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছিলাম তখন পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে ছায়া আমার চোখ থেকে চশমাটি খুলে নিল।

আমার বড় ছেলে বিল্কু বি এইচ ইউ-র ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স থেকে এম বি বি এস এবং এম ডি পাশ করার পর দিল্লীর অ্যাপোলো হসপিটালে কাজ করার আহ্বান পেল। ঠিক হল যত দিন না বিল্কুর একটা নিজস্ব বাসস্থান হচ্ছে বিল্কু ওর এক বন্ধুর সাথে থাকবে। পঙ্কজ তখন সি-ডট-এ কর্মরত। বিল্কুকে সি-অফ করতে বেনারস রেল স্টেশনে এসে

দেখলাম অনেক বই থাকার দরুন বিল্কুর অনেক ভারী লাগেজ হয়ে গেছে। তাই পঙ্কজকে টেলিফোন করে বললাম বিল্কুকে নিউদিল্লী রেল স্টেশনে রিসিভ করে বিল্কুর গন্তব্যস্থলের জন্য একটা অটোরিক্সা ধরিয়ে দিতে। পঙ্কজ বিল্কুকে সোজা নিজের বাড়ীতে নিয়ে তুলল। ওর যুক্তি ছিল বিল্কুর ভাই থাকতে বিল্কু কেন ওর বন্ধুর বাড়ীতে থাকবে। আগে আমি লিখেছিলাম যে বিল্কু ওর ছেলে বেলায় একবার আমার মাকে অনুযোগ করেছিল যে কেন সে তার একটি ছেলে (ঝালা)-কে এত দূর রোজগার করতে পাঠাল। ঝালাকে বিল্কু আমার এক ভাই হিসেবেই জানত। 'হিষ্ট্রি' কি 'রিপিট্স ইটসেল্ফ' (ইতিহাসের কি পুনরাবৃত্তি' হয়)? তাই তো বুঝি পঙ্কজের এক ছেলে (আনমোল) আর এক মেয়ে (গুনগুন) কেন যে তাদের এক দাদাজী (আমি) আর দাদীজী (মণিকুন্তলা) নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলত ভেবে অবাক হ'ত।

শিক্ষক ছাত্রদের পুত্রবৎ এবং ছাত্রীদের কন্যাবৎ স্নেহ করেন। মণিকুন্তলা আমার ছাত্রদের পি এইচ ডি থিসিস যাতে ভালোয়-ভালোয় উতরে যায় তার জন্য বেনারসের সঙ্কটমোচন মন্দিরে মানত করত। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি— আমি যখন পি এইচ ডি-র জন্য রিসার্চ করতাম আমার রিসার্চ গাইড এন বি সি স্যার এবং গুরুমা ঝর্ণা বৌদি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। এই অধ্যায়ের সমাপন প্রফেসার রামচন্দ্র রাওকে নিয়ে একটা বড়ই ছোট গল্প-হলেও-সত্যি দিয়ে করছি। গল্পটা –নিম্নরূপ—

আমি তখন সপরিবারে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির আমাদের হায়দ্রাবাদ কলোনির কোয়ার্টার থেকে নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভে শিফ্ট করেছি। সেই সময় আমাদের হায়দ্রাবাদ কলোনির প্রতিবেশী বিখ্যাত আর্টিস্ট সত্যেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয় আমাদের নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে আসার আগে একটা 'ল্যান্ডমার্ক' জানতে চাইলেন। নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভে কোয়ার্টারের সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকতেন বিখ্যাত মেটালার্জিস্ট প্রফেসার রামচন্দ্র রাও যিনি পরে জামশেপুরের ন্যাশনাল মেটালার্জিকাল ল্যাবরটরির ডিরেক্টর এবং তারও পরে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। প্রফেসার রামচন্দ্র রাওয়ের কোয়ার্টারই যে ইপ্সিত ল্যান্ডমার্ক সেটা আমি লাহিড়ী মহাশয়কে জানালাম। আমি লাহিড়ী মহাশয়কে

বললাম—যে কেউ আপনাকে প্রফেসার রামচন্দ্র রাওয়ের কোয়ার্টার দেখিয়ে দেবেন, আর তার পাশের কোয়ার্টারটাই আমাদের।

লাহিড়ী মহাশয় আমাদের কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনার আমাদের কোয়ার্টার চিনতে অসুবিধে হয়েছিল কি? উত্তরে তিনি বললেন—আমি আপনার কথা মতন একজনকে 'ল্যান্ডমার্ক' প্রফেসার রামচন্দ্র রাওয়ের কোয়ার্টার কোথায় জানতে চাইলাম। যাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন—সোজা চলে যান। প্রফেসার বৈদ্যনাথ বসুর কোয়ার্টারের পাশেরটাই প্রফেসার রামচন্দ্র রাওয়ের কোয়ার্টার। এবার বুঝে নিন কার কোয়ার্টার কার কোয়ার্টারের ল্যান্ডমার্ক। লাহিড়ী মহাশয়কে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি ঘটনাটির সত্যতার কথা। উত্তরে তিনি মুচকি হেসে আমাকে সাসপেন্সে রেখে দিয়েছেন। সত্যি-গল্পটির নাম রাখলামঃ রামচন্দ্র রাও-এর পাশের বাড়ী।

# ‘মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে’

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে (বি এইচ ইউ-তে) আমার কিছু অভিজ্ঞতার মুহূর্ত আমি দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে ধরে রাখার প্রয়াস করেছি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও কিছু মুহূর্ত এই অধ্যায়ে ধরার চেষ্টা শুরু করা যাক বি এইচ ইউ-তে থাকাকালীন আমার হস্টেল পরিচালনার অভিজ্ঞতা দিয়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমার ছাত্রজীবনে কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেলে থাকার নানা মুহূর্ত বর্ণনা করার সময় লিখেছিলাম যে ছাত্রজীবনে সম্ভব হলে কিছু সময় সকলের হস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে এও সত্যি যে শিক্ষক-জীবনেও সম্ভব হলে কিছু সময় সকলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুধু ক্লাস রুমে নয় ক্লাসের বাইরেও জানার অভিজ্ঞতাও হওয়া উচিত, যথা হস্টেলে, ক্রীড়াঙ্গনে, এবং কালচারাল ফেস্টিভ্যালে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের হস্টেল পরিচালনার অভিজ্ঞতাও থাকা উচিত।

বি এইচ ইউ-র ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজির জন্য তখন একটি মেয়েদের হস্টেল নিয়ে এগারটি হস্টেল ছিল এবং হস্টেল কোঅর্ডিনেটার ছিলেন আমাদের ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এস কে শ্রীবাস্তব। (ইন্সটিট্যুটের এখনকার নাম আই আই টি, বি এইচ ইউ)। প্রফেসার শ্রীবাস্তব আমাকে একটা সুযোগ করে দিলেন বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসের বাইরে রবীন্দ্রপুরীর ভাড়া বাড়ী থেকে বি এইচ ইউ-র কোয়ার্টারে শিফ্ট করার। অতঃপর আমাদের নতুন ঠিকানা হল বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসের মেইন গেট (মুখ্য-দ্বার) থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের দিকে অবস্থিত নিউ জি ২০, হায়দ্রাবাদ কলোনি। পরিবর্তে আমাকে বিশ্বকর্মা হস্টেলের ওয়ার্ডেনের দায়িত্ব নিতে হল। বিশ্বকর্মা হস্টেলের পশ্চিমে অনতিদূরে আমাদের কোয়ার্টারের অবস্থান ছিল। যে রাস্তায় আমাদের কোয়ার্টার ছিল সেই রাস্তার প্রচলিত নাম ছিল ‘জামুন লেন’। এই রাস্তায় সারি সারি জামুন অর্থাৎ জাম গাছ ছিল। আমাদের কোয়ার্টারের ভিতরে তিন দিকে সুন্দর বাগান ছিল আর

এক দিকে ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার বি ডি নটিয়ালের কোয়ার্টার। প্রফেসার নটিয়াল ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এবং বিশ্বকর্মা হস্টেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ডেন। জামুন লেন আর বিশ্বকর্মা হস্টেলের মাঝে একটি ছোট মাঠ ছিল। অবশ্য এখন সেই মাঠে বহুতল টিচার্স-ফ্ল্যাট হয়েছে।

প্রফেসার নটিয়াল ও নটিয়াল বৌদি (প্রেমা) আমাদের অভিবাবক হয়ে উঠলেন। আমাদের হস্টেলের মালিরা আমাদের কোয়ার্টারের বাগানের দেখাশোনা করত। কোয়ার্টারের বাগানে অনেক ফল ও ফুলের গাছ ছিল। আমাদের হায়দ্রাবাদ কলোনির এই কোয়ার্টারের লাগোয়া ছিল বি এইচ ইউ-র এগ্রিকাল্চারাল ইন্সটিট্যুটের বিরাট ক্ষেত। আমি আমার তিন বছরের ছোটো ছেলে আপ্পু (প্রিয়নীল) সেখানে ঘুড়ি ওড়াতে যেতাম। সেখানে পাশের গ্রাম থেকে বি এইচ ইউ-র পাঁচিল টপকিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের সঙ্গ দিত। কোয়ার্টারে আমাদের বাগানে সজারু আর খরগোশ আসত। আপ্পু বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসের যোধপুর কলোনিতে পোষ্টাফিসের লাগোয়া মালবীয় (মালব্য) শিশু-বিহারে পড়ত। পরে আপ্পু সেন্ট জন'স স্কুল, মারহৌলি, এবং আরও পরে বি এইচ ইউ-র ইন্সটিট্যুট অফ সায়েন্সের জুলজি ডিপার্টমেন্টে পড়ত। আমার বড় ছেলে বিল্কু (ইন্দ্রনীল) প্রথমে সেন্ট জন'স স্কুল, ডি এল ডাবল্যু, এবং আরও পরে বি এইচ ইউ-র ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে পড়ত।

বিশ্বকর্মা হস্টেলের পাশে একটি কোয়ার্টার ছিল যেটা মূলতঃ বিশ্বকর্মা হস্টেলের ওয়ার্ডেনের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোয়ার্টারটি বিশ্বকর্মা হস্টেলের সাথে এতই লাগোয়া ছিল যে বিশ্বকর্মা হস্টেলের কোনো ওয়ার্ডেন এই কোয়ার্টারটি নিতে রাজী হতেন না। কোয়ার্টারটিতে বি এইচ ইউ-র ফ্লাইং ক্লাবের ইনচার্জ-পাইলট সপরিবারে থাকতেন। তাঁদের একটি পোষা কুকুর ছিল। একবার তাঁরা তাঁদের কুকুরটিকে আমাদের কাছে রেখে বেশ কয়েকদিনের জন্য বেনারসের বাইরে চলে গেলেন। তাঁদের ফিরে না আসা পর্যন্ত কুকুরটিকে আমরা অনেক যত্নে আমাদের কাছে রেখে দিলাম। মজার ঘটনা হল তাঁরা ফিরে আসার পর কুকুরটি আর তাঁদের কোয়ার্টারে থাকতে চাইত না; সুযোগ পেলেই আমাদের কোয়ার্টারে চলে আসত। এরপর থেকে

রাগ করে তাঁরা আমাদের সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন করে দিলেন। আরেকটি কুকুর নিয়ে মজার ঘটনা ঘটেছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এস কে শ্রীবাস্তবের এক জোড়া পোষা কুকুরকে নিয়ে যারা তাঁর কোয়ার্টার থেকে আমাদের কোয়ার্টারে চলে আসত। কুকুর দু'টি দিনের বেশ অনেকটা সময় আমাদের কোয়ার্টারে থাকত এবং রাত হলে প্রফেসার শ্রীবাস্তবের কোয়ার্টারে ফিরে যেত। ডিপার্টমেন্টের সবাই ঠাট্টা করে আমাকে বলতেন যে প্রফেসার শ্রীবাস্তব তাঁর কুকুর জোড়াকে এমন ট্রেনিং দিয়েছেন যে তারা দিনের বেলায় আমাদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রিবেলায় প্রফেসার শ্রীবাস্তবের বাড়ী পাহারা দিতে চলে যায়।

আমি আর প্রফেসার নটিয়াল সন্ধ্যের সময় হস্টেলের অফিসে যেতাম। কিছুদিন পরে প্রফেসার নটিয়াল বিশ্বকর্মা হস্টেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ডেনের কাজ থেকে অবসর নিয়ে বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসের যোধপুর কলোনিতে তাঁর নতুন কোয়ার্টারে শিফ্ট করলেন। তখন আমি তাঁর জায়গায় বিশ্বকর্মা হস্টেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ডেনের কার্যভার নিলাম আর আমার জায়গায় হস্টেলের ওয়ার্ডেনের কার্যভার নিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার কে এস কারকী। তিনি প্রফেসার নটিয়ালের সদ্য খালি করে দেওয়া আমাদের পাশের কোয়ার্টারে চলে এলেন।

হস্টেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হওয়ার সুবাদে হস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত সমস্যার সাথে প্রায়ই আমাকে জড়িয়ে পড়তে হ'ত। একটি ছাত্রের কথা বলি তার আসল নামটা ঊহ্য রেখে তার নাম রাখা যাক 'আবীর সোডি'। আবীর—আমাদের ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের মেধাবী ছাত্র—বিশ্বকর্মা হস্টেলের বোর্ডার ছিল। আবীরের মা ছিলেন দিল্লী দূরদর্শনের বিখ্যাত এক অভিনেত্রী। বাবা বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। সমস্যা হল আবীরকে নিয়ে যখন ও হটাৎ ডিপার্টমেন্টে যাওয়া বন্ধ করে দিল। প্রতিদিন হস্টেলের গেটে বসে ইন্সটিট্যুটে ক্লাস-করতে-যাওয়া বন্ধুদের সি-অফ করে একটা বেঞ্চিতে বসে খবরের কাগজ পড়ত আর হস্টেলের কর্মচারীদের সাথে গল্প-গুজব করত। এবার আমি আবীরের সাথে কথা বললাম। আবীর বলল ও চেয়েছিল ফিলোসফি (দর্শন শাস্ত্র) নিয়ে পড়াশুনা করবে। কিন্তু তার সে ইচ্ছাপূরণ আর হল না। আমি আবীরকে বললাম—তুমি যদি আমাদের

ডিপার্টমেন্টের ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বি টেক-এ ভাল রেজাল্ট কর তবে তোমাকে আমি ইউ এস এ-র ভালো ইউনিভার্সিটিতে ফিলোসফি নিয়ে পড়ার জন্য এডমিশন পাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারি। আমি ওকে বললাম ও যে বিষয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়াশুনা করছে তার উচ্চতর ডিগ্রী হল পি এইচ ডি। পি এইচ ডি-র অর্থ ডক্টর অফ ফিলোসফি তা আবীরকে মনে করিয়ে দিলাম। আমার কথা শুনে আবীর স্তব্ধ হয়ে গেল। এই ভাবে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আবীর ওর ইপ্সিত 'ফিলোসফি'তে ও নানা রকম ভাবে পৌঁছাতে পারে। আবীরকে নিয়ে আমি প্রফেসার প্রসাদ খাস্তগীরের কোয়ার্টারে গেলাম। ইউ এস এ-র ভালো ইউনিভার্সিটিতে 'ফিলোসফি' নিয়ে পড়ার জন্য এডমিশন পাওয়ার আবেদনে দুজনের রেকমেন্ডেশন দরকার ছিল। প্রফেসার খাস্তগীর আবীরকে একটা রেকমেন্ডেশন দিতে রাজী হলেন। আমিও আবীরকে আমার রেকমেন্ডেশন দেব বলে জানালাম। এরপর থেকে আবীর ডিপার্টমেন্টে রেগুলার হয়ে গেল। ফিলোসফি বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রী পাওয়ার পর দেশে ফিরে এসে আবীর প্রফেসার খাস্তগীর আর আমার সাথে দেখা করে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি বিষয়ে আবার একটি পি এইচ ডি ডিগ্রী পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল। আমাদের রেকমেন্ডেশন নিয়ে আবীর এই বিষয়েও পি এইচ ডি ডিগ্রীর জন্য ইউ এস এ-র একটি ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন পেল এবং সেখান থেকে ওর ডক্টরাল রিসার্চের ভিত্তিতে আরও একটি পি এইচ ডি ডিগ্রী পেল। এই ভাবে আবীরকে আমরা ওর শৈক্ষিক যোগ্যতার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলাম।

এরপর আরেকজন বিশ্বকর্মা হস্টেলের বোর্ডার রতনের কথা বলি যে হটাৎ অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে শুনতে পেলাম। অবশ্যই রতন নামটি কল্পিত। শুনলাম রতন হস্টেলের অন্যান্য বোর্ডার এবং কর্মচারীদের শারীরিক ভাবে আঘাত করতে চাইছে। আমি সাহস করে সবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে ওর সাথে আলাপ করে ওর নৈরাশ্যের কারণ অনুমান করতে পারলাম। রতন যখন আই আই টি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে বি এইচ ইউ-তে এডমিশন পেল তখন ওর আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা রতনকে নিয়ে গর্ব অনুভব করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রতন ওর এন্ট্রান্স পরীক্ষার

ফলাফলের ভিত্তিতে ওর পছন্দের ব্র্যাঞ্চে এডমিশন পেল না। ও সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্র্যাঞ্চে এডমিশন পেল যা ওর পছন্দের বাইরে ছিল। ফার্স্ট ইয়ারে ইন্সটিট্যুটের সব ব্র্যাঞ্চের ছাত্রছাত্রীরা একই বিষয়গুলি পড়ত এবং সেকেন্ড ইয়ারে উঠে যে যার নিজেদের ব্র্যাঞ্চের বিষয়গুলি পড়ত। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে রতন একটা ধাক্কা খেল যখন ওকে ওর পছন্দের ব্র্যাঞ্চের বিষয়গুলির পরিবর্তে ওর অপছন্দের সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্র্যাঞ্চের বিষয়গুলির ক্লাস করতে হল। এই ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে রতন ওর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। ওকে তখনকার মতন ওর পড়াশুনা অসম্পূর্ণ রেখে বাড়ী চলে যেতে হল। দেখা গেল এই একই রকম কারণে প্রতি বছর ইন্সটিট্যুটের ছাত্রছাত্রীদের দুএকজন তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত।

ইন্সটিট্যুটে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার আরও একটি অঘটন ঘটল। বি-টেকের এক ছাত্র ক্যাম্পাস ইন্টার্ভিউ-এর মাধ্যমে একটি সংস্থানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল কিন্তু সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্যকরী করার পথে একটি থিয়োরি পেপারে তার পাস মার্কস না পাওয়া একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। সংশ্লিষ্ট ঐ পেপারের পরীক্ষক ওর মার্কস বাড়াতে রাজী না হয়ে বিচলিত হয়ে ছাত্রটি সেই পরীক্ষককে গুলিবিদ্ধ করে এবং পরক্ষণেই অনুতপ্তে নিজেকেও গুলিবিদ্ধ করে। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় শিক্ষক সুস্থ হয়ে যান কিন্তু ছাত্রটিকে বাঁচান যায়নি। এই দুর্ঘটনাটি মনকে বড়ই ব্যথিত করে।

বিশ্বকর্মা হস্টেলে জনৈক বোর্ডার জয় অরোরা (কল্পিত নাম) মদ্য পান করে মাতলামি করত। হস্টেল কোঅর্ডিনেটারের সম্মতিতে আমি হস্টেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ডেনের অফিস থেকে ওকে হস্টেল থেকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করলাম। জয়ের বাবা শুনলাম দিল্লীর এক অর্থবান শিল্পপতি। তখনকার মতন জয় বেনারসের পাঁচতারা তাজ গ্যাঞ্জেস হোটেলে চলে গেল। জয়ের বাবা আমার সাথে আমার কোয়ার্টারে এসে দেখা করে অনতিবিলম্বে সাস্পেনশন তুলে নিতে বললেন। উনি বললেন ছেলের সাথে উনিও মদ্য পান করে থাকেন। আমি ওনাকে হস্টেলের নিয়ম-কানুনের বই দেখালাম। উনি বললেন ভাইস-চ্যান্সেলার ওনার বন্ধু। আমি ওনাকে বললাম— ভাইস-চ্যান্সেলারকে চাইলেও নিয়ম পাল্টাতে ইউনিভার্সিটির পরবর্তী

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। আপনি যতই ভাইস-চ্যান্সেলারের বন্ধু হোন না কেন তিনি আপনার ছেলে জয়ের জন্য কাউন্সিলের কাছে হাস্যাস্পদ হতে রাজী হবেন না। এরপর থেকে জয় বা ওর বাবাকে হস্টেলের ত্রিসীমানায় দেখা গেল না।

হস্টেলে একজন বোর্ডার সুনীল মাহাতো (কল্পিত নাম) (অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার ডি সি রুপেনওয়ারের রিসার্চ স্কলার) রাতে হস্টেলে এসে থাকত সাথে তার অনেক বহিরাগত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। সুনীল এবং তার এই সব বন্ধুদের বুলেট মোটর সাইকেল ছিল। তারা 'বুলেট-বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় হস্টেল সহ ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বহিরাগতের দৌরাত্ম্যের সম্মুখীন হতে হ'ত। সুনীল ও তার বুলেট বাহিনীকে নিয়ে হস্টেলের কর্মচারীরা ভীত, ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত থাকত। সুনীল হস্টেলের এক তলার একটা রুমে থাকত। হস্টেলের বোর্ডাররা সুনীলের রুমের বাইরে ওর চিন্হিত বারান্দার অংশ দিয়ে হাঁটাচলা করার নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। কি ভাবে সুনীল ও তার বুলেট বাহিনীকে বাগে আনব ভাবতে থাকলাম। আমাদের হস্টেল অফিসের টেলিফোন বহুদিন ধরে কাজ করছিল না। শহরের টেলিফোন বিভাগ আমাদের কমপ্লেন গ্রাহ্য করছিল না। এই ব্যাপারে ওর সাহায্য চাইলাম। সুনীল বলল—এটা কোন কাজই নয়। কালকের মধ্যেই টেলিফোন কাজ করবে। অন্য কাজ বলুন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা দুরূহ কাজের কথা। শুনতে পেয়েছিলাম এক হিষ্ট্রি-শীটার বোর্ডার তার রুমে অবৈধ কাজ করে। সুনীল বলল—স্যার, এটা বরদাস্ত করা যায় না। এই কাজটা আমি এখুনি করে দিচ্ছি। এই বলে হিষ্ট্রি-শীটারটির তালা দেওয়া রুমে সুনীল নিজের একটা তালা লগিয়ে দিল এবং তার বুলেট বাহিনীর কয়েকটি বুলেট মোটর সাইকেল সংশ্লিষ্ট রুমের সামনে রেখে দিল। সেই রাত থেকে হিষ্ট্রি-শীটারটি হস্টেল থেকে নিজেই বিদায় নিল। একেই কি বলে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'? সেই দিন থেকে সুনীল আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে গেল।

এরপর চলে আসি হস্টেলে 'ইন্ট্রোডাকশন'-এর আড়ালে র‍্যাগিং-এর সন্ত্রাসের কথায়। ফার্স্ট ইয়ারের অ্যাডমিশনের পর শুরু হ'ত ইন্সটিট্যুট অফ

টেকনলজিতে 'ইন্ট্রোডাকশন'-এর আড়ালে র‍্যাগিং-এর তাণ্ডব। হস্টেলে হস্টেলে বাৎসরিক উৎসব 'র‍্যাগিং' সাড়ম্বরে পালিত হ'ত। রণ দামামা বাজার সংগে সংগে ইন্সটিট্যুট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অ্যান্টি-র‍্যাগিং স্কোয়াডের রাতের ঘুম নষ্ট হ'ত। দুর্ভাগ্যক্রমে সেকেন্ড ইয়ারের হস্টেল বোর্ডাররা—যারা এক বছর আগেই ফার্স্ট ইয়ারে থাকাকালীন এই র‍্যাগিং-এর শিকার হয়েছিল—এই র‍্যাগিং-সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দিত। র‍্যাগিং উৎসবের সময় ফার্স্ট ইয়ার বোর্ডারদের বাবা-মায়েদের, যদি তাঁরা ইচ্ছুক হন, তাঁদের সন্তানদের সাথে হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হ'ত। কোন কোন বাবা-মায়েরা অনুযোগ করতেন যে তাঁদের সামনেই সিনিয়ার বোর্ডাররা তাঁদের সন্তানদের কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। আমরা তাঁদের সন্তানদের ছাড়িয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিতাম। বিনিময়ে লিখিয়ে নিতাম যে ভবিষ্যতে যদি তাঁদের সন্তানদের র‍্যাগিং করার অপরাধে দোষী পাওয়া যায় তবে তাদের ইন্সটিট্যুট থেকে অপসারণের সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে তাঁদের সহমতি আছে। কিন্তু অনেক বাবা-মায়েরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হতেন না।

র‍্যাগিং উৎসব একবার যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনট্রোলের প্রায় বাইরে চলে গেল, তখন গুরুতর বেআইনি কাজ ঠেকাতে আমিও একটা উপায় বের করলাম। এটাও হল একটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কাজ। এই কাজের পীঠস্থান আমি আমার অধীনের বিশ্বকর্মা হস্টেলকে বেছে নিলাম। আর এই কাজে সুনীল ও তার বুলেট বাহিনীর শরণাপন্ন হলাম। একদিন হস্টেলের এক কর্মচারী এসে খবর দিল যে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের অন্য হস্টেল থেকে নিয়ে এসে লাইন দিয়ে ছাদে র‍্যাগিং করতে যাওয়ার সময় বিশ্বকর্মা হস্টেলের থার্ড ইয়ারের ছাত্ররা প্রচণ্ড অ্যান্টি-র‍্যাগিং মার খাচ্ছে সুনীল ও তার বুলেট বাহিনীর কাছে। ফলস্বরূপ পরের দিন ইন্সটিট্যুট থেকে র‍্যাগিং বিদায় হল যদিও বিশ্বকর্মা হস্টেলের এহেন অ্যান্টি-র‍্যাগিং অ্যাকশনের প্রতিবাদে পরের দিন ইন্সটিট্যুটের পড়ুয়ারা স্ট্রাইক করে কেউ ক্লাসে গেল না। ইন্সটিট্যুটের ডিরেক্টার আমাকে তলব করলেন। আমি ওনাকে বোঝালাম যে আমাদের ইন্সটিট্যুটের ছাত্রছাত্রীরা ক্যারিয়ার কনসাস। দু'দিন ক্লাসে না এসে পরের দিন ক্লাসে ঠিকই চলে আসবে।

মনে পড়ে গেল এক রাতের কথা যখন চীফ-প্রোক্টর মহাশয়, যার হাতে

ইউনিভার্সিটির সিক্যুরিটির দায়িত্ব নিহিত, আমাদের কোয়ার্টারে এসে আমার সাহায্য চাইলেন। সমস্যা হয়েছিল ইউনিভার্সিটির ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের অত্যন্ত মেধাবী পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্র অজয় মালহোত্রাকে (কল্পিত নাম) নিয়ে। অজয় নাকি রাতে ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে জিনিষ পত্র ছুঁড়ে ইউনিভার্সিটির সিক্যুরিটি বিঘ্নিত করছে। ওনার কাছে খবর আছে আমি নাকি ওনাকে কন্ট্রোল করতে পারি। তার কারণ উনি জানতে পেরেছিলেন যে অজয় আমার অনুরোধে ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজির ছাত্রছাত্রীদের কুইজ প্রতিযোগিতায় কুইজ-মাস্টারের দায়িত্ব পালন করে এবং আমাকে খুব মান্য করে। অজয়কে কুইজ পরিচালনার কাজে আমার ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র সুব্রত কুমার দত্ত কয়েকবার অ্যাসিস্ট করেছিল। আমি আর সুব্রত অনেক বুঝিয়ে অজয়কে ঠিক রাস্তায় এনে চীফ-প্রোক্টরকে নিশ্চিন্ত করলাম।

আমি হস্টেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকাকালীন প্রফেসার এস কে শ্রীবাস্তবের কাছ থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার ডি পি সিং ইন্সটিট্যুটের হস্টেল কোঅর্ডিনেটারের দায়িত্ব নিলেন। (সুযোগ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে পরিচিত প্রফেসার ডি পি সিং অবসর নেওয়ার আগে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন)। হস্টেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটির মীটিং-এ অনেক ব্যাপারে তিনি এবং অনেকে আমার সাথে সহমত হতেন না। তবে সবাই সহমত না হলেও কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমারই মতের সমর্থনে মীটিং-এর রেসোল্যুশন তৈরি হ'ত।

এবার আরেকটা মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায়। একবার অত্যন্ত এক জরুরী পরিস্থিতিতে ইউনিভার্সিটির চীফ-প্রোক্টর মহাশয় আমাদের ইন্সটিট্যুটের হস্টেল কোঅর্ডিনেটার প্রফেসার ডি পি সিং-এর কাছে একটি ঘটনার মোকাবিলা করার জন্য সাহায্য চাইলেন। যে ঘটনায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা ঘটেছিল ইন্সটিট্যুটের একটি ক্যারাটে বিশারদ প্যালেস্টিনিয়ান ছাত্রের সাথে বিড়লা হস্টেলের কোন এক তথাকথিত 'মাস্তান' ছাত্রের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে। এরা নাকি দু'জনেই আবার ইউনিভার্সিটির ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ঘটনায় একটি লড়াইয়ে প্রশিক্ষিত প্যালেস্টিনিয়ান ক্যারাটের কাছে মাস্তান ছাত্রটির

পরাজয় ঘটল। ফলস্বরূপ, ত্রাসের সৃষ্টি করল বিড়লা হস্টেল থেকে ইন্সটিট্যুটের এস সি দে হস্টেলের দিকে অগ্রসর একটি সশস্ত্র বাহিনী। ওদের উদ্দেশ্য ইউনিভার্সিটি থেকে প্যালেস্টিনিয়ান ছাত্রদের মারধর করে চিরতরে বের করে দেওয়া। এস সি দে হস্টেলে সেই সময়ে জনা পনের প্যালেস্টিনিয়ান ছাত্ররা অপেক্ষা করছিল বিড়লা হস্টেল থেকে অগ্রসর সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য। প্যালেস্টিনিয়ান ছাত্রদের বক্তব্য এটা ইউনিভার্সিটির একটি ছাত্রের সাথে আরেকটি ছাত্রের নিজেদের ব্যাপার যেটা ওরা নিজেদের মধ্যে শেকহ্যান্ড করে মিটিয়ে ফেলতে পারত। তারা জানাল যে তারা নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে এই যুদ্ধে প্রস্তুত। ইন্সটিট্যুটের হস্টেল কোঅর্ডিনেটার প্রফেসার ডি পি সিং চীফ-প্রোক্টর মহাশয়কে সেই মুহূর্তে সময় নষ্ট না করে আমার কাছে আসতে বললেন। কারণ হিসেবে তিনি চীফ-প্রোক্টর মহাশয়কে জানালেন যে আমাকে নাকি দু'পক্ষই জানে এবং সমীহ করে, কারণ আমি ইন্সটিট্যুট জিমখানার কাল্চারাল উইং-এর চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে ইন্সটিট্যুটের কাল্চারাল প্রোগ্রামে ইন্সটিট্যুটের এবং বহিরাগত ছাত্রীদের সুরক্ষার জন্য এই দু'পক্ষকে নিয়ে কাজ করি। অতএব, মাঝরাতে আমাদের কোয়ার্টারে চীফ-প্রোক্টর মহাশয়ের আগমন হল। তিনি মণিকুন্তলার ঘুম নষ্ট করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমাকে নিয়ে এস সি দে হস্টেলে চলে গেলেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রদ্ধেয় প্রফেসার ডি পি সিং-এর মান রক্ষা করে দু'পক্ষকে শান্ত করে ভোরবেলায় কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। প্যালেস্টিনিয়ান ছাত্রদের কথা লিখতে গিয়ে আমার হাতেমের কথা মনে পড়ে। প্যালেস্টিনিয়ানের হাসি-খুশী ছাত্র হাতেম ওর ফুটবল খেলা এবং কি-বোর্ড ম্যুজিকের জন্য ইন্সটিট্যুটে বিখ্যাত ছিল। আমাদের কোয়ার্টারে মণিকুন্তলার রান্না পায়েস খেতে খেতে হাতেমের ওর মায়ের কথা মনে পড়ে চোখে জল এসে যেত ।

এক সময় আমাদের ডিপার্টমেন্টে ইরাকের একটি ছাত্র এবং ইরানের একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী (স্বামী-স্ত্রী) পোষ্টগ্র্যাজুয়েট (এম টেক) প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন নিয়েছিল। তখন ইরাকের ইরান আক্রমণ উদ্ভুত ইরান-ইরাক সংঘাতের পরিস্থিতিতে ইরানের ছাত্রছাত্রী জুটি ইরাকের ছাত্রটি থেকে দূরত্ব বজায় রাখত। ইরাকের ছাত্রটি দেরী করে অ্যাডমিশন নেওয়ার দরুন আমার

বেশ কয়েকটা থিয়োরি ক্লাস মিস করেছিল। আমি ওদের বললাম আমাদের ডিপার্টমেন্টে ইরান-ইরাক সংঘাত নেই। আমি খুশী হয়েছিলাম যে আমার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওরা আমার ক্লাস-নোট নিজেদের ভিতর আদানপ্রদান করেছিল। ইরানের ছাত্রজুটির ছেলের বয়স বেশী হওয়ার জন্য ওকে কোন ক্রেশে রাখা যাচ্ছিল না। বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসের মালবীয় (মালব্য) শিশু-বিহার আমার বিশেষ অনুরোধে মানবিক কারণে ওকে রাখতে রাজী হয়েছিল।

এবার আসি ইন্সটিট্যুটের জিমখানা পরিচালিত ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক কাল্চারাল প্রোগ্রামের কথায়। এই প্রোগ্রামের নাম 'কাশীযাত্রা'। বেশ কয়েক বছর আমি ছিলাম জিমখানার কাল্চারাল উইং-এর চেয়ারম্যান এবং এই সুবাদে 'কাশীযাত্রা' প্রোগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান ও বটে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পণ্ডিত সামতা প্রসাদজীর প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম যে আমি কাল্চারাল উইং-এর চেয়ারম্যান থাকাকালীন পণ্ডিতজী আমার আমন্ত্রণের সাড়া দিয়ে তাঁর একটি হাত কাজ না করা সত্ত্বেও তবলা পরিবেশন করে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন। আমাদের ইন্সটিট্যুটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার বীরভদ্র মিশ্র—যিনি বেনারসের সংকটমোচন মন্দিরের মোহান্তজী ছিলেন এবং যিনি প্রতি বছর মন্দিরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সম্মেলনের আয়োজন করে বিখ্যাত হয়েছিলেন, এবং সর্বোপরি যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন—আমার অনুরোধে আমাদের কাশীযাত্রার কাল্চারাল প্রোগ্রামে সংগীতের যে কোন মহারথীকে নিয়ে আসতেন।

আমাকে অভিভূত করার সেই মুহূর্ত ভুলতে পারিনা যেদিন প্রফেসার মিশ্র (মোহান্তজী) ইউনিভার্সিটির স্বতন্ত্রতা-ভবনের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত কাশীযাত্রার একটি প্রোগ্রামে বিদুষী সংযুক্তা পানিগ্রাহীকে তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে মঞ্চ থেকে সামনের-সারিতে-বসা আমার কাছে নিয়ে নিয়ে এলেন আমার সাথে ওনার আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। জিমখানার কাল্চারাল উইং-এর এবং কাশীযাত্রা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার দৌলতে সংগীত জগতের রথী-মহারথীদের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। আবার কাশীযাত্রা প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলার আগে মনে পড়ে গেল আরেকটি সংস্থার কথা যার নাম 'সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল

ম্যুজিক অ্যান্ড কালচার এমঙ্গস্ট ইয়ুথ' এবং যার প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'স্পিক ম্যাকে' ('SPIC MACAY')। এই সংস্থার অনুষ্ঠানে অত্যন্ত কাছে পেয়েছিলাম বিশ্ববিখ্যাত এল সুব্রহ্মন্যমের মতন বিশ্ববরেণ্য বেহালা বাদকের।

দেশের বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত ও কলার বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে 'কাশীযাত্রায়' আসত। ছাত্রী অংশগ্রাহিকাদের সুরক্ষার দায়িত্ব আমাদের নিতে হ'ত। আমি তিন স্তরের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলাম। আমার সুরক্ষার প্রথম স্তরে থাকত ইন্সটিট্যুটের শক্তিশালী ছাত্ররা। সুরক্ষার দ্বিতীয় স্তরে থাকত ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং তার অনুগামীরা। আর সুরক্ষার তৃতীয় স্তরে প্যালেস্টিনিয়ান ছাত্রদের টীম আমার ছায়াসঙ্গী হয়ে আমার যে কোনো আদেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকত। অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিদিন আমি আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এন কে দাস তালুকদার (পরে যিনি ইন্সটিট্যুটের ডাইরেক্টর হয়েছিলেন) নিশ্চিত করে নিতাম যে কাশীযাত্রার ছাত্রী-অংশগ্রাহিকারা ঠিক মতন তাদের নির্ধারিত হস্টেল বা গেস্টহাউসে ফিরে গেছে কি না।

আমি বি এইচ ইউ-তে কর্মরত থাকাকালীন অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন (এ আই সি টি ই)-এর প্রতিনিধি হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে তাদের মান্যতা ও স্বীকৃতি (অ্যাক্রেডিটেশন) দেওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতাম। এই কাজকে অনেকে 'ভারত-ভ্রমণ' বলে আমাদের ঠাট্টা করত। দেশের সর্বত্র কখনো প্লেনে, কখনো ট্রেনে, কখনো বা মোটর গাড়ীতে আমাদের ভ্রমণ করতে হ'ত। স্পষ্টতই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আমাদের থাকার এবং খাওয়া দাওয়ার 'ভি আই পি' ব্যবস্থা থাকত। আমাদের আদেশ পালন করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ উদগ্রীব হয়ে থাকত।

একবার একটি এ আই সি টি ই-র অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ায় আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার আনন্দ মোহনকে নিয়ে বেনারস থেকে প্লেনে অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনম গেলাম। সেখান থেকে কয়েকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আমাদের যাওয়ার কথা। বিশাখাপত্তনম থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে রাজামুন্দ্রি শহরের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে

রোল্স-রয়েস গাড়ীতে আমরা গিয়েছিলাম যেখানে আমাদের ভি আই পি আপ্যায়ন করা হল। সময়টা গ্রীষ্মকাল ছিল। বিশাখাপত্তনমে অতটা গরম লাগেনি। কিন্তু রাজামুন্দ্রিতে ৫০ সেলসিয়াসের ঝটকা অনুভব করেছিলাম।

রাজামুন্দ্রি থেকে বিশাখাপত্তনম ফিরে এসে থেকে আমি আর প্রফেসার আনন্দ মোহন ওড়িশার গুনুপুরে আরও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। কলেজে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য ছাত্রছাত্রীরা অনুপস্থিত ছিল। আমি ওখানকার কম্প্যুটার ল্যাব দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলাম। ল্যাবে অনেকগুলি কম্প্যুটার এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সুন্দরভাবে ল্যাব-ইক্যুপমেন্টের বর্ণনা আমাকে প্রভাবিত করল। কিন্তু অনুজপ্রতিম আনন্দ মোহন আমার চোখ খুলে দিল। ওর জেরায় সংশ্লিষ্ট 'শিক্ষক' স্বীকার করে নিলেন উনি আদৌ ওই কলেজের কোন শিক্ষকের পদে নেই, তিনি একজন কম্প্যুটার ভেন্ডার বা বিক্রেতা। ওর পার্ট-টাইম পেশা হল কলেজ পরিদর্শনের আগে তাৎকালিক প্রয়োজনে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে কম্প্যুটার ল্যাবে সজ্জিত করা।

এ আই সি টি ই-র প্রোগ্রামের আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যা ঘটেছিল তামিলনাড়ু রাজ্যের তাঞ্জোর জেলার থিরুমালাইসমুদ্রম শহরে অবস্থিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার সময়। প্রতিষ্ঠানটির নাম শানমুঘ আর্টস, সায়েন্স, টেকনলজি, অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমী (SASTRA (শাস্ত্র))। প্রথম-দর্শনেই প্রতিষ্ঠানটি আমার ভালো লেগে গেল। নিম্নবর্তী কারণে আশা করি তা প্রতিভাত হবে। পরিদর্শন কমিটির চেয়ারম্যান সহ অনেক মেম্বার আশা করেছিলেন—যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে—প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আমাদের স্টার হোটেলে রেখে আপ্যায়ন করবেন। তা না করে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গেস্টহাউসে রাখা হল। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা শহরের কোন নামী স্টার রেস্টুরেন্টে না করে ছাত্রছাত্রীদের ক্যান্টিনে করা হল। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই ভাবেই তো আমরা প্রতিষ্ঠানের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবো। দশক দুই আগেকার কথা— ছাত্রছাত্রীদের বহুতল ক্যান্টিনে স্বয়ংক্রিয় মেসিনের সহায়তায় রান্না করা এবং কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে রান্নাঘর থেকে উপরতলায় খাবার সারভিং-এর জন্য নিয়ে যাওয়া—সব কিছুই সে সময় আমার কাছে একটা 'অভিজ্ঞতা' হল।

গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, প্রতিষ্ঠানটি ওদের লাইব্রেরী, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ল্যাবোরাটরি, ক্লাসরুম, অডিটোরিয়াম, প্লেগ্রাউন্ড, টয়লেট, ইত্যাদিতে এ আই সি টি ই দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট মান রাখতে সফল হয়েছিল। আমার মতে যে কোন প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানের টয়লেটের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিয়ে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডিসিপ্লিন কেমন তা জানার ভাল উপায় হল তাদের অ্যানুয়াল ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত থাকা। তাই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আমাদের ভিজিটের সময় ছাত্রছাত্রীদের কাল্চারাল নাইটের আয়োজন করলেন। সুআয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রতিভাশালী ছাত্রছাত্রীদের পারফর্মেন্স এবং সর্বোপরি ডিসিপ্লিন আমাদের মুগ্ধ করল। তবে আমাদের জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। ঘটনাটি ঘটল প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে প্রতিষ্ঠানের অগ্রসরের বিভিন্ন দিক অ্যাক্রেডিটেশন টিমের সামনে উপস্থাপনা করার একটি অনুষ্ঠানের সময়। নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হতে একটু দেরী হচ্ছিল। দেরী হওয়ার কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানালেন যে তাঁরা অপেক্ষা করছেন প্রতিষ্ঠানের ইংরাজি বিভাগের একজন এমেরিটাস প্রফেসারের জন্য যার উদ্বোধনী উপস্থাপনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সবার 'গুরু' তা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার জানালেন। দুর্ভাগ্যবশত অ্যাক্রেডিটেশন টিমের জনৈক অত্যুৎসাহী প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের এবং গুরুজীর নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে অপমান-জনক টিপ্পনী করলেন। প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে ক্ষমা চাইতে নতুবা অডিটোরিয়াম থেকে বের হয়ে যেতে বললেন। এটা ছিল ভি আই পি ট্রিটমেন্টে অভ্যস্ত অ্যাক্রেডিটেশন টিমের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যেই বাগ্মী গুরুজী তাঁর অক্সোনিয়ান ইংরাজিতে তাঁর ভাষণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন। মনের জানালায় উঁকি-ঝুকি দেওয়া এই মুহূর্তটিকে কি ভোলা যায়?

বি এইচ ইউ-তে থাকাকালীন আমি শুধু হোস্টেল এবং ইন্সটিট্যুট জিমখানার কাল্চারাল উইং পরিচালনা, এবং এ আই সি টি ই-র প্রতিনিধি হয়ে দেশের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম না, সমান্তরালভাবে আমি মুদ্রার-এপিঠ-ওপিঠ টিচিং এবং রিসার্চকেও প্রাধান্য দিয়েছি। আমার থিয়োরি ক্লাসে ক্লাস-নোটের সাহায্য না নিয়ে

ম্যাথেমেটিকাল ডিডাক্শন করতাম। আমার ক্লাসের উপরান্তে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের সারাংশ বলত এবং ক্লাস-সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র বানাত। স্পন্সর্ড রিসার্চ প্রজেক্ট পরিচালনা করায় এবং ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার্স ও ডক্টরাল রিসার্চ সুপারভাইস করায় আমি আত্মনিয়োগ করেছিলাম। এছাড়া আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতামূলক রিসার্চ করার জন্য মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিন্গ প্রস্তুত করায় আমার ভূমিকা পালন করেছিলাম, যথা (১) ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, আই আই টি, বি এইচ ইউ এবং সি এস আই আর - সি রি, পিলানীর মধ্যে এবং (২) সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সি এস আই আর - সি রি, পিলানীর মধ্যে।

আমার মনে উঁকি দেয় সেই মুহূর্ত যখন জামশেদপুর আর আই টি-তে একবার ভূমিকম্পের সময় অন্যান্য ক্লাসের সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছিল অথচ আমি এবং আমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ভূমিকম্প টের পাইনি। মনে পড়ে যায় সেই মুহূর্তটি যখন আমার বি এইচ ইউ-তে থাকাকালীন আমি আমার ক্লাস থেকে একটি ছাত্রীকে ওর পাশে বসা ছাত্রী-বন্ধুর সাথে কথা বলে আমার মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য বের করে দিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, সেই ছাত্রীটি বি টেক-এ ফার্স্ট র‍্যাঙ্ক পেয়েছিল এবং মনে পড়ে সেই মুহূর্তটি যখন ওর সেই ছাত্রী-বন্ধুটি আমাকে বলেছিল যে আমি যদি ওকেও ক্লাস থেকে বের করে দিতাম, তা হলে হয়ত ফার্স্ট র‍্যাঙ্কটি ওরা দু'জনে ভাগাভাগি করে পেত।

এই অধ্যায়ে আমার মনের আনাচে কানাচে বিভিন্ন সময়ে উঁকি-ঝুকি দেওয়া কিছু মুহূর্ত ধরে রাখার চেষ্টা করলাম। প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত আরতিপিসী, জ্যোতিপিসীদের সলিলদার কথা আর সুর দিয়ে তাই এই অধ্যায়ের সমাপন করি—'হৃদয়ের ও শাখা ধরে নাড়া দিয়ে গেছে' ...'মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে'।

# ‘ভাবি বসে আবার যদি পেতাম হারানো সব সেই দিন’

রোটেশনাল হেডশিপের নিয়মে তিন বছরের জন্য (১৯৯২-১৯৯৫) আমি বি এইচ ইউ-র ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজির ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রধানাধ্যক্ষ বা ‘হেড’ ছিলাম। এইসঙ্গে আমি ডিপার্টমেন্টের সেন্টার অফ রিসার্চ ইন মাইক্রোওয়েভ ট্যুব্স-এর কোঅর্ডিনেটার ছিলাম। এছাড়া আমি কিছুদিনের জন্য ইউনিভার্সিটি ইন্সট্রুমেন্টেশন সার্ভিস সেন্টারের কোঅর্ডিনেটার ছিলাম। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ গুলির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি কখনও আমার টিচিং, রিসার্চ, স্পন্সর্ড প্রজেক্ট পরিচালনা, ইত্যাদিকে অবহেলা করিনি। টিচিং এবং রিসার্চকে বরাবর আমি একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ বিশ্বাস করে এসেছি। সি এস আই আর-এর ডিস্টিংগুয়িশ্ড ভিজিটিং সাইন্টিস্ট হওয়ার এবং আমার প্রতিষ্ঠিত সি রি, পিলানীর সাথে সহযোগিতামূলক মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিন্গ-এর সুবাদে আমি, আমার ছাত্রছাত্রীরা এবং আমার সহকর্মী রিসার্চ-পিপাসুরা আমাদের রিসার্চ-দিগন্তের পরিসীমা বিস্তার করতে পেরেছিলাম।

আমি সবার সহযোগিতায় ডিপার্টমেন্ট হেডশিপের অ্যাডমিনিস্ট্রেসশন পরিচালনা করতাম। আমার চেয়ে সিনিয়ার প্রফেসাররা নানা কাজে প্রয়োজন মতন আমাকে সাহায্য করতেন। মনে আছে একদিন আমাদের ডিপার্টমেন্টে জনৈক পুলিশ অফিসারের আগমন হল। তিনি ডিপার্টমেন্টর হেডের সাথে দেখা করতে চাইলেন। ডিপার্টমেন্ট অফিসের সেকশন অফিসার ওনাকে আমার কাছে না এনে প্রফেসার আর কে ঝা-র কাছে নিয়ে গেলেন। ডিপার্টমেন্টের একজন ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করতে পুলিশ অফিসার সোজা প্রফেসার আর কে ঝা-র কাছে চলে যেতেন। প্রফেসার আর কে ঝা বললেন—বসু, কিছু মনে করোনা; পুলিশের তদন্তের কাজে আমিই ডিপার্টমেন্টর হেড।

প্রয়োজন মতন ডিপার্টমেন্টর হেড হিসেবে আমি অত্যন্ত স্ট্রিক্ট হয়ে যেতাম। আগেই লিখেছি আমি কি ভাবে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে

ডিপার্টমেন্টর ফ্যাকাল্টি নিযুক্তির ইন্টার্ভিউ করাতে সক্ষম হয়েছিলাম। একটি ইন্টার্ভিউ-এর আগে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ক্যান্ডিডেট-শর্টলিস্টে বিশ্বম্ভর মিশ্র না থাকাতে ইন্সটিট্যুটের ডীন নার্ভাস হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি জানি কিনা যে বিশ্বম্ভর প্রফেসার বীরভদ্র মিশ্রর ছেলে। ডীন স্যার আমাকে 'জুজুবুড়ী' অর্থাৎ প্রফেসার বীরভদ্র মিশ্রর ভয় দেখালেন যে লিস্টে বিশ্বম্ভরের নাম না থাকলে তার 'ম্যুসিক' শুধু ওনাকে নয় আমাকেও 'ফেস' করতে হবে। প্রফেসার বীরভদ্র মিশ্র ইন্সটিট্যুটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এবং বেনারসের সংকট মোচন মন্দিরের মহান্তজী ছিলেন। প্রফেসার মিশ্র আমাকে ভাতৃবৎ স্নেহ করতেন। বরঞ্চ তিনিই আমার 'ম্যুসিকের' আবদার 'ফেস' করতেন। আমি যখন ইন্সটিট্যুট জিমখানার কাল্চারাল উইং-এর চেয়ারম্যান ছিলাম, তখন ইন্সটিট্যুটের সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রয়োজনে, যেমন ইন্সটিট্যুট জিমখানা পরিচালিত 'কাশীযাত্রা' প্রোগ্রামে বিশ্ববরেণ্য সংগীতশিল্পীদের সাথে যোগাযোগ করতে, আমাকে প্রভূত সাহায্য করতেন। ঠিক সেই সময়ে প্রফেসার এস কে শ্রীবাস্তব পরিচালিত ডিপার্টমেন্টের সেন্টার ফর মাইক্রোইলেকট্রনিক্স-এর ইন্টার্ভিউ-এর আগে সেন্টারের ক্যান্ডিডেট-শর্টলিস্টে বিশ্বম্ভর মিশ্র ওর মাইক্রোইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত কাজের ভিত্তিতে স্থান পেল। বিশ্বম্ভর আমাদের ডিপার্টমেন্ট জয়েন করল। কিন্তু আই আই টি রূরকী-তে ওর পি এইচ ডি-র কাজ কিছুটা কাজ বাকী ছিল। আমি একটা বেআইনী কাজ করলাম। এই কাজের জন্য বিশ্বম্ভরকে তথাকথিত 'ফ্রেঞ্চ লিভ' দিলাম। 'বিশ্বম্ভরকে কেন ডিপার্টমেন্টে দেখা যাচ্ছেনা' এই প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকর্তাকে দিতাম 'ভাইস-চ্যান্সেলারকে জিজ্ঞেস কর'। বলা বাহুল্য ভাইস-চ্যান্সেলার এর বিন্দু বিসর্গ জানতেন না।

আমাদের ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার দু'টো গেট। প্রথম গেটটা ছিল ইন্সটিট্যুটের তরফ থেকে—ডিপার্টমেন্টের 'অফিসিয়াল' গেট। সুবিধার্থে কোন এক সময়ে দ্বিতীয় গেটটি বানানো হয়েছিল ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে। সাধারণতঃ ডিপার্টমেন্টের গেটের তালার চাবি থাকত হেডের কাছে বা হেড-ন্যাস্ত এমন কোন ফ্যাকাল্টি মেম্বারের কাছে যিনি বি এইচ ইউ ক্যাম্পাসে থাকতেন। নির্দিষ্ট কোন কর্মচারীর কাজ ছিল চাবি নিয়ে এসে ডিপার্টমেন্টের তালা খুলে দেওয়া। দ্বিতীয় গেটের অনেকগুলি চাবি ছিল। এই

চাবিগুলি ডিপার্টমেন্টের অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা ছাত্রছাত্রীদের কাছে থাকত যাতে তারা ইন্সটিট্যুট আওয়ারের বাইরেও ডিপার্টমেন্টে এসে তাদের রিসার্চের কাজ করতে পারে। ইন্সটিট্যুট ডাইরেক্টারের দায়িত্ব ছিল দিনের শেষে দেখতে ইন্সটিট্যুটের ডিপার্টমেন্টগুলির তালা বন্ধ আছে কি না। আমাদের ডিপার্টমেন্টের নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট কর্মচারী দ্বিতীয় গেটের তালা খুলে ডিপার্টমেন্টে ঢুকে ডিপার্টমেন্টের ভিতর থেকে ডিপার্টমেন্টের প্রথম গেটের তালা খুলে দিত।

এবার একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনায় আসি। একদিন এসে আমরা সবাই দেখলাম যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় গেটে ডিপার্টমেন্টের তালা লাগানো নেই এবং তার বদলে ডাইরেক্টারের নির্দেশে ইন্সটিট্যুটের তালা লাগানো। এর ফলে ছাত্রছাত্রী এবং আমরা ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা কেউই ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে পারছিনা। গেটের সামনে ডাইরেক্টার অফিসের একজন সিক্যুরিটি গার্ড সবাইকে বলছেন যে ডাইরেক্টারের নির্দেশ যে তালা খোলাতে হলে ডিপার্টমেন্টের হেডকে ডাইরেক্টারের সাথে এই মুহূর্তে দেখা করতে হবে। আমি সিক্যুরিটি গার্ডকে নির্দেশ দিলাম ডাইরেক্টারকে বলতে যে দশ মিনিটের মধ্যে তালা না খোলা হলে আমরা ছাত্রছাত্রীসহ ডিপার্টমেন্ট থেকে চলে যাব সোজা ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে। ফলতঃ পাঁচ মিনিটের মধ্যে গেটের তালা খুলে গেল।

ডাইরেক্টারের ফোন এল আমি যেন তৎক্ষণাৎ ওনার সাথে গিয়ে দেখা করি। আমি ওনাকে আমার ব্যস্ততার কথা জানালাম। উনি বললেন উনি আমাকে 'কারণ দেখাও' (শো কস)-এর নোটিশ দেবেন। আমি ওনাকে বললাম—নোটিশের উত্তরে আমি লিখব যে আপনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় গেটে তালা লাগিয়ে 'অনধিকার চর্চা' করেছেন কারণ এই গেটটি আমাদের আওতায়, আপনার নয়। এই তালা বন্ধ করে আপনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচিং এবং রিসার্চের ক্ষতি করেছেন। গত রাতে ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ স্কলার এবং রিসার্চ-পিপাসু ছাত্রছাত্রীরা ল্যাবে যেতে না পেরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমার এই উত্তরের প্রতিলিপি ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে যাবে। ফলস্বরূপ এবার 'কারণ দেখাও'-এর নোটিশ আপনার কাছে আসবে ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছ থেকে।

এবার ডিপার্টমেন্টে আমার পড়ানোর কথায় আসি। ক্লাসে পড়াবার আগে আমি গত ক্লাসে যা পড়িয়েছি তার সারাংশ এবং এবার আমি কি পড়াতে চলেছি তা ছাত্রছাত্রীদের জানাতাম। দুরূহ ম্যাথেমেটিকাল ডিডাক্শন থাকলেও ক্লাস-নোট হাতে নিয়ে পড়াতাম না। ক্লাসের শেষে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের সারাংশ এবং ক্লাস-সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র বানাতে হ'ত। সি রি, পিলানীতে সি এস আই আর-এর অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর উদ্বোধনী ক্লাসগুলিও আমি নিয়ে থাকতাম। আমার প্রাক্তন ছাত্র সুধীর কামাথ, যে ডি আর ডি ও ল্যাব এম টি আর ডি সি-র ডাইরেক্টার এবং পরে ডি আর ডি ও-র একটি ক্লাস্টারের ডাইরেক্টার জেনারেল হয়েছিল, আমার ক্লাসে পড়ানো সম্বন্ধে ওর মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার শিক্ষণ সম্বন্ধে আমার ওয়েবসাইটে (www.bnbasu.com) সুধীর লিখেছিল যে আমি না কি ছিলাম একজন অতি-আগ্রহী ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সংগীত-পিপাসু ব্যক্তি এবং তাই বুঝি আমি ইলেক্ট্রম্যাগ্নেটিক ফরম্যুলেশনকে ম্যুজিকাল কম্পোজিশনের সাথে তুলনা করতাম।

সহকর্মী প্রদীপ কুমার জৈন, যে এখন ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজির ডাইরেক্টার এবং যার আমি পি এইচ ডি সুপারভাইসার ছিলাম, ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক (সিঙ্গাপুর, নিউ জার্সি, হংকং, লন্ডন) থেকে প্রকাশিত আমার লেখা প্রথম বইয়ের পাণ্ডুলিপি টাইপ করেছিল। বইটির নাম 'ইলেকট্রোমেগনেটিক থিওরি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন্স ইন বিম-ওয়েভ ইলেক্ট্রনিক্স'। ডিপার্টমেন্টে জৈনের টাইপ করা বইটির পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি জৈনের টেবিলে রাখা ছিল। আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তনী জৈনের বি টেক ক্লাসের ক্লাসমেট অখিলেশ (পেনসিলেভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসার অখিলেশ লাখটাকিয়া) আমাদের অবর্তমানে বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখছিল। বইটি ওর ভাল লেগে গেল। অখিলেশ ওর রেকমেন্ডেশন দিয়ে ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক পাবলিশিং কোম্পানিকে বইটির পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিল। বইটির প্রুফরিডিং করেছিল আমার প্রাক্তন ছাত্র পঙ্কজ কুমার দালেলা যে এখন ভারত সরকারের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেলিম্যাটিক্স-এর ডিরেক্টার।

আমার লেখা এই বইটি এক বই মেলায় দেখে সত্যব্রত জিত ঠিক

করেছিল যে ও আমাদের ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসেবে জয়েন করবে এবং আমার সুপারভিশনে ওর পি এইচ ডি-র জন্য রিসার্চ করবে। সেই মত সত্যব্রত আমাদের ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছিল। কিন্তু ওর সাথে কথা বলে মনে হল যে সত্যব্রত আমাদের রিসার্চের বিষয় ভ্যাকুয়াম ইলেকট্রন ডিভাইস বিভাগ থেকে সলিড স্টেট ডিভাইস বিভাগের জন্য বেশী উপযুক্ত। অতঃপর ওর পি এইচ ডি রেজিস্ট্রেশন সলিড স্টেট ডিভাইস বিভাগে প্রফেসার বি বি পালের কাছে করা হল। পরে সত্যব্রত ম্যাকগ্র হিল প্রকাশিত জে মিলম্যান এবং সি সি হ্যাল্কিয়াসের সাথে 'ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস' শীর্ষক ওর লেখা বই এবং ওর উচ্চস্তরীয় রিসার্চের জন্য বিখ্যাত হল। সত্যব্রতর মতন সরিৎ পালও প্রথমে আমার কাছে পি এইচ ডি করতে এসেছিল। কিন্তু ওর সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম ওর ইন্টারেস্ট কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকে। ওকে পি এইচ ডি করতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার এস কে কাকের কাছে পাঠালাম। প্রফেসার কাকের কাছে পি এইচ ডি করে ওনারই নির্দেশে সরিৎ হিমাচলের অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি, সোলান, হিমাচলে টিচিং ফ্যাকাল্টিতে জয়েন করে এবং এখন ও দুর্গাপুর, পশ্চিম বঙ্গে ডঃ বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রফেসার রূপে কর্মরত।

আমাদের হায়দ্রাবাদ ক্যাম্পাসের কোয়ার্টারে সরিৎ ওর বন্ধু সঞ্জয় কুমার ঘোষের সাথে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সঞ্জয় আমার কাছে পি এইচ ডি করার অনুরোধ জানালো। ওর সাথে কথা বলে আমার মনে হল আমাদের রিসার্চের বিষয় নিয়ে ওর অনুরাগ আছে। ওর পি এইচ ডি-র সুপারভাইসার হল জৈন (প্রদীপ)। আর আমি হলাম ওর কো-সুপারভাইসার। সঞ্জয় ওর অ্যানালিটিক্যাল দক্ষতার পরিচয় দিল। ওর সাথে আমাদের অনেক রিসার্চ পেপার নামী জার্নালে প্রকাশিত হল। ধীরে ধীরে রিসার্চ স্কলার সরিৎ ও সঞ্জয় যেন আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল আই আই টি খড়গপুরে কি ভাবে রিসার্চ স্কলার আমি সপরিবারে আমার সুপারভাইসার এন বি সি স্যারের পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বড় ছেলে বিল্কুর বিয়েতে আমাদের বি এইচ ইউ-র নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে সঞ্জয় আমার বড়দার ছেলে

(ভ্রাতুষ্পুত্র) শুভ (শুভনীল) এবং রুনুর (রঞ্জিত) সাথে অনেক দায়িত্ব পালন করেছিল। বিশেষ করে বিয়ের দিনে আমার অসুস্থ মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব সঞ্জয়ের উপর দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার জামশেদপুরের কলেজ জীবনের মাস্টার মহাশয় প্রফেসার মদন মোহন মহান্তির ছেলে রুনু সেই সময় বি এইচ ইউ-র ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ডক্টরাল রিসার্চ করছিল। বর্তমানে রুনু এই ডিপার্টমেন্টে প্রফেসার রূপে কর্মরত এবং ওর রিসার্চের অবদানের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। এবং এছাড়া রুনু রোটেশনাল হেডশিপের নিয়মে ডিপার্টমেন্টের হেডের দায়িত্বও পালন করেছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র শুভ তখন নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে থাকত এবং বি এইচ ইউ-তে স্ট্যাটিস্টিক্স বিষয়ে বি এস সি পড়ত। পরে শুভ পুনা ইউনিভার্সিটিতে কমপ্যুটার সায়েন্সে মাস্টার্স করে। নিউ ইয়র্কে টি ডি সিক্যুরিটি ব্যাঙ্কে ভাইস-প্রেসিডেন্ট রূপে কর্মরত শুভ এখন নিউ জার্সিতে সপরিবারে থাকে।

সঞ্জয়ের কথা লিখতে গিয়ে শুভ আর রুনুর কথা এসে গিয়েছিল। পি এইচ ডি করার পর সঞ্জয় একটা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের টেম্পোরারি পোজিশনে সি রি, পিলানীতে জোশীজীর (এস এন জোশী) গ্রুপে জয়েন করল। সঞ্জয়ের সি রি, পিলানীতে থাকার সময় ওর ট্র্যাভেলিং-ওয়েভ ট্যুব বিষয়ে থিওরেটিক্যাল রিসার্চের কাজের পরিচালনা আমি বি এইচ ইউ থেকেই করলাম। একবার হাইড্রোজেন ফার্নেসে কাজ করার সময় একটা দুর্ঘটনা থেকে সঞ্জয় একটুর জন্য রক্ষা পেল। জোশীজী চেয়েছিলেন সঞ্জয়কে হাইড্রোজেন ফার্নেসের কাজ থেকে দূরে রাখতে। আমার পরামর্শে তিনি তা করেন নি। অচিরেই সঞ্জয় সেখানে ট্যুব ফেব্রিকেশন এবং প্রসেসিং-এর কাজে দক্ষ হয়ে উঠল। এই দক্ষতার জোরে সঞ্জয় ব্যাঙ্গালোরের ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড থেকে ওদের মাইক্রোওয়েভ ট্যুব ডিভিশনে কাজ করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল।

অফিসিয়াল কাজে ব্যাঙ্গালোরে গেলে, যেমন প্রজেক্ট রিভিউ করতে ডি আর ডি ও-র ল্যাব এম টি আর ডি সি গেলে, ভারত ইলেকট্রনিক্স কলোনিতে সঞ্জয়ের কোয়ার্টারে কয়েকদিন থেকে আসতাম। ব্যাঙ্গালোরে সবাই সঞ্জয়ের বাড়ীকে আমার বাড়ীই মনে করত। কিন্ত পরে সঞ্জয় সি রি, পিলানীতে ফিরে

আসে যেখানে ও এখন চীফ সায়েন্টিস্ট রূপে কর্মরত। ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, আমেদাবাদকে স্পেস ট্র্যাভেলিং-ওয়েভ ট্যুব নির্মাণের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করার একটি প্রজেক্টকে সঞ্জয় সি রি, পিলানীতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই প্রজেক্ট চলাকালীন প্রজেক্টের একটি রিভিউ কমিটিকে, তদানীন্তন ইসরোর চেয়ারম্যান এস উন্নিকৃষ্ণান নায়ারের সাথে, আমি চেয়ার করেছিলাম।

সঞ্জয়ের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল সেই সময়ের একটি ঘটনার কথা যখন আমাদের ডিপার্টমেন্টে সঞ্জয় ওর পি এই ডি-র এবং জগদীশ্বর রাও ওর বি টেক প্রোজেক্টের কাজ করছে। একটি খ্যাতনামা জার্নালের জন্য জগদীশ্বরের এক্সপেরিমেন্টাল কাজের উপর একটা পেপারের ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখার কাজ চলছিল। তবে কাজটির ভ্যালিডেশনের দরকার ছিল। সঞ্জয়ের কাজটার থিওরেটিকাল ভ্যালিডেশনের জন্য মাত্র ঘণ্টাকয়েক সময় লেগেছিল। এই যুক্তিতে আমার নিষেধ না শুনে পেপারটার লেখকের লিস্ট থেকে সঞ্জয়ের নাম বাদ দিয়ে শুধু এক্নোলেজমেন্টে ওর নামটা দিয়ে জৈন (প্রদীপ) পেপারটা জার্নালে পাঠিয়ে দিল। জার্নালের এডিটর পেপারের ম্যানুস্ক্রিপ্টটি ফেরত পাঠিয়ে দিল এই নির্দেশ দিয়ে যে সঞ্জয়ের নাম শুধু এক্নোলেজমেন্টে দিলে চলবে না; ওর নামটা লেখকের লিস্টে থাকতে হবে। নির্দেশ মতন সঞ্জয়ের নাম এক্নোলেজমেন্ট থেকে লেখকের লিস্টে আনার পর জার্নালে পেপারটা ছাপা হল। জৈনের মনে খুব সম্ভবত একটা শঙ্কা থেকে গেল যে আমি আলাদাভাবে জার্নালের এডিটরকে সঞ্জয়ের নাম লেখকের লিস্টে আনার জন্য বলেছি, যেটা যদিও প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব নয়।

আমাদের পি এইচ ডি-র রিসার্চ গাইড এন বি সি স্যার এবং স্যারের স্ত্রী ঝর্না বৌদি স্যারের ছাত্রছাত্রীদের সন্তানসম স্নেহ করতেন। সেই ধারা বজায় রেখে আমি আর মণিকুন্তলা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সেই রকমই স্নেহ করেছি। আগেই লিখেছিলাম যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গলার্থে মণিকুন্তলা বেনারসের সঙ্কটমোচন মন্দিরে মানত করত। এও লিখেছিলাম যে পঙ্কজের হিন্দি-স্পিকিং ছেলে আর মেয়ে ওদের এক দাদু আর দিদিমা, অর্থাৎ আমি আর মণিকুন্তলা, নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলতাম বলে অবাক হ'ত। যেমন ব্যাঙ্গালোরে সবাই সঞ্জয়দের বাড়ীকে আমাদের বাড়ী মনে করত, দিল্লীতে সবাই পঙ্কজদের বাড়ীকে আমাদের বাড়ী বলেই জানে।

পঙ্কজদের বাড়ী দিল্লীর আনন্দ বিহারের কাছে বসুন্ধরা অঞ্চলে তিনতলার একটি ফ্ল্যাট। ঐ অঞ্চলের ফ্ল্যাট-বাড়ীতে কোন লিফ্ট নেই। সম্প্রতি ওদের বাড়ীর ঠিক সামনে এক তলার একটি ফ্ল্যাট পঙ্কজ কিনেছে। কয়েকদিন আগে পঙ্কজদের বাড়ী গিয়ে শুনলাম পঙ্কজ ওর এক প্রতিবেশীকে বলছে— স্যার আওর আন্টিজী কো সীঢ়ী চঢ়নে মে তকলীফ হোতী হৈ। ইসলিয়ে মৈঁনে ইয়হ ফ্লেট খরীদা।

সুব্রত কুমার দত্ত আমাদের ডিপার্টমেন্টে এম টেক মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে অ্যাডমিশন নিয়েছিল। সুব্রত ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার ব্যাঙ্ক হোল্ডার ছিল। এ ছাড়া সুব্রত শিবপুরের বি ই কলেজের বি টেক-এ ফার্স্ট হয়েছিল। সুব্রত আমাদের ডিপার্টমেন্টের এম টেক-এ 'টেন-আপোন-টেন' পেয়ে রেকর্ড করল। ওর এম টেক প্রোজেক্টের কাজ আমার গাইডেন্সে করেছিল। এদিকে ব্যাঙ্গালোরের ডি আর ডি ও-র ল্যাব এম টি আর ডি সি-র তদানীন্তন ডাইরেক্টার ডঃ এম ডি রাজ নারায়ন আমাকে তাঁর ল্যাবের জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে এম টেক পাস একজন ব্রিলিয়েন্ট সায়েন্টিস্টকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। সেই মতন সুব্রত এম টি আর ডি সি জয়েন করল এবং সেখানে এখন সে উচ্চপদস্থ সায়েন্টিস্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রেব্রটেজিক কাজের সাথে যুক্ত। এক্সটার্নাল পি এইচ ডি প্রোগ্রামে সুব্রত আমার সুপারভিশনে বি এইচ ইউ থেকে পি এইচ ডি করে। সুব্রতর এম টেক প্রোজেক্টের কাজের এক্সটেনশন হিসেবে ওর পি এইচ ডি-র কাজকে নেওয়া হল। যে ডিভাইসের উপর এবং যে উপায়ে কাজটা করা হবে তা অভিনব ছিল এবং কাজটা এর আগে করতে অনেকে অসফল হলেও, ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির প্রফেসার আর জি কার্টারের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বাভাস অনুযায়ী সুব্রত আমার সুপারভিশনে ওর পি এইচ ডি-র কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিল।

ওর থিসিসের এই কাজ করতে সুব্রতকে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর থেকে বেনারাস আসতে হ'ত। সুব্রত একবার বেনারসে এলে ওকে আমি ওর পি এইচ ডি থিসিস লিখতে বললাম। তখন সঞ্জয়ও আমাদের সাথে ওর পি এইচ ডি-র কাজ করছিল। কিন্তু এরপরই অবাক হয়ে গেলাম যখন সঞ্জয় আমার রুমে এসে আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল আমি কি সুব্রতকে বলেছি

যে ও আমার রুমের বাইরে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ জানতে গিয়ে পারলাম যে সুব্রতর যদিও আমার সাথে অনেক পেপার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, ওর কোন আই ই ই ই (আইট্রিপ্লই) ট্র্যাসেকশনে একটাও পেপার নেই এবং তা সত্ত্বেও আমি ওকে থিসিস লিখতে বলেছি। সুব্রত শুনতে পেয়েছিল যে আইট্রিপ্লই ট্র্যাসেকশনে দুটো পেপার না হওয়া পর্যন্ত আমি কাউকে পি এইচ ডি থিসিস লিখতে বলি না। আমি কি সুব্রতকে তবে আন্ডার-এস্টিমেট করছি? সুব্রতর মনে এই শঙ্কা ওর মন খারাপের কারণ। অতএব সুব্রত নিজেই বেছে নিল ওর থিসিস লেখার সর্ত্ত।

আমি খুশী হলাম যে এর কিছুদিন পর সুব্রতর একটা পেপার আইট্রিপ্লই ট্র্যাসেকশন অন ইলেকট্রন ডিভাইস জার্নাল গ্রহণ করতে সম্মত হল। কিন্তু সুব্রত নিজেই পেপারে বর্ণিত তথ্যে একটা ভুল দেখতে পেল যা আমার এবং জার্নালের রিভিউয়ারদের এবং এডিটরের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। তাই সুব্রত পেপারটা উইথড্র করে নিল। এডিটর পেপারটির সংশোধনের সময়ের সীমারেখা জানিয়ে দিলেন। ল্যাবের প্রজেক্টের কাজের চাপে সুব্রত সময়সীমার মধ্যে সংশোধিত পেপারটা তৈরি করতে পারলনা। দেরী করে পাঠানোতে পেপারটি নতুন সাবমিশন রূপে গৃহীত হল। সব মিলিয়ে পেপারটা ছাপতে বেশ দেরী হয়ে গেল। বারে বারে, কিন্তু কম সময়ের, জন্য সুব্রত ওর থিসিস লেখার কাজে ব্যাঙ্গালোর থেকে বেনারসে আসতে থাকল। একবার সুব্রত বেনারসে এলে ওকে ডিপার্টমেন্টের গেস্টহাউস থেকে আমাদের বাড়ী 'কিডন্যাপ' করে নিয়ে এলাম। হেড হিসেবে বিশ্বম্ভরকে আই আই টি, রূরকী-তে ওর পি এইচ ডি-র বাকী কিছুটা কাজ করতে বেআইনি ফ্রেঞ্চ লিভ দেওয়ার দুষ্টুমির কথা আমি সুব্রতর ল্যাব ডাইরেক্টার শ্রী কে ইউ লিমায়েকে বলেছিলাম। যাইহোক, তিনি প্রথাগত ভাবে তিনি সুব্রতর লম্বা ছুটির ব্যবস্থা করেছিলেন।

সুব্রতর মতন এক্সটার্নাল পি এইচ ডি প্রোগ্রামে সুধীর কামাথ (প্রাক্তন এম টি আর ডি সি-র ডাইরেক্টার এবং প্রাক্তন ডি আর ডি ও-র ক্লাস্টার ডাইরেক্টার) আমার এবং জৈনের সুপারভিশনে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে পি এইচ ডি করে। এইভাবে এক্সটারনাল পি এইচ ডি প্রোগ্রামে এম ভি কার্তিকেয়ন (প্রাক্তন আই আই টি রূরকী-র প্রফেসার এবং বর্তমানে আই

আই আই টি ডি এবং এম কাঞ্চীপুরম-এর ডাইরেক্টার) আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে পি এইচ ডি করে। ওর ইন্টার্নাল সুপারভাইসার ছিলেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসার ডি এস ভেঙ্কেটেশরুলু। ওর এক্সটার্নাল সুপারভাইসার ছিল সি রি, পিলানীর ডঃ অশোক কুমার সিন্হা। আকর্ষণীয়ভাবে সিন্হা কার্তিকেয়নের থেকে সি রি, পিলানীর সিনিয়রিটির মাপকাঠিতে জুনিয়ার ছিল। কার্তিকেয়নের পি এইচ ডি-র কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য সিনিয়রিটি-জুনিয়ারিটি উপেক্ষা করে আমি এই ব্যবস্থা করেছিলাম।

আরও একজন মেধাবী ছাত্র উমা শঙ্কর তিওয়ারি ওর পি এইচ ডি-র জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমার কাছে রেজিস্টার্ড হল। ওর রিসার্চের বিষয় ছিল এক ধরণের মাইক্রোওয়েভ ট্যুবের ইলেকট্রন গান। সেই সময়ে সি রি, পিলানী ইলেকট্রন গান বিষয়ে আমার একটি মৌলিক বক্তৃতামালার আয়োজন করল। বক্তৃতার প্রোগ্রামের শেষে বেনারসে ফেরার সময় আমার বক্তৃতার হাতে লেখা নোট সি রি, পিলানীর গেস্টহাউসের চাবির ড্রয়ারে রেখে দিয়ে গেস্টহাউসের কর্মচারী শ্রী রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলাম সি রি-র সায়েন্টিস্ট শ্রী এইচ এন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তৃতার নোটটি দিতে। কিন্তু শ্রী রামচন্দ্রর ভুলে যাওয়াতে আমার নোট গেস্টহাউসের চাবির ড্রয়ারেই রয়ে গেল। এর কিছুদিন পর ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত অধুনা বিলুপ্ত লিটন ইন্ডাস্ট্রি থেকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ জে আর এম ভন ওই একই বিষয়ে, যদিও উন্নতস্তরের, বক্তৃতা দিতে সি রি, পিলানী-তে আমন্ত্রিত হলেন। সি এস আই আর-এর ডিস্টিনগুইশড ভিজিটিং সায়েনন্টিস্ট হওয়ার সুবাদে ডঃ জে আর এম ভনের বক্তৃতা শুনতে আমিও আমন্ত্রিত হলাম। আমি অবাক হলাম ডঃ ভনের প্রথম তিনটি বক্তৃতায় অনেকবার শুনলাম 'এটা হল প্রফেসার বসুর 'এত' নাম্বার ইক্যুয়েশন' ইত্যাদি।

গেস্টহাউসে একসাথে লাঞ্চ নেওয়ার সময় একদিন ডঃ ভনকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে আই ট্রিপ্ল-ই ট্র্যান্স্যাক্সন অন ইলেকট্রন ডিভাইসেস-এর ইলেকট্রন গান সিন্থেসিস পেপারে ইলেকট্রন গান ইলেকট্রোডের পোজিশন দিয়েছেন কিন্তু জ্যামিতিক আকার দেন নিই কেন? ডঃ ভন উত্তর দিলেন—ইলেকট্রোডের জ্যামিতিক আকার সিন্থেসিস করে পেলে তা আমি বিক্রি করে পয়সা রোজগার করতাম, পেপারে ছাপতাম না।

তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—তুমি যদি তা পেতে কি করতে? আমার উত্তর—আমি কনফর্মাল ম্যাপিং করে ইলেকট্রোডের জ্যামিতিক আকার বের করে ফেলেছি। আমি এই কাজটা আই ট্রিপ্ল-ই ট্র্যাস্যাক্সন অন ইলেকট্রন ডিভাইসেস-এ প্রকাশিত করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন—তাই যদি হয় পেপারের ম্যান্যুস্ক্রিপ্ট আমাকে দাও। আমি এই জার্নালের এডিটর। তোমার কাজটা ছাপা হয়ে যাবে। ফলতঃ আমার ছাত্র উমা শঙ্কর তিওয়ারিকে সাথে নিয়ে দু'টি পেপার এই ট্র্যাস্যাক্সনে প্রকাশিত করলাম—একটা ১৯৮৭ সালের মে মাসে এবং আরেকটা ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে।

তবে বলতে গেলে আমার পি এইচ ডি রিসার্চ সুপারভাইজ করার অভিজ্ঞতার শুরু হয়েছিল আমার বি এইচ ইউ জয়েন করার আগে থেকে অশোক কুমার সিন্হার রাঁচি ইউনিভার্সিটির পি এইচ ডি দিয়ে যখন আমরা আর আই টি জামশেদপুরে ছিলাম। প্রসঙ্গত, অশোক যখন সি রি পিলানীতে কর্মরত, ওকে আমি প্রফেসার গান-সিক পার্কের অনুরোধে সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলাম যেখানে ও উচ্চ স্তরের রিসার্চ করে আমাদের গর্বিত করেছে। অশোক দেশে বিদেশে ওর রিসার্চ অবদানের জন্য সমাদৃত হয়েছে। সি রি পিলানীতে ওর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাইরোট্রন ল্যাব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অশোকের প্রচেষ্টায় সি রি পিলানীর শ্রীনিবাস জোশী ওনার সি রি পিলানী থেকে সেবানিবৃতির কিছু আগে মীরাটের চৌধুরী চরণ সিং ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী পান। ওনার পি এইচ ডি-র ভাইভা-ভোসি (মৌখিক) পরীক্ষার আমি পরীক্ষক ছিলাম। এই পরীক্ষার খোলা উপস্থাপনায় (ওপেন প্রেসেন্টেশন) মুজফ্ফরনগর থেকে সি রি পিলানীর সেবানিবৃত সায়েন্টিস্ট সুবিখ্যাত ট্রিরপ্ল-এস (ডঃ এস এস এস আগরওয়ালা) উপস্থিত ছিলেন।

বি এইচ ইউ-তে আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমার ক্লাসের ফাঁকে বিশাল কেশরীকে আমার পাশে বসিয়ে ওকে দিয়ে ওর পি এইচ ডি থিসিস লেখানোর মুহূর্তগুলো ভোলার নয়। মনে আছে একবার দিল্লী যাওয়ার সময় বেনারস ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনে গিয়ে শুনলাম ট্রেন অনেক লেট। আমি বিশালকে টেলিফোন করে ওর থিসিসের ড্রাফট নিয়ে স্টেশনের ওয়েটিং হলে আসতে বললাম। ট্রেনের লেট হওয়াটা আমাদের কাছে 'শাপে বর' হয়ে

গেল। একবার আমি দিল্লীর ডিফেন্স মিনিস্ট্রির রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে একটি অফিসিয়াল মিটিং-এর শেষে ওদের অফিসে একটি স্কিমে ডি আর ডি ও-তে রিক্রুটমেন্টের জন্য বিশালের অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে এলাম। স্কিমটির নাম রেজিস্ট্রেশন অফ স্টুডেন্টস উইথ স্কলাস্টিক অ্যাপ্টিট্যুট। ফলস্বরূপ বিশাল ডি আর ডি ও-র ল্যাব এম টি আর ডি সি জয়েন করল যেখানে ও এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সায়েন্টিস্ট। সম্প্রতি বিশাল আর আমি দু'জনে মিলে একটা বই লিখেছি—হাই পাওয়ার মাইক্রোওয়েভ ট্যুবসঃ বেসিক্স অ্যান্ড ট্রেন্ডস। দুই ভল্যুমের বইটি যুগ্মভাবে প্রকাশ করেছে স্যান রাফায়েল ক্যালিফোর্নিয়ার মরগ্যান অ্যান্ড ক্লেপুল পাবলিশার্স এবং ব্রিস্টলের ইন্সটিট্যুট অফ ফিজিক্স। বইটির প্রস্তাবনা লিখেছেন ইউনিভার্সিটি অফ নিউ মেক্সিকো থেকে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসার ইডিএল শামিলাগ্লু। মনে আছে আমার মুখে-বলা আমাদের দেশের প্রথম জাইরোট্রন বানাবার প্রাথমিক প্রজেক্ট প্রপোসাল টাইপ করেছিল বিশাল। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সি আর এম টি ল্যাবে প্রফেসার আর কে ঝার বিশালের কাছ থেকে প্রপোসালের টাইপ করা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সেই মুহূর্তটি আমার মনের আঙিনায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রপোসালের ভিত্তিতে ডি এস টি দ্বারা স্পন্সর্ড মাল্টি-ইন্সটিট্যুশানাল ফিউসন হিটিং-এর জন্য জাইরোট্রন প্রজেক্টের জন্ম হয়েছিল।

ইন্সটিট্যুটে আমাদের ডিপার্টমেন্টের রিসার্চের জন্য সুনাম ছিল মূলত আমাদের রিসার্চ স্কলারদের অবদানের জন্য। কিন্ত এটা সত্যি নয় যে সব রিসার্চ স্কলার তাদের সুপারভাইসারদের সহযোগিতা পেত। একবার ডিপার্টমেন্টের একজন রিসার্চ স্কলার ওর সুপারভাইসারের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বাক্স-বিছানা নিয়ে চিরতরে বি এইচ ইউ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আমার সাথে দেখা করতে এল। আমি আর মণিকুন্তলা ওকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আটকালাম। রুনুর (রঞ্জিত মহান্তি) প্রতি ওর সুপারভাইসারের দুর্ব্যবহারে বৃত্তান্ত আমি আগে বিশদভাবে লিখেছিলাম। একদিন এক রিসার্চ স্কলারকে দেখলাম প্রচণ্ড শীতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের বিশ্বনাথ মন্দিরের সামনে উদ্ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেও সেই সুপারভাইসারের নির্লিপ্ততার কাহিনী। সুপারভাইসার রিসার্চ স্কলারকে থিসিস লিখতে দিচ্ছেন

না। আমার মধ্যস্থতায় সংশ্লিষ্ট রিসার্চ স্কলার ওর থিসিস লিখতে পেরেছিল।

বি এইচ ইউ-তে পড়াশুনা করার পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকলে এক্সটার্নাল পি এইচ ডি প্রোগ্রামে পি এইচ ডি থিসিস জমা দেওয়ার আগে ক্যান্ডিডেটকে অন্তত ছ'মাস আমাদের ইউনিভার্সিটিতে থাকার আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা (রেসিডেন্শিয়াল রিকোয়ারমেন্ট) ছিল। এক নাগাড়ে ছ'মাস না থেকে তিন মাস করে দু'বার থাকা যেত। আমি যখন ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলাম চাইলে সি রি পিলানীর এক্সটার্নাল ক্যান্ডিডেটেকে রেসিডেন্শিয়াল রিকোয়ারমেন্টের সময়কালে আমি লাইব্রেরী কন্সাল্ট অথবা ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করার জন্য ক্যান্ডিডেটের কর্মস্থল সি রি পিলানীতেই পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু সি রি পিলানীর সায়েন্টিস্ট পি আর দেশমুখের ক্ষেত্রে আমি তা করলাম না। দেশমুখ এবং ওর এক্সটার্নাল সুপারভাইসার সি রি পিলানীর ডাইরেক্টার ডঃ ডবল্যু এস খোখলে আমার নির্ণয়ে দুঃখিত হলেন। এর অনেক দিন পর দেশমুখের বেলায় আমার এহেন নির্ণয়ের কারণ ডঃ খোখলে জানতে চেয়েছিলেন, যখন ওনার সাথে আমার আই আই টি দিল্লীতে দেখা হয়েছিল যেখানে তিনি তখন সি রি পিলানী থেকে সেবানিবৃতির পর এমেরিটাস প্রফেসাররূপে কর্মরত ছিলেন। এখনও ধরে আছি সেই মুহূর্তটিকে যখন ডঃ খোখলে ওনার আই আই টি দিল্লীর রুমে আমার হাত দু'টি জড়িয়ে বললেন—বসু, তোমাকে তো আমি একজন ভালো টিচার এবং রিসার্চার হিসেবে জানি। তুমি যে একজন ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটার তা আমার জানা ছিল না। আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য তিনি করলেন দেশমুখ সংক্রান্ত আমার নির্ণয়ের কারণ জেনে। কারণটা আমি ডঃ খোখলেকে জানিয়েছিলাম—স্যার, আপনিতো জানেন দেশমুখ কতটা সংবেদনশীল। রেসিডেন্শিয়াল রিকোয়ারমেন্টের সময়কালে যখন দেশমুখের বেনারসে থাকার কথা তখন ও কি ভাবে পিলানীতে আছে এই প্রশ্ন শ্রী রামচন্দ্র সিং (কল্পিত নাম)—যার লোকের পেছনে-লাগার দুর্নাম কারুর অজানা নেই— যদি দেশমুখকে করত, তা হলে কি হ'ত? তখন রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে, চিন্তায় চিন্তায়, দেশমুখ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ত। তখন কোথায় দেশমুখের পি এইচ ডি হ'ত?

ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রী এবং রিসার্চ স্কলারদের খেয়াল রাখা ছাড়া আমি ফ্যাকাল্টি রিক্রুটমেন্টের জন্য চেষ্টা

করেছি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আমার ডিপার্টমেন্টের জন্য রিক্রুটমেন্ট করার প্রচেষ্টার কথা আগে লিখেছি। রিক্রুটমেন্ট ছাড়া ডিপার্টমেন্ট পরিচালনার আরেকটি দিক হল ফ্যাকাল্টি রিটেনশন অর্থাৎ টিচারদের ধরে রাখা যাতে তাঁরা ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে না যায়। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। ডিপার্টমেন্টের রীডারের পোস্টে নতুন রিক্রুট ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী এসে আমাকে বলল যে ও ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দিতে চায়; ও ফিরে যেতে চায় বি আই টি মেশরাতে যেখান থেকে ও লিয়েন নিয়ে এসেছিল। মনে পড়ে গেল ভাইস-চ্যান্সেলার প্রফেসার সি এস ঝা পার্থর রিক্রুটমেন্টের সময় আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে ওর মতন ব্রিলিয়েন্টকে ধরে রাখার জন্য আমাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। পার্থর অনুযোগ ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়ার প্রফেসার রমেশ ভাটিয়া (কল্পিত নাম) বি টেক-এর প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সামনে পার্থকে অপমান করে বলেছেন যে পার্থ না কি সাবজেক্টের কিছুই জানে না। আমি পার্থকে বললাম যে আমার কাছে ছাত্রছাত্রীদের অনুযোগ আছে যে প্রফেসার ভাটিয়া ভুলভাল পড়ান এবং তার বদলে যেন অন্য কাউকে ক্লাসে পাঠানো হয়। আমি পার্থকে বললাম এটা আমার আদেশ যে ও পরবর্তী ক্লাসে প্রফেসার ভাটিয়ার সামনেই ছাত্রছাত্রীদের বলবে যে ডিপার্টমেন্টের হেড খবর পাঠিয়েছেন যে ছাত্রছাত্রীরা যেন প্রফেসার ভাটিয়ার ভুলভাল পড়ানো থেকে সাবধান থাকে এবং সেই জন্যই ওকে (ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তীকে) ক্লাসে পাঠানো হয়েছে। এরপর আমি যেমনটি আশা করেছিলাম তেমনটাই হল। পার্থ আমাকে এসে বলল ওকে না কি এখন প্রফেসার ভাটিয়া এমনই 'ভি আই পি' ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন ওর রীতিমত বিব্রত বোধ হচ্ছে। পার্থ আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশনে মোতীলাল নেহরু ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজি, এলাহাবাদের ডাইরেক্টার হয়েছিল এবং এখন পার্থ ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি, শিবপুরের ডাইরেক্টার।

এবার আমাদের ডিপার্টমেন্টের বি টেক-এর এক ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র প্রতীক উপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসি। প্রতীক বি টেক-এর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ওর আর ওর পার্টনার প্রতিষ্ঠিত ট্যুটোরিয়াল ইন্সটিট্যুটে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করে দিতে চেয়েছিল এবং এই ব্যাপারে প্রতীক একদিন আমাদের কোয়ার্টারে

এসে আমার পরামর্শ চাইল। প্রতীক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ছিল কিন্তু ওর নিজের ইন্সটিট্যুটে ও কেমিস্ট্রি পড়িয়ে সুনাম অর্জন করেছিল। ও আমাকে বলল যে এখনই ও যা রোজগার করছে তা বি টেক পাস করার পর কোন কোম্পানি ওকে দেবেনা। ওকে জানালাম যে কেউ টাকা রোজগার করবে বা অন্য কিছু করবে তা যে যার নিজের চয়েস। এদিকে বি টেক-এর টার্ম পরীক্ষায় অনেক পেপারে প্রতীক 'ব্যাক' পেতে থাকল। আমি ওকে বললাম প্রথম কথা ও যে একজন বি টেক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র তা ওদের ইন্সটিট্যুটের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এডমিশন-প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করে। দ্বিতীয় কথা বি টেক পড়া মাঝপথে ছেড়ে দেওয়াতে ওর মনে অজান্তে যে একটা হীনমন্যতা সৃষ্টি হবে তা ওর কর্মজীবনে প্রতিফলিত হয়ে ওর ট্যুটোরিয়াল ইন্সটিট্যুটের অগ্রগতিকে শ্লথ করে দেবে। ভালো লাগে যে প্রতীক বি টেক ডিগ্রী পেল এবং ওর ইন্সটিট্যুট (ক্যাট জেইই) এখন বেনারসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্যুটোরিয়াল ইন্সটিট্যুট।

আগে আমি লিখেছিলাম কি ভাবে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমি হেড হিসেবে ডিপার্টমেন্টের রিক্তপদ ভর্তির ইন্টার্ভিউ করার জন্য প্রতিবদ্ধ হয়েছিলাম। এবার বিভিন্ন সরকারী ল্যাবে সায়েন্টিস্ট নিয়োগের ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকার কিছু কৌতূহলোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক মুহূর্ত ধরে রাখার চেষ্টা করছি। আগে এক জায়গায় লিখেছিলাম হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ডি আর ডি ও ল্যাব ডি এল আর এল-এ আমার নিযুক্তির আগে সংশ্লিষ্ট ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী নারায়ন রাওকে ইম্প্রেশ করেছিলাম বোর্ডের এক্সপার্ট মেম্বার স্বনামধন্য পদ্মশ্রী আর পি শেনয়ের সাথে একটি প্রশ্নোত্তরের সময় আমার বিশ্লেষণ দিয়ে। এও লিখেছিলাম যে সি রি পিলানীর ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসার দত্ত রায় (সুহাসদা) আর আমি (ইন্টারভিউ বোর্ডের এক্সপার্ট মেম্বার) দু'জনেরই ভুলে-যাওয়া একটি নাম মনে করতে না পারায় কি রকম অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলাম। দুই প্রার্থীর ইন্টার্ভিউ-এর মধ্যবর্তী সময়ও সুহাসদার নামটি জানার আকুতির সেই মুহূর্তটিকে কি ভোলা যায়?

এবার আসছি একটি ঘটনার কথায় যখন প্রফেসার আর এন বিশ্বাস সি রি পিলানীর ডাইরেক্টার রূপে কর্মরত। প্রফেসার বিশ্বাসের সাথে আমার

'তুমি'র সম্পর্ক ছিল, যাকে আমি নাম ধরে রণেনদা বলে ডাকতাম। সি রি পিলানীর একটি ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে ফোন ধরার জন্য রণেনদা বিচলিত হয়ে বারে বারে উঠে যাচ্ছিল। আমি ছিলাম বোর্ডের এক্সপার্ট মেম্বার। বিচলিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করাতে রণেনদা আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল। ইন্টারভিউ-এর রেজাল্ট সীল হয়ে যাবার পর রণেনদা আমাকে কারণটা জানাল। অফিস থেকে রণেনদার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার জেনে এক মন্ত্রী মহাশয় একটি প্রার্থীকে (ক্যান্ডিডেটকে) সিলেক্ট করার জন্য বারে বারে ফোন করে রণেনদাকে তদ্বির করছিল। বলাবাহুল্য, ইন্টারভিউ চলাকালীন রণেনদা সেই ক্যান্ডিডেটের নাম জানিয়ে আমাদের প্রভাবিত করেনি। আমাদের সিলেক্সন লিস্টে সেই ক্যান্ডিডেটের নাম না থাকায় রণেনদা যে জোর বাঁচান বেঁচে গেছে তা আমাকে জানাল। অফিসের লোকেরা জেনে গিয়েছিল যে ঐ ক্যান্ডিডেটের নিযুক্তির জন্য মন্ত্রী মহাশয় রণেনদাকে বারে বারে ফোন করেছিল। ক্যান্ডিডেটটি সিলেক্টেড হলে রণেনদার বিরুদ্ধে মিথ্যে পক্ষপাতিত্বের বদনাম হতে পারত।

সি এস আই আর-এ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিরয়াল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সি এস আই আর-এর একটি ল্যাবের ডাইরেক্টার সেই ল্যাবের একটি ইন্টারভিউ বোর্ডকে অ্যাকাডেমি থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার বা প্রেফারেন্স দিতে বললেন। সেই সূত্র ধরে বোর্ডের চেয়ারম্যান অ্যাকাডেমি থেকে উত্তীর্ণ একটি প্রার্থীর খুব প্রশংসা করলেন। প্রার্থী যে খুব ভাল কাজ করে তা নাকি তিনি প্রার্থীর সুপারভাইসারের কাছে সম্প্রতি শুনেছেন। আমি ঐ বোর্ডের এক্সপার্ট মেম্বার ছিলাম। আমার প্রশ্নের জবাবে বোর্ডে উপস্থিত সি এস আই আর-এর সিস্টার ল্যাবের দু'জন প্রতিনিধি আমাদের জানালেন যে অ্যাকাডেমির প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান উল্লিখিত প্রার্থীর সুপারভাইসারের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে চেয়ারম্যানের সাথে উক্ত প্রার্থী সম্বন্ধে সুপারভাইসারের কোন আলোচনা কস্মিনকালে হয়নি। প্রসঙ্গত প্রার্থীর সুপারভাইসারকে অতীতে আমি ওর ডক্টরাল রিসার্চ সুপারভাইস করেছিলাম। এইভাবে পক্ষপাতিত্বের বিপথে যাওয়া থেকে আমি বোর্ডকে নিরস্ত করেছিলাম।

ইন্টারভিউ বোর্ডের এক্সপার্ট মেম্বার হয়ে বিভিন্ন সময়ে সি রি পিলানীর অনেক ইন্টারভিউ মীটিং অ্যাটেন্ড করার সময়কার দু'টি ঘটনার কথা লিখছি। একবার বোর্ডের চেয়ারম্যান সুহাসদা আমাকে একজন প্রার্থী উদিত নারায়ন পালকে কোন প্রশ্ন করতে বারণ করলেন। উদিতকে আমি বি এইচ ইউ-তে ওর এম টেক ক্লাসে পড়িয়েছিলাম। উদিতের ইন্টারভিউ হয়ে যাবার পর চেয়ারম্যান সুহাসদা উদিতের পারফরমেন্সের ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে বোর্ডের সমক্ষে আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন—প্রফেসার বসু ভালই পড়ান। উদিত এখন সি রি, পিলানীর সিনিয়ার প্রিন্সিপ্যাল সায়েন্টিস্ট। উদিতকে আমি পড়িয়েছিলাম তবে এম টেক থিসিস সুপারভাইস করেছিলেন প্রফেসার এস পি সিং। উদিত পরে বি আই টি মেশরা থেকে পি এইচ ডি করে। সি রি পিলানীর প্লাসমা ল্যাবে ওর অবদান অনবদ্য। আমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উদিত ওর টিম মেম্বারদের সাথে নিয়ে, যাদের মধ্যে আমার আরেক ছাত্র ডঃ নীরজ কুমার অন্যতম, দেশে প্রথম 'প্যাসোট্রন' অস্সিলেটার ডেভেলপ করে।

বি এইচ ইউ থেকে আমার সেবানিবৃতির পর আমার অনুরোধে আমার রিসার্চের জন্য অনেক বই পিলানী থেকে বেনারসে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিত। উদিতের কাছে আবদার করেছিলাম আমাকে উত্তর প্রদেশের গ্রাম দেখাতে। উদিতের গ্রাম উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার পাল্লাভন গ্রামে। আমরা ওদের গ্রামে যাওয়ার আগে ও আমাদের জন্য ওয়েস্টার্ন টয়লেট বানালো। আমরা ওদের গ্রামে যাওয়াতে গ্রামে উৎসব শুরু হল। গ্রামবাসীরা ওয়েস্টার্ন টয়লেট দেখতে এল। উদিতের আত্মীয়স্বজন উত্তর প্রদেশের অন্যান্য জায়গা থেকে পাল্লাভন গ্রামে চলে এল। রাত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান আর দিনে পিকনিক হল। খবরের কাগজের রিপোর্টার এল।

আরেকটি ঘটনায় প্রার্থী অনির্বাণ বেরা দুটি পোস্টে—সায়েন্টিস্ট 'বি' এবং এক পোস্ট উঁচু সায়েন্টিস্ট 'সি' পোস্টে—আবেদন করেছিল। অনির্বাণ ওর বর্ধমান ইউনিভার্সিটির এম টেক প্রজেক্টের রিসার্চ সি রি পিলানীতে সম্পন্ন করেছিল। দিল্লীর সি রি সেন্টারে সায়েন্টিস্ট 'বি' পোস্টের জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে চলে যাচ্ছিল যদিও তখন ওর সায়েন্টিস্ট 'সি' পোস্টের জন্য ইন্টারভিউ দেওয়া বাকী ছিল। ঠিক সেই সময় বোর্ডরুমের বাইরে

অনির্বাণের সাথে বোর্ড মেম্বার সি রি পিলানীর সায়েন্টিস্ট ডঃ শ্রীনিবাস জোশীর দেখা হয়ে গেল। ডঃ জোশীকে অনির্বাণ বলল একটি সায়েন্টিস্ট 'সি' পোস্টের জন্য জনা চারেক পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী প্রার্থী রয়েছে, তাই আর ওই পোস্টের জন্য ওর ইন্টারভিউ দেওয়ার কোন মানে হয়না। অবশ্য ডঃ জোশীর কথা মতন নিয়ম রক্ষা করতে সায়েন্টিস্ট 'সি' পোস্টের জন্য অনির্বাণ ইন্টারভিউ দিয়েছিল। সায়েন্টিস্ট 'বি' পোস্টের ইন্টারভিউ-এর সময় অনির্বাণকে অনেক প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাই সায়েন্টিস্ট 'সি' পোস্টের জন্য ওকে আর কোন প্রশ্ন করা হল না। এই ইন্টারভিউ-এর ফলাফলের ভিত্তিতে অনির্বাণ সায়েন্টিস্ট 'সি' পোস্টে সি রি পিলানী জয়েন করল। পরে আমার রেকমেন্ডেশনে অনির্বাণ আর ওর সহকর্মী রঞ্জন (বারিক) প্রফেসার গান-সিক পার্কের গাইডেন্সে সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি করে। অনির্বাণ আর রঞ্জন এখন দু'জনেই সি রি পিলানীতে সিনিয়ার প্রিন্সিপ্যাল সায়েন্টিস্ট রূপে কাজ করছে।

দিল্লীর সি রি সেন্টারে ইন্টারভিউ-এর কথা লিখতে গিয়ে সেন্টারের হেড ডঃ কে ভি রামকৃষ্ণনের কথা এবং তাঁকে কেন্দ্র করে একটি ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। একবার তিনি দিল্লীর সি রি সেন্টার থেকে আমাকে, সমীরকে (আমার ক্লাসমেট প্রফেসার সমীর কুমার লাহিড়ী), এবং আরও একজনকে এক্সকর্ট করে মোটর গাড়ীতে সি রি পিলানী নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা সেখানে একটি ইন্টারভিউ কমিটির এক্সপার্ট মেম্বার ছিলাম। দিল্লী এয়ারপোর্ট থেকে পিক-আপ করে আমাদের প্রথমে দিল্লীর সি রি সেন্টারে নিয়ে আসা হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল যখন আমরা দিল্লী সেন্টার থেকে পিলানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলাম। গাড়ীতে ড্রাইভারের পাশে সামনের সীটে ডঃ কে ভি রামকৃষ্ণন বসেছিলেন। পিছনের সারিতে আমি আর সমীর তৃতীয় জনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তাঁর আসায় দেরী হওয়াতে অসহিষ্ণু হয়ে ডঃ রামকৃষ্ণন পিছন ফিরে কিছুটা আদেশের সুরে আমাকে বলে উঠলেন—যাও তো বসু দেখে এস এত দেরী হচ্ছে কেন? ডঃ রামকৃষ্ণনের একজন এক্সপার্ট মেম্বার আমার প্রতি এহেন আদেশ সমীরের ভাল লাগল না। সমীরকে বোঝালাম যে ডঃ রামকৃষ্ণন আমাকে স্নেহ করেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করতেই পারেন।

এই বার বলা যাক ইন্টারভিউ বোর্ডের একটি কৌতূহলজনক গল্প। আমার বয়স তখন বেশী ছিল না। সি রি পিলানীতে এসেছিলাম একটি ইন্টারভিউ বোর্ডে সি রি-র মাইক্রোওয়েভ ট্যুব ডিভিশনের এক্সপার্ট মেম্বার হয়ে। এই বিভাগের ইন্টারভিউ হয়ে যাবার পর সি রি-র সিস্টেম ডিভিশনের ইন্টারভিউ হচ্ছিল। এই ডিভিশনের প্রার্থীদের কাছে আমার কোন বিষয়গত প্রশ্ন ছিল না। একজন প্রার্থীকে ব্ল্যাকবোর্ডে একটা ফরমুলা লিখতে বলা হল; প্রশ্নকর্তা ছিলেন সিস্টেম ডিভিশনের এক্সপার্ট। প্রার্থী ফরমুলাটি লিখতে পারলনা। এদিক-ওদিক প্রশ্ন করে প্রার্থীকে বিদায় জানানো হল। কিন্তু আমি বাদ সাধলাম। আমি বললাম প্রার্থীর জন্য আমার একটা প্রশ্ন ছিল। উপস্থিত সবাই বিস্মিত হলেন। বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে আমি প্রার্থীকে ফরমুলাটি ব্ল্যাকবোর্ডে ডিড্যুস বা ডিরাইভ করতে বললাম। ফার্স্ট প্রিন্সিপ্লস থেকে প্রত্যেকটা স্টেপ লিখে ফরমুলাটি ডিরাইভ করে প্রার্থী সবাইকে অবাক করে দিল। এবার সবাই প্রার্থীর লেখা প্রত্যাশিত ফরমুলাটি দেখতে পেল। সংশ্লিষ্ট সিস্টেম ডিভিশনের এক্সপার্ট স্বীকার করলেন যে তার পক্ষেও এই ফরমুলাটি অফ-হ্যান্ড ডিরাইভ করা সম্ভব নয়। উপস্থিত সবাই জানতে চাইলেন কি ভাবে প্রার্থীর মধ্যে এই সম্ভাবনার কথা আমি বুঝতে পারলাম। আসলে আমি প্রার্থীর ফাইলে ওর এম টেক থিসিস মেন্টারের টেস্টিমোনিয়াল দেখে জানতে পেরেছিলাম যে ওর সাথে অন্তরঙ্গ ভাবে যোগাযোগ করলেই ও খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন গোয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার এবং সি রি পিলানীর রিসার্চ কাওউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসার বি এস সোনন্ডে। সেই মুহূর্তটিকে কি ভোলা যায় যখন তিনি আমাকে বললেন—তোমার কাছে আজ আমি অনেক কিছু শিখতে পারলাম।

নব্বুই দশকে (১৯৯৩ সালের জুন মাসে) আমি ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটি গিয়েছিলাম। এটা ছিল আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। মূলত সি এস আই আর-এর ডিস্টিংগুয়িশড ভিজিটিং সাইন্টিস্ট হওয়ার সুবাদে ব্রিটিশ কাউন্সিল একটি অ্যাকাডেমিক লিঙ্ক ইন্টারচেঞ্জ স্কিমের আওতায় সি রি, পিলানী এবং ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির মধ্যে মূলীভূত পার্টনারশিপের সাথে আমাকে তৃতীয় পার্টনার রূপে গ্রহণ করেছিল। আমার লন্ডন, ল্যাঙ্কাস্টার

এবং এডিনবরা ভিজিটের এর বিস্তৃত বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি।

এই অধ্যায়ে আমি আমার ইংল্যান্ড যাত্রার আর কিছু যোগ না করে চলে যাই আমার দ্বিতীয় বিদেশ যাত্রার কাহিনীতে। এই যাত্রায় প্রফেসার গান-সিকে পার্কের আমন্ত্রণে আমি সাউথ কোরিয়ার (রিপাব্লিক অফ কোরিয়া) সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এস এন ইউ) গিয়েছিলাম। এই 'দ্বিতীয়' বিদেশ যাত্রা ছিল আমার 'প্রথম' এস এন ইউ যাত্রা। এরপর থেকে আমি প্রফেসার গান-সিক পার্কের আমন্ত্রণে প্রায়ই টিচিং এবং রিসার্চের কাজে সিওল এস এন ইউ গিয়ে থাকি। লক ডাউনের আগে ২০১৯ সালে গান-সিক পার্কের আমন্ত্রণে মণিকুন্তলার সাথে আমি সাউথ কোরিয়ার সিওল এবং বুসান গিয়েছিলাম। এই বইয়ের দু'টি অধ্যায়ে আমার সিওলে অবস্থিত এস এন ইউ-র অভিজ্ঞতার কিছু কথা আগেই লিখেছি। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি লিখেছিলাম যে সিওলে আমরা, বিভিন্ন দেশের সাথীরা (রাশিয়ার এ ভি সুকভ, চায়নার বি এফ জিয়া, ইন্ডিয়ার আমি এবং আমাদের কোরিয়ান ক্যাব ড্রাইভার), অলিম্পিক স্টেডিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরেক জায়গায় লিখেছিলাম কি ভাবে আমি সিওল ইউনিভার্সিটির বাস ধরার লাইনে বাস এসে গেলে বাসে ওঠার সময়, আমার সাহায্যের জন্য, বাসের লাইনে একটি ছেলের হাত ওর গার্লফ্রেন্ডের হাত থেকে ছাড়িয়ে আমি পাকড়াও করেছিলাম। আবার সপ্তম অধ্যায়ে আমি লিখেছিলাম যে এস এন ইউ-তে সাইন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কোন শিক্ষকের ইন্ডাস্ট্রি থাকা বা ইন্ডাস্ট্রির কনসাল্টেন্ট হওয়াকে প্রশংসনীয় যোগ্যতা বলে মনে করা হ'ত কারণ এই যোগ্যতা ইউনিভার্সিটির পঠন-পাঠনের বিষয়বস্তু থেকে দেশের শিল্পায়নের আসল প্রয়োজনীয়তার ব্যবধানকে কমাতে সাহায্য করে।

মনে আছে আমার প্রথম এস এন ইউ যাত্রায় ইঞ্চিওন এয়ারপোর্ট থেকে এস এন ইউ-র হোয়াম ফ্যাকাল্টি-হাউসে আমাকে নিয়ে এল প্রফেসার গান-সিক পার্কের ছাত্র রিসার্চ স্কলার এস এস জাং। আসার পথে জাং আমাকে বলল জার্নালে প্রকাশিত আমাদের কাজের ভিত্তিতে ও ওর পি এইচ ডি-র কাজ করছে। ফ্যাকাল্টি-হাউসে আমার থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। কর্তৃপক্ষ খেয়াল রাখত যে আমার রুমের ফ্রিজ সব সময় ফল,

ড্রিংক ইত্যাদি দিয়ে ভরা আছে। হাউস সংলগ্ন সুন্দর রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট আর ডিনার করতাম। প্রফেসার পার্কের দেওয়া কার্ড দিয়ে রেস্টুরেন্টের পেমেন্ট করতাম। মাঝে মাঝে এই রেস্টুরেন্টে প্রফেসার পার্ক আমার সাথে ডিনারে জয়েন করতেন। কোরিয়ান ভাষা 'গামসাহাবনিদা' (ধন্যবাদ) ছাড়া কিছুই জানতাম না। ইংরাজি-জানা এক সুন্দরী ওয়েটার আয়ে-চা, রেস্টুরেন্টে থাকলে, আমার মেন্যু ঠিক করে দিত। মণিকুন্তলার ফটোকে ঢাল করে উইক-এন্ডে আয়ে-চা-র ডেটিং প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। প্রফেসার পার্ক আয়ে-চাকে দেখতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হয় নি কারণ ঐ রেস্টুরেন্টে আমার সাথে প্রফেসার পার্কের ডিনারের সময় কোন না কোন কারণে আয়ে-চা অনুপস্থিত ছিল। লকডাউনের আগে (২০১৯ সালে) যখন মণিকুন্তলার সাথে হোয়াম ফ্যাকাল্টি-হাউসে ছিলাম, তখন মণিকুন্তলার সাথে আয়ে-চা-র আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আর দেখা হল না—পথ চলার রাস্তায় আয়ে-চা রয়ে গেল শুধু স্মৃতি হয়ে আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুহূর্তগুলোর মধ্যে।

প্রফেসার পার্কের সাথে দশবারো জন রিসার্চ স্কলার কাজ করত। তখনকার মতন ইউনিভার্সিটির একটি বিল্ডিং-এর বেসমেন্টে প্রফেসার পার্ক ওর ল্যাব বানিয়েছিলেন। রিসার্চ-স্কলাররা ল্যাবের জন্য শহরের ফ্ল্যাটবাড়ীর ফেলে দেওয়া চেয়ার টেবিল নিয়ে এসেছিল। রিসার্চ-স্কলারদের অনুরোধে আমি 'ট্র্যাভেলিং-ওয়েভ ট্যুব'-এর উপর কয়েকটা লেকচার দিলাম। আমার লেকচার সিরিসের শেষে ওরা আমাকে টাকায় ভরা একটা খাম প্রেসেন্ট করল। ওরা বলল লেকচারের জন্য গুরু দক্ষিণার ফাণ্ড ওদের রিসার্চ প্রজেক্টে বরাদ্দ থাকে এবং ওরাই ওদের রিসার্চ ফাণ্ড কন্ট্রোল করে।

কোরিয়ান (ভাষা) না জানার জন্য আমার জীবনে ঘটা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার একটা ভারী মজার গল্প প্রায়ই আমি সবাইকে বলে থাকি। ছোট্ট গল্পটি জন্ম নিল হোয়ামের গেস্টহাউসে থাকাকালীন একদিন আমার মর্নিং-ওয়াকের সময়। সেদিন আমি রিষ্টওয়াচ পরতে ভুলে গিয়েছিলাম। রাস্তায় দেখা এক কোরিয়ান বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলাম—ক'টা বাজে? তিনি ইংরাজি জানতেন না, কিছুই বুঝতে পারলেন না। তখন ওনার রিষ্টওয়াচে আঙুল ঠেকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম—ক'টা বাজে? আমার

ছোট্ট গল্পটির শেষ ওখানেই হল যখন উনি ওনার রিষ্ট থেকে রিষ্টওয়াচটি খুলে আমাকে দিতে চাইলেন।

আমার সম্মানে প্রফেসার পার্কের রিসার্চ-স্কলাররা সারা-রাত্রি-ব্যাপী একটি পার্টির আয়োজন করল। প্রফেসার পার্ক ছাড়া এই পার্টিতে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট ডঃ এ ভি সুকভ এবং ডঃ বি জিয়া নিমন্ত্রিত ছিলেন। পার্টি ছিল তিন পর্য্যায়ে তিনটি জায়গায়। প্রথম পর্য্যায়ে ড্রিংক পার্টি, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ড্যান্স পার্টি, এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে ডিনার পার্টি। প্রফেসার পার্ক ড্রিংক পার্টিতে আমাকে ওর রিসার্চ-স্কলারদের ড্রিংক সার্ভ করতে বললেন। এই ভাবে প্রথা অনুযায়ী ওরা না কি জানবে যে আমি তাদের গ্রহণ করেছি। সারা রাত্রি ধরে এই অনুষ্ঠানে থাকলে আমার শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় ডঃ সুকভ সবার অনুমতিতে আমাকে নিয়ে গেস্টহাউসে ফিরে এলেন।

আমার এস এন ইউ-র প্রথম ভিজিট থেকে ফেরার সময় প্রফেসার পার্ককে জিজ্ঞেস করলাম এত লোক থাকতে তিনি আমাকেই বা কেন তার ল্যাবে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রফেসার পার্ক আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং আমার সামনে একটা প্রশ্ন রাখলেন—আমি ইউ এস এ-র মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি এবং নেভাল রিসার্চ ল্যাব থেকে সাউথ কোরিয়া ফিরে এসেছি। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম যে জাপানকে বাদ দিলে ইন্ডিয়াতে আপনি মাইক্রোওয়েভ ট্যুব বিষয়ে এসিয়াতে কাজ করছেন। আপনি আমার মাইক্রোওয়েভ ট্যুব বিষয়ে কাজ করার ল্যাব এবং কর্মপদ্ধতি দেখলেন। ইউ এস এ থেকে আমি অনেক অফার পেয়েছি। আমি কি ইউ এস এ না ফিরে গিয়ে আমাদের দেশ সাউথ কোরিয়াতেই এই ভাবে কাজ চালিয়ে যাব? এবার আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি অনুগ্রহ করে 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দিন যার উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

প্রফেসার পার্ককে আমার উত্তর আমি 'হ্যাঁ' দিয়ে দিলাম। প্রফেসার পার্ক সাউথ কোরিয়াতেই থেকে গেলেন এবং তাঁর কাজের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন। আমি এস এন ইউ এবং সি রি, পিলানীর মধ্যে সহযোগিতমূলক রিসার্চ করার জন্য মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিন্গ প্রস্তুত করায় মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলাম। এস এন ইউ ভিজিট করা আমার নিত্তনৈমিত্তিক হয়ে গেল। সি রি, পিলানী থেকে অনেককে এস এন ইউ-তে প্রফেসার পার্কের

কাছে পাঠালাম। তার মধ্যে অশোক (সিনহা) প্রফেসার পার্কের সাথে কাজ করে অনেক সুনাম অর্জন করল। আমার রেকোমেন্ডেশনে অনির্বাণ (বেরা) এবং রঞ্জন (বারিক) প্রফেসার পার্কের সুপারভিশনে পি এইচ ডি করল। অশোকের সেবানিবৃতির পর অনির্বাণ এখন অশোক প্রতিষ্ঠিত সি রি, পিলানীর জাইরোট্রন ল্যাবের হেড। আর আমি গর্বিত যে রঞ্জন দ্বারা বিকশিত প্রথম ইন্ডিয়ান 'আয়ন থ্রাস্টার' ইসরো ব্যবহার করছে।

আমি সিওলে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখেছিলাম, যেমন ন্যাশনাল ম্যুজিয়াম, সিওল টাওয়ার, চিড়িয়াখানা, ওয়ার মেমোরিয়াল, অলিম্পিক স্টেডিয়াম, বুদ্ধ মন্দির, গিয়েংবগাং রাজ প্রাসাদ, হ্যানক ভিলেজ, লোটে ওয়ার্ল্ড, ইত্যাদি। সাথে ছিল কোন না কোন সময়ে, সুকভ, জিয়া, অনির্বাণ, রঞ্জন, জয়া (বৌমা, রঞ্জনের স্ত্রী), মণিকুন্তলা, দেবাশীষ (মাঝি), রাজনন্দিনী (বৌমা, দেবাশীষের স্ত্রী), এবং অমিতাভ রায় চৌধুরী (সি রি, পিলানীর সায়েন্টিস্ট, যখন ওর প্রথম বিদেশযাত্রায় আমার সাথে সিওল গিয়েছিল)। কোন এক জায়গায় অনির্বাণের পার্স হারিয়ে গিয়েছিল। পার্সের ভিতর ওর টাকাপয়সা ছাড়া আই কার্ড, এ টি এম কার্ড, ইত্যাদি ছিল। বাড়ী ফিরে দরজার হুকে ঝোলানো অক্ষত অবস্থায় অনির্বাণ ওর হারানো পার্স পেয়ে গেল। একটি অ্যাম্যুসমেন্ট পার্কে দুষ্কর এক রোলার-কোস্টার-রাইডের পর সহযাত্রী যুবক-যুবতীরা আমার কাছে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাল। বেশী বয়সের ব্যবধান কাটিয়ে আমি যে এই কঠিন রাইড সম্পন্ন করেছি তার জন্য আমার নার্ভের প্রশংসা করল। আমার সেই অ্যাডভেন্চারে অমিতাভ আমার সাথে ছিল। আমাকে তখন এই অ্যাডভেন্চার থেকে বিরত করতে পারেনি বলে এখনও অমিতাভ অনুশোচনা করে।

সিওলে থাকাকালীন একবার অমিতাভর সারা গায়ে দানা দানা র‍্যাশ দেখা গেল। চিংড়ী মাছেতে যে অমিতাভর অ্যালার্জি আছে তা অমিতাভ বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। একাদশ অধ্যায়ে লিখেছিলাম কি ভাবে ল্যাঙ্কাস্টারে একজনকে অ্যান্টি-এলার্জি (অ্যাভিল) ওষুধ দিয়ে ভাল করে দিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন নিরামিষাশী এবং তার এলার্জি হয়েছিল এই শুনেই যে তিনি ভুল করে টুনা মাছ খেয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এযাত্রায় সিওলে আমি অ্যাভিল ট্যাবলেট আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। খবর পেলাম জনৈকা ভদ্রমহিলা, যিনি

আমাদের সাথে বি কে রেসিডেন্স হলে থাকতেন, খুব শীঘ্রই ইন্ডিয়াতে ফিরে যাচ্ছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কাছে অ্যাভিল ট্যাবলেট ছিল এবং তিনি সানন্দে অনেকগুলি ট্যাবলেট অমিতাভকে দিলেন। অমিতাভ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল।

বি কে রেসিডেন্স হলে আমার আর অমিতাভর আলাদা রুম ছিল। তবে রেসিডেন্স হলে একসাথে আমরা খাওয়া দাওয়া করতাম। রান্না করার ব্যাপারটা অমিতাভ দেখত। বারে বারে খাবারে ছোলা সেদ্ধ খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে অমিতাভকে বললাম—আমরা কি ঘোড়া যে খালি ছোলা খাচ্ছি। দাঁড়াও তোমাকে আমি নেমন্তন্ন শিকার করে দেখাচ্ছি। আমার প্রথম শিকারে ধরা পড়ল সবিতা (কল্পিত নাম)—বাংলাদেশী একটি মেয়ে। সবিতার দু'বছরের ছেলে টুকুন (কল্পিত নাম) কান্নাকাটি করছিল ওর মায়ের বকাবকি শুনে। নেমন্তন্ন শিকারের প্রথম ধাপে, ছেলেকে কাঁদানোর জন্য সবিতাকে বকাবকি করে ওর সাথে আমার প্রথম পরিচয় সেরে ফেললাম। টুকুনের বাবা শক্তিপদ (কল্পিত নাম) এস এন ইউ-র বোটানি ডিপার্টমেন্টের পোষ্ট-ডক্টোরাল ফেলো। সবিতা এবং শক্তিপদ প্রায় একই সময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পি এইচ ডি করে এবং সেখানে তারা একই ব্যাচে এম এস সি-তে যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। নেমন্তন্ন শিকারের দ্বিতীয় ধাপে, শক্তিপদর চেয়ে ভাল স্টুডেন্ট হয়েও সবিতা শুধু ঘর সংসার সামলাচ্ছে এবং বেবী-সিটিং করছে অথচ শক্তিপদ পোষ্ট-ডক্টোরাল রিসার্চ করছে এই মর্মে সবিতাকে সমবেদনা জানিয়ে শিকারকে তীরবিদ্ধ করে এক ছুটির দিন আমার ও অমিতাভর জন্য অপূর্ব বাংলাদেশীয় 'বাঙাল' ডিনারের নেমন্তন্ন আদায় করলাম।

এস এন ইউ-তে গেলে প্রফেসার পার্ক আমাকে অন্তত একবার ডিনারে সিওলের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট 'গঙ্গা' নিয়ে যেতেন। রেস্টুরেন্টের মালিক বাঙালি; তিনি আমাকে বলেছিলেন কি ভাবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রেশ্বর থেকে এসে সিওলে বসবাস শুরু করেছিলেন। একবার শ্রী আর কে গুপ্ত (সি রি, পিলানীর সায়েন্টিস্ট), যিনি আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, প্রফেসার পার্ক এবং আমার সাথে 'গঙ্গা' রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না শ্রদ্ধেয় প্রফেসার বসু (বাসু স্যার) 'গঙ্গা' রেস্টুরেন্টে

প্রফেসারের সাথে আয়েশ করে কিম্ভূতকিমাকার এক পোকা খাচ্ছেন। পোকাটির নাম 'গলদা চিংড়ী'।

সিওলে 'গঙ্গা' রেস্টুরেন্টে ডিনারের কথা লিখতে লিখতে মনে পড়ে গেল সিওলে আমার এক চাইনিজ পরিবারের সাথে লাঞ্চের কথা। পরিবারটি এস এন ইউ-তে চাইনিজ ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট বি এফ জিয়ার সাথে পরিচিত ছিল। ঐ লাঞ্চে আমি আর জিয়া ছাড়া ওনাদের অন্যান্য চাইনিজ বন্ধুরাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমি-ই একমাত্র নন-চাইনিজ উপস্থিত ছিলাম। সেখানে সবাই মেঝেতে বসে খাওয়া দাওয়ার সাথে অ্যালকোহলিক ড্রিংক 'বাইজিউ' নিচ্ছিলেন। স্পষ্টতই শুভাকাঙ্ক্ষী জিয়া আমাকে এক-দু'চামচের বেশি বাইজিউ নিতে দিলেন না। নাচ-গানের অনুষ্ঠানে জিয়া আমাকে অবাক করে দিলেন বৈজয়ন্তি মালার সিনেমার নৃত্য পরিবেশন করে। আমাকে একটা গান গাইতে বলা হল। আমি গান গাইতে জানি না বলাতে জিয়া আমাকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গাইতে বলল। গানটি আমি বসে বসে গাইছিলাম বলে জিয়া আমাকে হাত ধরে তুলে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভারত-চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে উপস্থিত সবাই স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিলেন।

আমি একবার যখন এস এন ইউ গেলাম তখন ওখানে ক্যাম্পাস ইনটারভিউ চলছিল। একটি মাঠে তাঁবু খাটিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি ইউনিভার্সিটি প্রবেশাকাঙ্ক্ষী ছাত্রছাত্রীদের অ্যাডমিশন নেওয়ার আগেই জব অফার করছিল। শর্ত ছিল সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নির্ধারিত বিষয়গুলি সিলেক্টেড ছাত্রছাত্রীদের ওদের পাঠ্যক্রমে নিতে হবে। আরেকবার সিওল গিয়ে দেখলাম এস এন ইউ ক্যাম্পাসে উৎসবের পরিবেশ—মাঠে ঘাটে, চারিদিকে মাইক লাগিয়ে গানবাজনা চলছে। জানতে পারলাম সাউথ কোরিয়ার সরকারী নির্দেশে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুশাসনহীনতা (ইনডিসিপ্লিন) সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। দেরীতে হলেও ওখানকার সরকার না কি বুঝতে পেরেছে টেকনলজিতে অগ্রসর হলেও ওদের দেশ থেকে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার হচ্ছে না—কেউ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে না। এর কারণ না কি ওদের চিন্তাধারায় অতিরিক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধতা।

কার্লস্রুহে ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজির (কে আই টি) ডাইরেক্টার

প্রফেসার ম্যানফ্রেড থুম আমাকে এবং আমার সহচারী (অ্যাকোম্পেনিং) মণিকুন্তলাকে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানির কার্লস্রুহেতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। সেই সময় সি রি পিলানীর সায়েন্টিস্ট অমিতাভ (রায় চৌধুরী) জার্মান অ্যাকাডেমিক এক্সচেঞ্জ সার্ভিস (DAAD) প্রোগ্রামে আমার রেকমেন্ডেশনে ম্যানফ্রেডের সুপারভিশনে কে আই টি-তে ওর পি এইচ ডি-র কাজ করছিল। অবশ্য আমরা যখন কার্লস্রুহে গেলাম তখন ম্যানফ্রেড নয়, কে আই টি-র ডাইরেক্টারের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসার জন জেলোনেক।

আমাদের থাকা-খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা একটি ভারী সুন্দর হোটেলে করা হল। অমিতাভ ওর স্ত্রী তনামীর সাথে শহরতলি ব্লাঙ্কেনলকে থাকত। আমি আর অমিতাভ যখন কে আই টি যেতাম, আমাদের হোটেলে তনামী মণিকুন্তলার কাছে চলে আসত। মণিকুন্তলাকে নিয়ে কার্লস্রুহে বেড়াতে যেত। তবে ব্লাঙ্কেনলক থেকে আমাদের হোটেলে মণিকুন্তলার কাছে আসতে তনামীর অনেক সময় লেগে যেত। তাই প্রফেসার থুম এবং প্রফেসার জেলোনেকের সাথে কথা বলে আমরা হোটেল থেকে অমিতাভ-তনামীর বাড়ী ব্লাঙ্কেনলক শিফ্ট করলাম। ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলে হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য ইউনিভার্সিটির থাকা-খাওয়াদাওয়ার বরাদ্দ ফাণ্ড অমিতাভর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্র্যাসফার করে দিলেন।

কে আই টি-তে একটি নির্ধারিত মীটিং-এ অমিতাভ, প্রফেসার থুম, প্রফেসার জেলোনেক এবং আমি সবাই মিলে অমিতাভর পি এইচ ডি থিসিসের সব চ্যাপ্টার ঠিক করলাম এবং সেই সংগে অমিতাভর থিসিসের বাকী রয়ে যাওয়া আরও কিছুটা কাজ চিহ্নিত করলাম। ইতিমধ্যে দেখতে পেলাম কে আই টি-র ক্যাম্পাসে চারিদিকে আমার দু'টো লেক্চারের পোস্টার। এই লেক্চার দু'টো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাসের চারশ'একুশ নাম্বার বিল্ডিং-এর ৪১৩ নাম্বার লেক্চার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মানির অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও লেক্চারের অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছিল। প্রথম লেক্চারটি পনেরোই নভেম্বর ২০১১ তারিখে সকাল সওয়া ন'টায় এবং দ্বিতীয় লেক্চারটি সতেরোই নভেম্বর ২০১১ তারিখে সকাল পোনে ন'টায় হয়েছিল। ওখানে নিয়ম ছিল লেক্চার ঠিক শুরু হলে কেউ লেক্চার রুমে ঢুকতে পারবেনা যদিও লেক্চার রুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। মনে

আছে লেক্চারের শেষে যারা দেরী করে এসেছিলেন এবং আমার লেক্চার শুনতে পান নি তাদের অনেককে আমি লেক্চারের পাওয়ার-পয়েন্ট 'শেয়ার' করেছিলাম। অমিতাভ বা তনামীর সাথে কার্লস্রুহে দ্রষ্টব্য যেমন কার্লস্রুহে প্যালেস, মার্কেট স্কোয়ার, মিউজিয়াম, ইত্যাদি এবং পরম আরাধ্য জেম্স ক্লার্ক মাক্সওয়েলের অনবদ্য মূর্তি আমার স্মৃতিপটে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

আমরা কার্লস্রুহে থাকাকালীন কবিগুরুর জন্মসার্ধশতাব্দী (১৫০তম (সার্ধশতবর্ষ)) উপলক্ষ্যে ইন্দো-জারমান অরগানাইজেশন দ্বারা 'জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠান-স্থান ছিল কাইসেরাল্লী, কার্লস্রুহেতে অবস্থিত কম্যুনিটি কলেজে। সেই সময়ে আমরা অমিতাভ-তনামীর কার্লস্রুহের ব্লাঙ্কেনলকের বাড়ীতে থাকতাম। আঠেরোই নভেম্বর, ২০১০ তারিখে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে কবিগুরুর ভক্তরা জার্মানির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে হাইডেলবার্গ থেকে এসে প্রফেসার অলক রঞ্জন দাসগুপ্ত তাঁর জার্মান ভাষায় লেখা 'আমার টেগোর' শীর্ষক বইয়ের কিছু অংশ পড়ে শোনালেন যেখানে ১৯২৬ সালে জার্মানিতে থাকাকালীন কবিগুরুর গান রচনার উল্লেখ ছিল। প্রফেসার দাসগুপ্ত কবিগুরুর দশটি গানের তাঁর জার্মান ভাষায় অনুদিত 'লিরিক' পড়ে শোনালেন এবং বিদুষী ডঃ তনামী রায়—সি রি, পিলানীর প্রতিভাবান সায়েন্টিস্ট, প্রফেসার ম্যানফ্রেড থুমের তদানীন্তন ডক্টরাল স্টুডেন্ট অমিতাভ-র গুণবতী স্ত্রী—সেই গানগুলি গেয়ে দর্শকমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করল। অমিতাভ-তনামীর ব্লাঙ্কেনলকের বাড়ীতে মণিকুন্তলার জানা এই গানগুলি মণিকুন্তলার উপস্থিতিতে আমাদের কন্যাসম তনামী 'রিহার্স' করত।

এই গানগুলি—যার প্রথম দু'টি এদেশ শান্তিনিকেতনে, লেখা আর বাকী আটটি ওই দেশ জার্মানিতে, লেখা—এসো শ্যামল সুন্দর (শান্তিনিকেতন); দুঃখ যদি না পাবে তো (শান্তিনিকেতন); রয় যে কাঙাল শুন্য হাতে (হামববুর্গ); কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় (হামববুর্গ); ছুটির বাঁশি বাজলো (ম্যুনিক); আমার মুক্তি আলোয় আলোয় (নিউরেমবার্গ); মধুর তোমার শেষ যে না পাই (স্টুটগার্ট); চাহিয়া দ্যাখ রসের স্রোতে (কোল্ন); গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে (ডাসেলড্রফ); এবং নাই নাই ভয় হবে হবে জয় (ম্যুনিক)। অনুষ্ঠানের শেষ পর্য্যায়ে প্রশ্নোত্তর-সেশন অনুষ্ঠানের মর্য্যাদাকে অত্যন্ত উঁচু

স্তরে নিয়ে গেল। অনুষ্ঠানান্তে অত্যুৎসাহী জার্মান দর্শকেরা তনামীর বাজানো ভারতীয় হারমোনিয়ামটির কাছে এসে ওদের-কাছে-নতুন বাদ্যযন্ত্রটি সম্বন্ধে অনেক তথ্য তনামীর কাছ থেকে জেনে নিল। প্রফেসার অলক রঞ্জন দাসগুপ্তর আশীর্বাদে আমাদের বিদুষী কন্যা তনামীর এহেন সাফল্যে আমাদের মন গর্বে ভরে গেল।

ইউনিভার্সিটি অফ ইলেকট্রনিক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি অফ চায়না (ইউ ই এস টি সি), চেংদু, চায়নার প্রফেসার ঝাওয়্যুন দুয়ানের সাথে আমার পরিচয় ২০০৫ সাল থেকে, যখন আমি বি এইচ ইউ, বেনারস থেকে সেবানিবৃতির পর উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি (সি ই টি)-তে কর্মরত। তবে পরিচয়টা ছিল শুধু ইমেলের মাধ্যমে যখন প্রফেসার দুয়ানকে ওর অনুরোধে আমাদের প্রকাশিত একটি পেপারের কিছু অংশ বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। আমার কাজটা বোঝার পর অত্যন্ত তৎপরতার সাথে কাজ করে ২০০৬ সালে প্রফেসার দুয়ান আমার সহলেখনীতে আই ট্রিপ্ল-ই ট্র্যান্সেক্সন অন ইলেকট্রন ডিভাইসেস জার্নালে একটা পেপার প্রকাশিত করেন। প্রফেসার দুয়ানের সাথে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে পাঁচ বছর পরে ২০১১ সালে ব্যাঙ্গালোরে এক কনফারেন্সে।

এরপর প্রফেসার দুয়ানের উদ্যোগে ২০১৮ সালে আমি ইউ ই এস টি সি, চেংদু, সিচুয়ান, চায়নার স্কুল অফ ফিজিক্যাল ইলেকট্রনিক্স থেকে আমন্ত্রণ পাই ওখানকার রিসার্চস্কলারদের মাইক্রোওয়েভ ট্যুব বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আমার সাথে চেংদু যাওয়ার জন্য ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ মণিকুন্তলাকেও চেংদুর সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কার্যক্রমে আমন্ত্রণ জানালো। আমরা চায়না সাদার্ন এয়ারলাইনস-এর ফ্লাইটে ষোলোই জুন গুয়ানঝাউ বাইয়ুন হয়ে চেংদু গেলাম। আমরা ফিরে এসেছিলাম পয়লা জুলাই। বলাবাহুল্য, এই যাতায়াতে কয়েকদিন পঙ্কজের (দালেলা) দিল্লীর আনন্দবিহার সংলগ্ন বসুন্ধরার বাড়ীতে থেকেছিলাম।

প্রফেসার দুয়ানের ছাত্র ফাই ওয়াং আমাদের চেংদু এয়ারপোর্ট থেকে নর্থ জিয়ানশে রোডে অবস্থিত ইউ ই এস টি সি হোটেলে নিয়ে এল। এরপর প্রফেসার দুয়ানের আরেক ছাত্র ঝিং ওয়াং আমাদের দায়িত্ব নিল। ঝিং ওয়াং-এর সাথে আমরা চেংদুর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি যেমন ম্যুজিয়াম, বুদ্ধ-মন্দির

(ওয়েনশু ইউয়ান মনাস্টেরি), মার্কেটপ্লেস, ইত্যাদি গিয়েছিলাম। প্রফেসার দুয়ানের সাথে আমরা পাণ্ডা বেস এবং সিচুয়ান অপেরা ডিনারে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের পর অপেরার শিল্পীরা আমরা ইন্ডিয়ান বলে আমাদের সাথে আলাপ করে গেলেন।

ডঃ বি এফ জিয়া, যার সাথে সিওলে আমি অনেক মুহূর্ত কাটিয়েছি এবং যার কথা আগেই এই অধ্যায়ে আমি লিখেছি, চেংদুতে ওনার স্ত্রীর সাথে চেংদু থেকে অনেক দূর থেকে আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। প্রফেসার রূপে ডঃ জিয়ার সেবানিবৃতি ইউ ই এস টি সি থেকে হয়েছিল এবং তিনি প্রফেসার দুয়ানের সাথে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। প্রফেসার জিয়ার আমন্ত্রণে আমরা একটি রেস্টুরেন্টে মিলিত হলাম। আমাদের রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে প্রফেসার দুয়ান ওনার নিজস্ব মোটরগাড়ী নিয়ে ওনার ছাত্র ফাই ওয়াং-এর সাথে আমাদের হোটেলে এলেন। আমাদের সাথে তাইওয়ান থেকে আগত প্রফেসার চিং ওয়েন স্যু ছিলেন। গাড়ীতে জায়গা না হওয়াতে ফাই ওয়াং প্রফেসার দুয়ানের গাড়ী চালিয়ে আমাদের রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। প্রফেসার দুয়ান একটা ভাড়া করা সাইকেলে আমাদের চেয়ে আগেই রেস্টুরেন্টে পৌঁছে গেলেন।

চেংদুর বিভিন্ন জায়গায় ঝিং ওয়াং-এর সাথে ট্যাক্সি করে বেড়াতাম। ট্যাক্সিভাড়ার টাকা (ইয়ান) প্রথমে ঝিং ওয়াং ওর এটিএম কার্ড থেকে দিয়ে দিত এবং এমন ব্যবস্থা ছিল যে সঙ্গেসঙ্গেই ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে ওর অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ও ফেরত পেয়ে যেত। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা হাঁটুর সমস্যার কথা আমি প্রফেসার দুয়ানকে জানিয়েছিলাম। সে কথা জেনে ঝিং ওয়াং ভক্তিভরে আমার পা ধরে আমাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিত। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিশ্বাসী প্রফেসার দুয়ান আমাকে এতই সমীহ করত যে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে আমার কথা শুনত।

একদিন এক জায়গা থেকে হোটেলে ফেরার সময় আমরা মেট্রোরেল চড়তে চাইলাম। ঝিং ওয়াং জানাল যে যেখানে আধ ঘণ্টায় ট্যাক্সি করে হোটেলে ফেরা যায় সেখানে মেট্রোরেলে লাইন চেঞ্জ করে ফিরতে প্রায় দু'ঘণ্টা লেগে যাবে। তার উপর সেখানে লোকজনের ভিড় থাকবে। তা সত্ত্বেও আমরা চেংদুর মেট্রোরেলের অভিজ্ঞতা পেতে চাইলাম। প্রফেসার

দুয়ানের কাছ থেকে ঝিং ওয়াং অনুমতি নিয়ে নিল। লোকেলোকারন্য মেট্রোরেলের কামরায় ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে সবাই 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান' বলে নিজ নিজ সীট ছেড়ে আমাদের বসানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। এ বলে 'আমার সীটে বস' ও বলে 'আমার সীটে বস'।

ইউ ই এস টি সি হোটেলের ডাইনিং হলে এলাহি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের খাওয়ার মেন্যু ঠিক করার জন্য দু'তিন জন ওয়েটার এবং দরকার হলে কুক নিজে এসে আমাদের পছন্দের কথা জেনে যেত। আমাদের বিশেষ করে মণিকুন্তলার হোটেলের চাইনীজ খাবার খুব পছন্দ ছিল।

এবার আসি আমার ক্লাসে পড়ানোর কথায়। আমি আমার এক-ঘণ্টার চল্লিশটা ক্লাস-লেকচারের প্ল্যান করেছিলাম। আমি পাওয়ার-পয়েন্টে আমার লেকচার দিতাম। অবশ্যই ঝিং ওয়াং আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করত। প্রয়োজনে ব্ল্যাকবোর্ডে গেলে আমার হাঁটুর সমস্যার কথা মনে রেখে ঝিং ওয়াং বা অন্য কেউ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে সতর্ক থাকত। ছয়-সাত টা ক্লাস নেওয়ার পর আমার ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলাম—তোমরা কি আমার পড়া বুঝতে পারছো? প্রায় সবার উত্তর পেলাম—নো ইংলিশ। ঝিং ওয়াং আমাকে বলল যে ওরা আদৌ ইংরাজি জানে না এবং ওরা এমন কি আমার ইংরাজিতে বলা প্রশ্নটাই বুঝতে পারছে না। কিন্তু আমি তো দেখতাম ওরা প্রতিদিন খুব মন দিয়ে আমার ক্লাস করছে। এবার ওরা আমার ক্লাস বুঝছে কি বুঝছে কিনা জানার জন্য আমার পড়ানো ক্লাস গুলির বিষয় বস্তুর উপর ক্লাস-ওয়ার্ক হিসেবে ওদের একটা ন্যুমেরিক্যাল প্রব্লেম দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাসে অনেকেরই হাত উঠল। ওদের উত্তর আমার উত্তরের সাথে মিলে গেল। ওরা চাইনিজ মিডিয়ামে পড়ে কিন্তু গ্রীক সিম্বল ব্যবহার করে এবং সেই মতন ওদের মধ্যে একজন এসে ব্ল্যাকবোর্ডে প্রব্লেমের সল্যুশনটা করে দেখাল। আমি আশ্বস্ত হলাম যে আমার পড়ানো বিফলে যাচ্ছে না।

দেশে ফেরার সময় চেংদু এয়ারপোর্টে ঝিং ওয়াং আমাদের বোর্ডিং পাস এনে দিল। আমাদের সিক্যুরিটি জোনে যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় জানাবার সময় ঝিং ওয়াং ওর কান্না রোধ করতে পারলনা। এর এক বছর পর সাউথ কোরিয়ার বুসান শহরে একটি কনফারেন্সে প্রফেসার দুয়ান, ঝিং ওয়াং এবং

প্রফেসার দুয়ানের আরেক ছাত্র শিফেং লি-র সাথে আমার আর মণিকুন্তলার সাথে দেখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ঝিং ওয়াং, ফাই ওয়াং এবং শিফেং লি ওদের পি এইচ ডিগ্রী পেয়ে গেছে। লক ডাউনের সময়কে ধরে, গত তিন বছরে, প্রফেসার দুয়ান, ওর ছাত্রদের, এবং কয়েকজন ইন্ডিয়ান ও অ্যামেরিকান সহযোগীদের নিয়ে একটি বুক চ্যাপ্টার এবং ছ'টি জার্নাল পেপার লেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

জিনি আমাদের পরিবারের অনেকটা জুড়ে আছে। জিনি ছিল ড্যাশহুণ্ড এক সারমেয় কন্যা। হাল্কা খয়েরি এবং সোনালি মেশানো ছিল ওর গায়ের রঙ। জগদীশ্বরের বাবা ওকে আমাদের বি এইচ ইউ-র নিউ মেডিক্যাল এনক্লেভের কোয়ার্টারে নিয়ে এসেছিলেন। সাথে ছিল একটা নোটবুক যেখানে লেখা ছিল ওর ইংল্যান্ডের পূর্বপুরুষদের নাম ও ঠিকানা। জিনি আমাদের অনেক কথাবার্তা বুঝতে পারত। মণিকুন্তলার কাছে কোন খাবার খেতে চাইলে মণিকুন্তলা জিনিকে বলত—যাও, বাবাকে জিজ্ঞেস করে এস। এই শুনে জিনি আমার অর্থাৎ ওর বাবার কাছে আসত। আমার—হ্যাঁ দিয়ে দাও—শুনে আবার মণিকুন্তলার কাছে চলে যেত। জিনির খাটের বিছানায় মশারি টাঙানো থাকত। রাতে কোন কারণে খাট থেকে নেমে এলে ওর বিছানায় ফিরে যাওয়ার সময় ওর মশারিটা টাঙিয়ে টানিয়ে দেবার জন্য জিনি আমাদের ডেকে নিয়ে যেত।

জিনির পা ছোট আর শরীর লম্বা ছিল। হাঁটলে ওর শরীরটা জমিকে প্রায় ছুঁয়ে যেত। একদিন রাস্তা মেরামত করার এক কর্মী তার সহকর্মীকে বলল—দ্যাখ, স্যার একটা নেউলেকে চেনে বেঁধে বেরাতে বেরিয়েছেন। সহকর্মী বলল—এটা নেউলে নয়, এটা কুকুর। দু'জনের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। আমি সহকর্মীকে খুব বকা লাগালাম—একটা নেউলেকে তুমি কুকুর বলছ? জিনির অনেক প্রোটিনযুক্ত খাবার খেত, যা তখন বেনারসে পাওয়া যেত না, ব্যাঙ্গালোর থেকে আসত। কোন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী পাঠাত তা আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি।

আমি বেনারসের বাইরে গেলে জিনি আমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। কখনও আমাদের বাড়ী আসেনি এমন কোন ভাড়া করা গাড়ী আমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ীর চৌহদ্দিতে ঢুকলে আমাকে না দেখলেও

আমি-ই যে এসেছি বুঝতে পেরে জিনি লাফালাফি জুড়ে দিত। জিনি মণিকুন্তলাকে মা মনে করে চোখে হারাতে চাইত না। পঙ্কজের বিয়েতে মণিকুন্তলাকে নিয়ে কানপুর গিয়েছিলাম; মণিকুন্তলার অবর্তমানে জিনি দু'দিন না খেয়ে ছিল। আমার ছোট ছেলে প্রিয়নীলের বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রে আমাদের পরিবারের সদস্যদের নামের সাথে জিনি বসু রায় চৌধুরীর নামও ছিল।

অদ্যাবধি এই বইয়ে আমি আমার সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের আমাকে ভালবাসা আর শ্রদ্ধা করার কথাই লিখেছি। লিখেনি কি ভাবে বি এইচ ইউ-তে আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক প্রফেসার, যার সম্মানজনক ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য আমি-ই দায়ী—যেকথা লোকসমক্ষে তিনি নিজেই বলে থাকেন—বি এইচ ইউ-তে সেবানিবৃতির পর সাম্মানিক পদ এমেরিটাস প্রফেসারের জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার আবেদনপত্র ভাইস-চান্সেলারের কাছে ফরওয়ার্ড করতে দেননি। লিখিনি আমারই সুপারভিশনে কাজ করে সেই কাজের ভিত্তিতে বিদেশের এক প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটিতে পি এইচ ডি করার একটি প্রাক্তন ছাত্রর কথা। সাউথ কোরিয়ার বুসানের এক কনফারেন্সের ব্যাঙ্কুয়েট হলে এই ছাত্রটিকে দেখে মণিকুন্তলা আর আমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের দেখে দায়সারা গোছের একটা 'হ্যালো' উপহার দিয়ে পাশ কাটিয়ে ও চলে গেল আরও বড় গাছে নৌকা বাঁধতে।

বেনারস বি এইচ ইউ থেকে সেবানিবৃতির পর আমি উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি (সি ই টি) জয়েন করি। দিল্লী থেকে প্রায় একশ নব্বুই কিলোমিটার দূরে পশ্চিম উত্তর প্রদেশ 'ব্রাস-সিটি' (পিতল-শহর) মোরাদাবাদের হিন্দি এবং সংস্কৃতি পূর্ব উত্তর প্রদেশ বেনারস থেকে আলাদা। প্রতি মাসে দিন দশেকের জন্য আমি, কখন ও কখন মণিকুন্তলার সাথে, মোরাদাবাদ যেতাম। ইন্সটিট্যুট অফ ফরেন ট্রেড অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের (আই এফ টি এম) অধীনে সি ই টি-র ডাইরেক্টার ছিল আমার ভ্রাতুষ্পুত্রসম প্রফেসার অনুপম শ্রীবাস্তব। অনুপম বি এইচ ইউ থেকে সেবানিবৃত প্রফেসার এস কে শ্রীবাস্তবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আই এফ টি এম-এর ডাইরেক্টার ছিলেন প্রফেসার আর এম দুবে। আমাদের ঐকান্তিক

প্রচেষ্টায় আই এফ টি এম একটি ইউনিভার্সিটিতে উন্নিত হল। আই এফ টি এম ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার এবং প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার হলেন যথাক্রমে প্রফেসার আর এম দুবে এবং প্রফেসার অনুপম শ্রীবাস্তব। কিন্তু কি কারণে সুযোগ্য প্রফেসার অনুপম শ্রীবাস্তবকে আই এফ টি এম ইউনিভার্সিটি ছেড়ে যেতে হল এবং কি ভাবে ইউনিভার্সিটির উন্নতির গ্রাফ নীচের দিকে দ্রুত নামতে থাকল তা এই বইয়ের অল্প পরিসরে লেখা যাবে না। তবে বেনারস থেকে মোরাদাবাদ রেলগাড়িতে যাওয়ার সময় আমার জীবনে ঘটা একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল যা লিখে ফেলা যাক।

একবার বেনারস ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন থেকে মোরাদাবাদ যাওয়ার কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস ধরার জন্য আমার ভাড়া করা অটোরিক্সা জ্যামজটে আটকে পড়ল। আমি যখন রেল স্টেশন পৌঁছুলাম তখন ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। আমার পোর্টার বলল যে আমরা প্ল্যাটফর্ম পৌঁছুতে পৌঁছুতে ট্রেন ছেড়ে দেবে। প্ল্যাটফর্মের উপরের ব্রিজ থেকে দেখলাম ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আমি হাতের ইশারায় ট্রেনকে থামতে বললাম। আশ্চর্যের কথা আমার ঈশারায় সহৃদয় ট্রেনের গার্ড ট্রেন থামিয়ে দিলেন। ওনার কথা মতন ট্রেনের যে কামরায় আমার জন্য বার্থ সংরক্ষিত আছে সেখানে না গিয়ে গার্ডের পাশের কামরায় উঠে পড়লাম। অনেক কষ্টে আমি ভদোহি রেল স্টেশনে আমার জন্য নির্দিষ্ট ট্রেনের কামরায় পৌঁছুলাম। টি টি আই (ভ্রমণ টিকিট পরীক্ষক) সৌভাগ্যক্রমে আমার নামের সাথে পরিচিত ছিলেন। যে হেতু অনেকগুলি স্টেশন পার হয়ে যাবার পর আমি নির্ধারিত কামরায় উঠেছিলাম নিয়মানুযায়ী তিনি অন্য কাউকে আমার পূর্ব সংরক্ষিত বার্থটি দিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি।

এফ টি এম ইউনিভার্সিটির সাথে প্রায় চার বছর যুক্ত থাকার পর প্রফেসার বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের এস ও এস (সেভ আওয়ার সোল) পেয়ে ২০১১ সালের পয়লা আগস্ট থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগর সংলগ্ন মানকুণ্ডুর সুপ্রীম নলেজ ফাউন্ডেশন গ্রুপ অফ ইন্সটিট্যুশনে (এস কে এফ জি আই) প্রফেসার রূপে জয়েন করলাম। একই রিসার্চ মেন্টার প্রফেসার নির্মল বরণ চক্রবর্তীর কাছে আমি আর প্রফেসার বিশ্বাস পি এইচ ডি করি। বর্তমানে আমি সেখানে ডিস্টিনগুইশড অ্যাডজানক্ট প্রফেসার রূপে কর্মরত।

সাধারণত মণিকুন্তলার সাথে আমি রেলগাড়ীতে বেনারস থেকে হাওড়া হয়ে বর্ধমান মেল লাইনের লোকাল ট্রেন ধরে মানকুণ্ডু যাই। লোকাল ট্রেন পছন্দ করি কারণ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা প্রস্থচ্ছেদ দেখা যায়। এস কে এফ জি আই-এ কর্মরত ছোটন (দেবাশীষ রায় চৌধুরী) হাওড়া স্টেশনে আমাদের রিসিভ করে। একবার আমাদের মানকুণ্ডু যাওয়ার পথে বেনারস থেকে অমৃতসর মেলে আমাদের কম্পার্টমেন্টে আলাপ হল একজন বয়স্ক লোকের সাথে যিনি আমার মতন মানকুণ্ডু যাচ্ছিলেন। তাঁর নাম অমিত কুমার দাস। অমিত বাবুর মেয়ের নাম শালিনী নিয়োগী, যিনি থাকতেন এস কে এফ জি আই-এর খুব কাছে লেক সিটি হাওউসিং কমপ্লেক্সে। আমাদের ট্রেন অস্বাভাবিক লেট করল। কথা ছিল শালিনীর হাওড়া ষ্টেশনে এসে ওর বাবাকে রিসিভ করবে। ছোটন হাওড়া স্টেশনে আমাদের রিসিভ করবে, তাই আমি শালিনীকে হাওড়া ষ্টেশনে আসতে বারণ করে দিলাম। কিন্তু যখন আমাদের ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনে 'ইন' করল, তখন মানকুণ্ডু যাওয়ার শেষ লোকাল ট্রেন চলে গিয়েছিল। আমরা পরের দিন মানকুণ্ডু যাওয়ার প্রথম লোকাল ট্রেন ধরলাম। কিন্তু ট্রেনটি ছাড়ার আগে একটা অঘটন ঘটল। হটাৎ আমার পাশে বসা অমিত বাবু আমার কোলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ছোটন ওনার চোখে-নাকে জলের ঝাপটা দিল। কিন্তু অমিত বাবুর জ্ঞান ফিরল না। আমি কালবিলম্ব না করে আমার কাছে থাকা একটি মিষ্টি লজেন্স অমিত বাবুর মুখে পুরে দিলাম। কিছুক্ষনের মধ্যেই অমিত বাবুর জ্ঞান ফিরে এল। শালিনী ওর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে অমিত বাবুকে মানকুণ্ডু ষ্টেশনে রিসিভ করলে ন। শালিনীর কাছে জানলাম অমিত বাবুর লো ব্লাড প্রেশার ছিল। আমার লজেন্স ঐ সময়ে তাকে রক্ষা করেছিল।

স্বল্প পরিসরে মানকুণ্ডুর অনেক কথা লেখা গেল না। এবার মানকুণ্ডুর এস কে এফ জি আই-এর একটা মনোরঞ্জনকর ঘটনায় আসি। একবার ইন্সটিট্যুটের ডীন সাথে রেজিস্ট্রারকে নিয়ে আমার রুমে এসে আমাকে বললেন—স্যার, আপনার বিরুদ্ধে একটা অনুযোগ আছে। আপনি একটা ভরা মীটিং-এ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের হেডকে অপমান করেছেন। আমি ডীন মহোদয়কে বললাম—আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে হেড মহাশয় অপমানিত হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু, আমার হেডকে অপমান করাটা আপনি জানলেন কি করে?

সেই মীটিং-হলে সামনের সারিতে বসে তো আপনি ঘুমুচ্ছিলেন যেমনটি আপনি করে থাকেন। এরপর আরেকটি মীটিং-এর আয়োজন করুন। সেখানে এবার ডিপার্টমেন্টের হেডকে নয়, ইন্সটিট্যুটের ডীনকে অপমান করব। সর্বসমক্ষে আপনার নিষ্কর্মতা এবং ঘুমিয়ে থাকার কথা বলব। আপনি রেজিস্ট্রারকে নিয়ে এসেছেন সাক্ষী হিসেবে? বলাবাহুল্য, আমাকে প্রণাম করে আমার অনুমতি নিয়ে ডীন মহোদয় রেজিস্ট্রারকে নিয়ে সুরসুর করে আমার রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমাদের কলেজে পড়ার সময় আমার জিনিয়াস বন্ধু ভোলানাথ মুখার্জী, যার কথা আগে তৃতীয় অধ্যায়ে অনেক বলেছি, ভাটপাড়ায় থাকত। ভোলানাথ এম টেক পাস করার পর একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করার সুবাদে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াত। আমরা 'সম্পর্কছিন্ন' হয়ে গিয়েছিলাম। মানকুন্ডুর এস কে এফ জি আই-এর এম টেক ক্লাসের এক ছাত্র রক্তিম গুহের সৌজন্যে অনেক বছর পর ভোলানাথকে আবার ফিরে পেলাম। রক্তিম ওর বাবা মার সাথে হালিশহরে থাকত। হালিশহর থেকে ভাটপাড়া বেশি দূরে নয়। আমার অনুরোধে রক্তিমের বাবা শিবনাথ বাবু হালিশহর থেকে ভাটপাড়ায় গিয়ে ভোলানাথের কলকাতার ঠিকানা জোগাড় করে আনলেন। থাঙ্কস টু রক্তিম—মণিকুন্তলা, রক্তিম আর আমি একদিন মানকুন্ডু থেকে ভোলানাথের বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটে পৌছে গেলাম। সেখানে ভোলানাথ আর ওর স্ত্রী কল্যাণী থাকে। ভোলানাথের এক মাত্র মেয়ে, তাদের জার্মান জামাই আর নাতনিকে নিয়ে, আমেরিকায় থাকে। মানকুন্ডু থেকে ভোলানাথ আর কল্যাণীর জন্য আমি মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলাম। কল্যাণী ভোলানাথকে বলল—দ্যাখো, তোমার বন্ধু কত 'মিষ্টি' নিয়ে এসেছে। রসিক ভোলানাথের তাৎক্ষণিক উত্তর—আমার বন্ধু বৈদ্যনাথ বরাবরই 'মিষ্টিরিয়াস'। ভোলানাথের মিষ্টি-নিয়ে-আসা মিষ্টিরিয়াস বন্ধু তার হারিয়ে-যাওয়া ভোলানাথকে আবার ফিরে পেল।

একবার মানকুণ্ডুর এস কে এফ জি আই-এর মানকুণ্ডুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেনারস থেকে ফেরার সময় আমার সাথে গল্প-হলেও-সত্যি ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি 'লোয়ার বার্থ' শীর্ষক খুব ছোট গল্পে নিম্নরূপ নিবেদন করছি—

মানকুনন্ডুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাজ সেরে 'বিভূতি এক্সপ্রেস' ট্রেনে হাওড়া থেকে বেনারস ফিরছিলাম। এই ট্রেনে কোন ফার্স্ট ক্লাস এসি নেই। টু-টিয়ার এসি কামরায় আমার ছিল আপার বার্থ। আমার আপার বার্থে ওঠার সমস্যা ছিল। লোয়ার বার্থে যিনি ছিলেন তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক কম। গল্পটা তাকে নিয়ে। তাঁকে সি-অফ করতে অনেকে এসেছিলেন। তিনি মনে হচ্ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। তাঁকে আমি একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে আমার আপার বার্থে ওঠার সমস্যার কথা বললাম। উনি হিন্দীভাষী হয়েও পরিস্কার বাংলায় আমাকে বললেন আমি যেন এই নিয়ে না ভাবি। তিনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন যে তিনি আমার জন্য লোয়ার বার্থ ছেড়ে আপার বার্থে উঠে যাবেন।

আলাপ হ'ল। তিনি একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। তাঁর ফ্যাক্টরিতে তৈরী করা ইলেক্ট্রিক সামগ্রী আমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকি। বেনারস রেল স্টেশনে নেমে মোটর গাড়ী করে তাঁর দেশের বাড়ী যাওয়ার কথা। এই গল্পে তাঁকে প্রকাশ বাবু বলে ডাকা যাক। যাই হোক রাত নটা নাগাদ মানকুনন্ডুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গেস্টহাউস থেকে আনা ডিনার নিয়ে নিলাম। এর পর প্রকাশ বাবু আমাকে একটু উঠতে বলে পরিপাটি করে রেলওয়ের দেওয়া বিছানা পাততে আরম্ভ করলেন আমাকে আশ্চর্য্য করে, লোয়ার বার্থেই। উনি কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন আমার জন্য তাঁর লোয়ার বার্থ ছেড়ে দেওয়ার কথা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রকাশ বাবুর স্বার্থপরতার কথা ভাবতে ভাবতে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি এবার ঠিক করলাম আশে পাশে খোঁজ নেব কারুর সাথে বার্থ ইন্টারচেঞ্জ করা যায় কিনা যাতে আমি লোয়ার বার্থ পাই। এই ভেবে যেই আমি উঠে দাঁড়ালাম প্রকাশ বাবু আমাকে বললেন—স্যার আপনি বোধ হয় টয়লেটে যাচ্ছেন। আপনার তো ডিনার হয়ে গেছে। আমি আপনার বিছানা পেতে দিয়েছি। আপনি এসে শুয়ে পড়ুন। আমি আপার বার্থে আছি। কোন দরকারে আমাকে ডাকতে দ্বিধা করবেন না। আমার ছোট গল্পটি এখানেই শেষ।

লেখক হিসেবে আমার বিভিন্ন বই ও জার্নালের রিসার্চ পেপারে লেখকের ঠিকানা হিসেবে আমি মানকুণ্ডুর এস কে এফ জি আই লিখে থাকি। কোভিড পেন্ডামিক এবং লকডাউনের কারণে অবশ্য অনেকদিন মানকুণ্ডু যাওয়া

হয়নি। পেন্ডামিক এবং লকডাউন বলতে মনে পড়ে গেল সেই সময় বেনারসে আমার ছোট ছেলে প্রিয়নীল বসুর দিনের মধ্যে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অক্লান্ত এবং নির্ভীক সেবার কথা। তখনকার ওর কর্মভূমি ছিল বি এইচ ইউ-র ইন্সটিট্যুট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স। নিজেকে সে করোনা টেস্টিং-এ (জিনোম সিকোয়েন্সিন্গ অফ করোনা ভাইরাস, ইত্যাদি) নিয়োজিত করে। ইম্যুনোহিস্টোকেমিস্ট্রি, হিস্টোলজি, ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিনী প্রিয়নীলের স্ত্রী শ্বেতা অরোরা বসু কোভিড পেন্ডামিকের সময় ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির উওম্যান সাইন্টিস্ট পদে থাকাকালীন প্রাসঙ্গিক ডায়েবেটিস এবং ডায়েবেটিক কিডনীর রোগ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশিত করে।

সেই কোভিড পেন্ডামিক এবং লকডাউনের সময় বেনারসে আমার বড় ছেলে ইন্দ্রনীল আরোগ্য-ভারতীর ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার এবং আরোগ্য-ভারতী, কাশীপ্রান্তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং তা ছাড়া নীতি-আয়োগের ইন্টিগ্রেটিভ হেল্থ সিস্টেমের পূর্ব উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে। সেই সময় ইন্সটিট্যুট অফ চার্টার্ড আকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়ার বেনারস ব্রাঞ্চের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা বসু, ইন্দ্রনীলের স্ত্রী, ইন্দো-অ্যামেরিকান চেম্বার অফ কমার্সের বেনারস ব্রাঞ্চের চেয়ারপার্সন হিসেবে ওর দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করেছিল। এছাড়া লকডাউনের সময় সুদেষ্ণা বেনারস ব্রাঞ্চের অ্যানিমোটেল কেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন রূপে জনসাধারণের মধ্যে পশুপ্রেমের জন্য সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকোণ তৈরি করার জন্য সচেষ্ট ছিল।

এদিকে কোভিড পেন্ডামিকের সময় জামশেদপুরে আমার ছোড়দির (মঞ্জুদি) মেয়ে ইন্দ্রাণী সরকার মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হসপিটালে কোভিড ভ্যাক্সিনেশন ও কোয়ারান্টাইন ডাটা পর্যবেক্ষণ এবং ডাক্তার, নার্স নিয়োগের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে। সেই সময় জামশেদপুরে আমার মেজদার (জয়ন্ত) ছেলে শঙ্খনীল বোস (বর্তমানে টাটা ষ্টীল লিমিটেডের কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটিতে (সি এস আর) কর্মরত) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ব্যাঙ্ক ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট

প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে প্রত্যন্ত দুর্গম গ্রামে বিলুপ্ত সম্মুখীন উপজাতির উন্নয়নের জন্য সোলার এনার্জি দিয়ে গ্রামের বিদ্যুতায়ান এবং সেচের জন্য সোলার এনার্জি-চালিত জলের পাম্প দিয়ে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থার কাজে আত্মনিয়োজিত হয়েছিল। শঙ্খনীলের স্ত্রী মধুমিতা নন্দী বসু কোভিড পেন্ডামিকের সময় জামশেদপুরে ষ্টীল সিটি কেবেল নেটওয়ার্ক টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, স্ক্রিপ্ট-লেখন এবং ওর অনবদ্য উপস্থাপনা এবং সংবাদ পঠন (নিউজ রিডিং) দিয়ে জনসাধারণকে কোভিড সম্বন্ধে জাগরূক করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল।

কোভিড পেন্ডামিকের সময় আমাদের 'ভ্যাক্যুয়াম ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন সোসাইটি'র কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইংরাজি শব্দের আদ্যাক্ষর দিয়ে এই সোসাইটি VEDA Society নামে পরিচিত। 'VEDA' যা ভারতীয় ভাষায় 'বেদ' এই নাম সবাইকে আকৃষ্ট করবে ভেবে এই নামকরণটি আমি ২০০৪ সালে এম টি আর ডি সি (ডি আর ডি ও) ব্যাঙ্গালোরে করেছিলাম। কোভিড পেন্ডামিকের সময় আমাদের এই রেজিস্টার্ড সোসাইটির কার্যকলাপ অস্থায়ী রূপে বন্ধ হওয়াতে আমি একটা ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের স্থাপনা করি। গ্রুপটির নাম দি-ই 'থিনকার্স ইন ভ্যাক্যুয়াম ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসেস'। আমার এই গ্রুপ স্থাপনায় সি রি, পিলানীর সায়েন্টিস্ট শুভ্রদীপ চক্রবর্তী এবং আই আই টি রূরকীর ডক্টরাল ছাত্র দেবাশীষ মণ্ডল আমাকে সাহায্য করে। বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে এই ফোরামে গ্রুপ মেম্বাররা আলোচনা করেন। এই গ্রুপ পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট, ডক্টরাল এবং পোষ্ট-ডক্টরাল ছাত্রছাত্রী যুবা-মেম্বার দ্বারা সমৃদ্ধ। গ্রুপের মার্গদর্শনে আছেন বর্তমান এবং রিটায়ার্ড বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, ল্যাব ডাইরেক্টর, ভাইস-চ্যান্সেলার, শিল্পপতি বরিষ্ঠ মেম্বাররা। আমার নির্দেশনায় ইন্সটিট্যুট ফর প্লাসমা ফিজিক্সের বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রী রাজ সিং-এর আহ্বানে এই গ্রুপে ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে এখন পর্যন্ত তেরটি ওয়েবিনারে চল্লিশটি লেকচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশ থেকে অনেক জ্ঞানীগুণীরা আমাদের ওয়েবিনার প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম জার্মানি থেকে প্রফেসার ম্যানফ্রেড থুম এবং জে জেলোনেক যারা যথাক্রমে কার্লস্রুহে ইন্সটিট্যুট অফ টেকনলজির প্রাক্তন ও বর্তমান ডাইরেক্টর, এবং

ইংল্যান্ড থেকে ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির ক্লডিও পাওলিনি। ডি আর ডি ও, এম টি আর ডি সি-র ডঃ বিশাল কেশরী প্রত্যেকটি ওয়েবিনার প্রোগ্রামের প্রোসিডিংস-এর এডিটোরিয়াল বোর্ডে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন। প্রোসিডিংসগুলি আই আই টি রূরকীর ডক্টরাল ছাত্র দেবাশীষ মণ্ডল দ্বারা সৃষ্ট আমার ওয়েবসাইটে (www.bnbasu.com) উপলব্ধ। প্রসঙ্গত দেবাশীষ অনেক যত্নে দেশ বিদেশে আমার দেওয়া বেশ কয়েকটা লেকচারের পাওয়ারপয়েন্ট আমার এই ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে।

লকডাউনের সময় কোভিড খেলায় মণিকুন্তলাকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিলাম। দু'বার আমি করোনা পসিটিভ আর মণিকুন্তলা একবার। সেই খেলায় আমাদের ডাক্তার ছেলে ইন্দ্রনীলের রেফারিং ভাল হয়েছিল। লকডাউনের আগে, লকডাউনের সময়, এবং লকডাউনের পরে আমার সাথে মণিকুন্তলার লক অক্ষুণ্ণ আছে। তালা কেউ ভাঙতে পারেনি।

এই বইয়ে মণিকুন্তলার কথা বিশেষ ভাবে বলিনি। তবে মণিকুন্তলার কাছে তো আমি সব সময় আছি ওর সুমধুর গান দিয়ে—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার'। 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুহূর্তগুলো' শীর্ষক এই বইয়ে বর্ণিত মুহূর্তগুলো ছড়িয়ে আছে আমার মনের মণিকুন্তলা-কোঠায়—জামশেদপুর, পিলানী, বারাণসী, মোরাদাবাদ, মানকুণ্ডু, সিওল, কার্লস্রুহে, চেংদু, বা কলকাতায়। যেখানেই থাকুক মুহূর্তগুলো—আমার কাছে বা অনেক দূরে—জড়িয়ে আছে মণিকুন্তলা আমার তা সবটা জুড়ে।

আমার এই বইয়ের উপসংহারে এসে আমার 'মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে'। এই বইয়ের সমাপন করি আমাদের বড়ই প্রিয় সলিল চৌধুরীর গানগুলি দিয়ে—'এবার আমার সময় হল যে যাবার, বিদায় দেবার বিদায় নেবার'...'ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম, তোমায় তা দিলাম'... 'ভাবি বসে আবার যদি পেতাম হারানো সব সেই দিন'!